যার যেথা দেশ

সত্যাসত্য

প্রথম খণ্ড
যার যেথা দেশ

দ্বিতীয় খণ্ড
অজ্ঞাতবাস

তৃতীয় খণ্ড
কলঙ্কবতী

চতুর্থ খণ্ড
দুঃখমোচন

পঞ্চম খণ্ড
মর্ত্যের স্বর্গ

ষষ্ঠ খণ্ড
অপসরণ

অন্নদাশঙ্কর রায়

যার যেথা দেশ
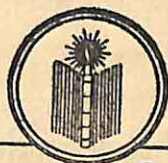
প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৭
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫৩
চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬২

মূল্য পাঁচ টাকা

এর প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য

সুহৃদ্বরেষু

চরিত্রপরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন	এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	বাদলের বন্ধু
উজ্জয়িনী	বাদলের স্ত্রী
মহিমচন্দ্র সেন	বাদলের পিতা
যোগানন্দ গুপ্ত	উজ্জয়িনীর পিতা
সুজাতা গুপ্ত	উজ্জয়িনীর মাতা
কুবেরভাই	বাদলের সহযাত্রী
মিথিলেশকুমারী	বাদলের সহযাত্রিণী
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার	সুধী ও বাদলের আলাপী
বিভূতিভূষণ নাগ	সুধীর আলাপী
কলিন্স্	বাদলের আলাপী
মিসেস উইল্স্	বাদলের ল্যাণ্ডলেডী
মাদাম	সুধীর ল্যাণ্ডলেডী
সুজেৎ	মাদামের কন্যা
মার্সেল	মাদামের পালিতা কন্যা
এলেনর মেলবোর্ন-হোয়াইট	সুধীর আণ্ট এলেনর
আর্থার মেলবোর্ন-হোয়াইট	সুধীর আঙ্কল আর্থার
ওয়েলী	বাদলের আলাপী
বীণা	উজ্জয়িনীর আলাপী
মিসেস স্যামুয়েল্স্	উজ্জয়িনীর শিক্ষা-সহচরী

—আরো অনেকে—

প্রত্যাহৃত ভূমিকা

বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস্ লস্ট্ রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্যাসত্য।

গোড়াতে আমার সংকল্প ছিল তাদের নিয়ে আমিও একখানি এপিক রচনা করব, কিন্তু পদ্যে নয় গদ্যে, যেহেতু আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। গ্রন্থের যুগ্মনায়কের নাম রাখতুম সত্য এবং অসত্য। কিন্তু অমন নাম কোনো পিতামাতা রাখেন না। অতএব সুধী ও বাদল। নারীবর্জিত হলেই ভালো হত। কিন্তু নায়িকাহীন কাব্য হয় না। অতএব উজ্জয়িনীর অবতারণা। সত্য এবং অসত্য উভয়ের আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় দোলাবে। সে যেন সংকটারূঢ় মানবাত্মা। "সত্যাসত্য" এপিক তথা রূপক হবে।

আইডিয়াটিকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল, বাদল সুধী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল, গঙ্গা ধাবিত হল তৃতীয় দিকে। কোথায় রইল তাদের বিরোধ, সুধী হল বাদলের দাদা। কোথায় রইল তাদের প্রেম, বাদল উজ্জয়িনীকে টানল না, সুধীও তার প্রতি নিরনুরাগ। এই তিন নদনদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়ল বহু উপনদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটি শক্তি নয়—ব্যক্তি।

রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল। এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাবনিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানবসংসার নয়, নক্ষত্রনীহারিকার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়পারম্পর্য, অণুপরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়কনায়িকা তিন জনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইন্‌টুইশনের মার্গ, বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিন জনেরই আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়। ওদের স্বভাবে কৃত্রিমতা নেই। এপিকের নায়কনায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা পূরা মাপের মানুষের চাইতে মাথায় উঁচু।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যদি হয় এপিক, উপন্যাসের সঙ্গে এপিকের প্রভেদ কোথায়? উত্তর, এপিকমাত্রেই উপন্যাস, হয় পদ্যে নয় গদ্যে। কিন্তু উপন্যাসমাত্রেই এপিক নয়। অর্থাৎ উপন্যাস বহু প্রকার। তার এক প্রকার হচ্ছে এপিক। এপিকের লক্ষণ নায়কনায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ত্ব; তাদের জগতের বিস্তার ও জীবনের অতিমর্ত্যতা। এর উদাহরণ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্‌। আর এক প্রকার হচ্ছে চরিত্র-চিত্রশালা। বিচিত্র চরিত্রের ভিড়, জনতার কলকোলাহল। এর উদাহরণ ডস্টইয়েভ্‌স্কির যে-কোনো উপন্যাস। আর এক প্রকার হচ্ছে ঘটনাচক্র। নায়কনায়িকার ভাগ্য ঘটনার সঙ্গে ঘুরতে থাকে, কী হবে কী হবে করে পাঠকের মনটা ব্যাকুল। পাঠিকা হলে বইয়ের শেষ পাতাটা উলটে ধাঁধার জবাব দেখে রাখেন, নায়কনায়িকা বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মিলিত হয়েছেন, বিবাহের বিলম্ব নেই। এর উদাহরণ রেলওয়ে বুকস্টলে অগুনতি। বড় বড় লেখকেরও এই প্রকার উপন্যাস আছে। উদাহরণ "Three Musketeers"। আর এক প্রকার হচ্ছে বিশ্বকোষ। তার পাত্রপাত্রী অবান্তর। সেটি যাবতীয় জাগতিক বিষয়ে গ্রন্থকর্তার চিন্তার পরিশীলন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ওয়েল্‌সের উইলিয়াম

ক্লিসোল্ড্। আর এক প্রকার হচ্ছে প্রচারপত্রী। তারও পাত্রপাত্রী অবান্তর, তাদের উপলক্ষ করে গ্রন্থকার ধর্মপ্রচার করেন, সমস্যার সমাধান বলে দেন, আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। আধুনিক উদাহরণ Upton Sinclair-এর যাবতীয় উপন্যাস। আরও অনেক প্রকার আছে, তাদের মধ্যে একটি প্রকার সম্প্রতি বহুল আলোচিত হচ্ছে। তাকে বলতে পারা যায় সন্দর্ভ অথবা থীসিস্। লেখকের উদ্দেশ্য প্রচার নয়, প্রতিপাদন। তাঁর মনের ছাঁদ বৈজ্ঞানিকের, পদ্ধতি objective. উদাহরণ জেমস্ জয়্সের "Ulysses", মার্সেল প্রুস্তের "*A la recherche du temps perdu.*"

উপরে বলেছি, আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। নতুবা ওই সমস্ত উপন্যাস পদ্যে লিখিত হয়ে কাব্য নাম ধারণ করত। প্রাচীন সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। তবে উপন্যাস বলে সাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট বিভাগ সেকালে ছিল না। এখনও উপন্যাসের সীমানা নিয়ে দাঙ্গা বাধে। সমালোচক মানা দিয়ে বলেন ওটা উপন্যাস নয়, প্রকাশক পাঠক পাকড়াবার ফন্দীতে মলাটের উপর ছেপে দেন উপন্যাস। লেখক বলেন আমি লিখেই খালাস, শ্রেণী-বিভাগ অপরে করুক; পাঠক প্রকাশকের চাতুরীর জন্যে লেখককে দায়ী করেন। পাছে আমার এই উপন্যাসের বেলা তাই হয় সেজন্যে একটা অযাচিত জবাবদিহি করে রাখলুম।

উপন্যাসের সংজ্ঞা কিংবা সীমানা নির্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত, স্বয়ং বেদব্যাস তা করেননি। তবে তাঁর মহাভারত থেকে আমার "সত্যাসত্য" পর্যন্ত উপন্যাসরূপে গণ্য হবার দাবি রাখে এমন যত গ্রন্থ গ্রথিত হয়েছে তাদের প্রাণবস্তু হচ্ছে গল্প। প্রক্ষিপ্ত কিংবা বিক্ষিপ্ত গল্প নয়, আদ্যোপান্ত একটি গল্পপ্রবাহ। পক্ষান্তরে এক রাশ ছোটগল্পের

একত্রীকরণও নয়, সব উপগল্পকে জড়িয়ে একটিমাত্র গল্প। যে উপন্যাসে একটি সর্বময় গল্প নেই সে উপন্যাস প্রাণবিহীন পিণ্ডবিশেষ। গল্পের গুণ আগ্রহকে জাগিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখা এবং আগ্রহের সঙ্গে জেগে থাকা। রাত ভোর হয়, রাজা তৃপ্তি পান, শেহেরজাদী মুক্তি পান। অতএব শুধু গল্প থাকলে চলবে না, গল্পের গুণ থাকা চাই। গল্প যেন শ্রোতাকে গুণ করতে পারে। যে উপন্যাস পাঠকের আহারনিদ্রা হরণ করতে পারল না, যে নারী পুরুষের মনোহরণ করতে পারল না, তাকে শত ধিক্।

উপন্যাসের প্রাণ গল্প এবং গল্পের গুণ চমৎকারিতা। কিন্তু তাই সব নয়। তাই যদি শেষ কথা হত তবে ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের প্রভেদ থাকত না। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, যেন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাঁটলে সে ছোটগল্প হয় না, ছোটগল্পকে পল্লবিত প্রসারিত করলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ-দ্বার খুলে দিয়ে বলে, "বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়।" ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় আর বলে, "পাঠক, যথেষ্ট দেখলে, আর দেখতে চেয়ো না।"

উপন্যাসকার ক্রমাগত সুতা ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙায় তোলেন। ছোটগল্পকার জাল ফেলে তখুনি তুলে নেন। ছোটগল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময়সাপেক্ষ, তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে।

উপরে যে বিশিষ্ট জগতের কথা বলা হল সে শুধু উপন্যাসের কিংবা ছোটগল্পের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট জগৎ আছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ জগৎটাই সৃষ্টি। ভাষার কারিকুরি, ভাবের ঐশ্বর্য, ঘটনার ঘূর্ণী চরিত্রের বৈচিত্র্য—কিছুতেই কিছু হবে না, যদি একটি বিশিষ্ট জগতের আভাসটুকু অন্তত না থাকে। সে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জগতের মিল থাকবে কি থাকবে না, যদি থাকে কতখানি থাকবে, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। "সত্যাসত্য" সম্বন্ধেও ঐ তর্ক বাধতে পারে। কেউ কেউ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অংশ পড়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন, "কই, বাদলের মতো কাউকে তো দেখিনি ?" বাদল ছাড়া বাদলের মতো কাউকে আমিও দেখিনি সেটা ঠিক। কিন্তু বাদলকে আমি দেখেছি, হয়তো একমাত্র আমিই দেখেছি। তবে দেখারও প্রকারভেদ আছে। বাদলকে দেখেছি ও ট্র্যাফলগার স্কোয়ার দেখেছি, দু-ই যথার্থ হলেও দুই সমার্থক নয়। বাদলকে নিজের মধ্যে দেখেছি, পরের মধ্যে দেখেছি, বহু স্থানে বহু অবস্থায় দেখেছি। ট্র্যাফলগার স্কোয়ারকে দেখেছি, ট্র্যাফলগার স্কোয়ারে। দু-রকম দেখাকেই পাঠককে দেখিয়েছি। যথাস্থানে ও যথানুপাতে দেখালে এমন জিনিস নেই যা দর্শনীয় হয় না। সকলের চোখে দেখা এই জগৎটার যাবতীয় বস্তুকে আমি যে perspective থেকে যে proportion-এ দেখি তাই আমার দেখা ও সেই দেখার থেকে আমার উপন্যাসের জগৎ। আমার উপন্যাসের জগতে বিচরণ করতে করতে অনেক কিছু পাঠকের মনে ধরবে না অনেককিছু ধরবে, যেমন ভগবানের জগতেও। কিন্তু সৃষ্টি যদি করে থাকি, ফাঁকি যদি না দিয়ে থাকি, তবে ও-জগৎকে এ-জগতের মতো স্বীকার করে নিতেই হবে।

শেষ প্রশ্ন, আর একটা জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? ভগবান তাঁর

জগৎ কী জন্যে সৃষ্টি করলেন প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে উত্তরের আশা রাখি।

ঔপন্যাসিকের বক্তব্য, উপন্যাস আর্টের শাখা। বিচার করতে হয়, আর্টের উদ্দেশ্য কী। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য জীবনকে প্রতিবিম্বিত করা (holding the mirror up to Life)। তাই যদি হয় তবে কাজটা ছেলেখেলা। আয়নায় যাকে ধরা যায় সে প্রতিচ্ছায়া, আয়না হচ্ছে ছায়াধরা ফাঁদ। সোজাসুজি জীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে আয়নায় তার আদল দেখব কেন? আসল থাকতে নকল কী হবে? কেউ কেউ বলেন, তা নয়, আর্টের উদ্দেশ্য জীবনের ব্যাখ্যা করা, আর্ট হচ্ছে জীবনের ভাষ্য। অর্থাৎ জীবন অতি দুর্বোধ্য পুঁথি, আর্টিস্ট ব্যতীত অপরে তার অর্থ করতে অপারগ। আর্টিস্ট হলেন জীবনশাস্ত্রের শঙ্করাচার্য। কিন্তু আর্টিস্টের ঐ দাবি দার্শনিকের দাবির সঙ্গে সমান। মামলা বাধলে বিচারকের রায় দার্শনিকের পক্ষে যাবে।

তৃতীয় এক দলের ধারণা, আর্টের অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে মানবের জীবন হবে দেবতার জীবন। আর্টিস্ট হবেন apostle; তিনি উপনিষদের ঋষির মতো উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করতে থাকবেন, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—যতক্ষণ শ্রোতার কর্ণপটহ অবিভক্ত থাকে। রক্ষা এই যে, কোনো সত্যকার আর্টিস্ট কোনো দিনই এ ব্রত স্বীকার করেননি; যাঁরা করেছেন তাঁদেরকে আর্টিস্ট বলে গণ্য করা হয়নি।

আমি বলি, জীবন যেমন ভগবানের সৃষ্টি, আর্ট তেমনি মানবের সৃষ্টি। জীবনের উদ্দেশ্য যা, আর্টের উদ্দেশ্যও তাই। সে উদ্দেশ্য স্রষ্টার আত্মপ্রকাশেচ্ছা পূরণ, স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্যদান। জীবন বড়, না আর্ট বড়, এমন প্রশ্নও উঠেছে। শুনে হাসি পায়। রাধা বড়, না কৃষ্ণ বড় এ সম্বন্ধে শুকশারীর কলহ সুপরিচিত। আমি বলি আর্ট না থাকলে

জীবনমহীরুহ পুষ্পপল্লবহীন, রিক্ত। জীবন না থাকলে আর্ট আকাশ-কুসুম। জীবন এবং আর্ট মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা, যেন ওরা দুই নয়, এক। যেন জীবন হচ্ছে আর্ট, আর্ট হচ্ছে জীবন। তবু ওদের প্রকৃতি ভিন্ন, যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি। পরস্পরের অনুকৃতি ওদের সম্বন্ধের মাধুর্য হ্রাস করে, পরস্পরকে উন্নত করা ওদের চোখের অগোচরে ঘটে, পরস্পরের কাছে ওরা অর্থসমন্বিত।

"সত্যাসত্য" লেখবার অভিপ্রায় আমার বহুদিন থেকে ছিল, কিন্তু বিশ্বাস ছিল না যে লিখে উঠতে পারব। ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত "পথে প্রবাসে" বন্ধ হলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে একখানি উপন্যাস দাবি করেন ও এইটুকু মাফ দেন যে, দাবির পরিমাণ কিস্তিবন্দীভাবে দিলে চলবে। তাঁর আগ্রহের আনুকূল্য না পেলে বোধ করি এতদিন এ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হত না, মনোরথ মনের অতলে উত্থিত হয়ে বিলীন হত। এখনো যে সমস্তটা লিখিত হয়েছে তা নয়। যেটুকু হয়েছে সেটুকু পাঠকের হাতে স্থায়ীভাবে দিতে প্রস্তুত ছিলুম না, কিন্তু প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার প্রস্তুত করিয়ে নিলেন, কালক্ষেপ করতে দিলেন না। "যার যেথা দেশ" নামে "সত্যাসত্যে"র প্রথম সর্গ প্রকাশিত হল। পাঠক যদি পড়তে পাবার সুযোগ লাভ করেছেন বলে অন্তরে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন তবে সেই কৃতজ্ঞতা উপেন্দ্রবাবুর ও গোপালবাবুর প্রাপ্য।

(১৩৩৯) শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

পরিচ্ছেদসূচী

এই খণ্ডের রচনাকাল ১৯৩০-৩২। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে এর কতক অংশ পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়েছিল। চতুর্থ সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। অল্পস্বল্প সংশোধন করা গেছে। ভূমিকাটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। প্রকাশকের অনুরোধে পুনর্মুদ্রিত হল। "সত্যাসত্য" এপিক নয়। বৃহৎ উপন্যাস।

যার যেথা দেশ

যাই যাই

১

বাদল তার পড়ার ঘরে বসে এক মনে কী লিখে যাচ্ছিল। চোখ না তুলে বলল, "এই যে সুধীদা, তোমার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি লেখা।"

সুধী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। কৌতূহল প্রকাশ করল না।

বাদল লেখা বন্ধ না করে বলে যেতে লাগল, "শুনলে তো বাবার যুক্তিটা? বৌ না রেখে বিলেত গেলে পাছে বৌ নিয়ে দেশে ফিরি সেই জন্যে করতে হবে বিয়ে। বাবাকে বললুম, বিয়ে করতে হয় তো দুই বন্ধুকে এক সঙ্গে করতে হবে, নয় তো কারুকেই না। এক বন্ধুর বিয়ে হলে অপর বন্ধু পর হয়ে যায় সে কি আমি জানিনে!"

সুধী শুধু বলল, "সে হয় না।" বাদলের মনে আঘাত দিতে তার মুখ মূক হয়ে যাচ্ছিল।

বাধা পেয়ে বাদল মাথা তুলল। কলম ফেলে দিয়ে অধৈর্যের সহিত প্রশ্ন করল, "হাউ ডু ইউ মীন্?"

সুধী উত্তর করল, "মাদ্রাজ থেকে ফরাসী জাহাজে আমি রওনা হচ্ছি। বিয়ের পরে পি এণ্ড্ ও' তে তুই যাবি। তোকে আমি লণ্ডনে রিসিভ্ করব।"

বাদল কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। কী ভেবে বলল, "তোমার কথার প্রতিধ্বনি করছি। ফরাসী জাহাজে আমিই চললুম। বিয়ের পরে পি এণ্ড্ ও' তে তুমিই যেয়ো। তোমাকেই আমি লণ্ডনে রিসিভ্ করব।"

সুধীর পক্ষে গাম্ভীর্য রাখা দায় হল। করুণ হেসে বলল, "বিয়ে না করলে তোর বাবা তোকে যেতেই দেবেন না যে। আর বিয়ে করলে যদি বন্ধুত্বে ফাট ধরে তবে তেমন ঠুন্‌কো বন্ধুত্বকে কতকাল আমরা আগলে থাকব?"

বাদল বলল, "তবু যাঁকে ভালোবাসিনি তাঁকে বিয়ে করতে আমার প্রিন্সিপ্লে বাধবে। হয়তো তাঁরও।"

সুধী স্বল্পভাষী মানুষ। কিন্তু বাদলের সঙ্গে তর্ক করা তার সয়ে গেছে। বলল, "বিয়ের আগেই যে ভালোবাসতে হবে এই পাশ্চাত্য কুসংস্কারটা তোর মতো ভাবুকেরও আছে! বিয়ের এক আধ দিন পরে ভালোবাসলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

"বিয়ের পরে যদি না ভালোবাসি তবে অশুদ্ধ হয় বৈ কি।"

"তা যদি বলিস্, ভালোবেসে বিয়ে করেও অনেকে দেখে ভালোবাসা উবে গেছে। তখন?"

"তখন বিবাহের করোলারী বিবাহচ্ছেদ।"

"তা যতদিন চলিত হয় নি ততদিন সকলে যেমন বিয়ে করে ও পশতায় তুইও তাই করিস্।"

"সকলে তাই করলে ডিভোর্স কোনো দিন চলিত হবার সুযোগ পাবে না। আগে ডিভোর্সের পথঘাট খোলা রেখে তারপরে বিয়ে করতে হয় করব। করতেই যে হবে এটা একটা কুসংস্কার।"

সুধী চুপ করে থাকল দেখে বাদল তার বক্তব্যটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিল।—"অবশ্য আমি প্লেটোর দলে নই, সুধীদা। আমি— এই ধর—গ্যয়টের দলে।"

সুধী হেসে বলল, "তা হলে উজ্জয়িনীর মতো মেয়েকে কোনোকালে পাবিনে।"

বাদল তার স্বভাবসিদ্ধ ঐকান্তিকতার সহিত বলল, "নাই বা পেলুম। কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী। যে আমার তাকে আমি কোনো দিন কোনো দেশে পাবই। পরের কাছে থাকলে ছিনিয়ে আনব। কারুর বিবাহকেই আমি বৈধ মনে করিনে, অন্তত অচ্ছেদ্য মনে করিনে, সুধীদা।"

বাদলকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেবার সংকেত সুধী জানত। কোনো একটা প্রিন্সিপ্লের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিলে বাদলকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়। সুধী মৃদু হেসে বলল, "চ্যারিটি বিগিন্‌স্ য়াট্ হোম্। নিজে বিয়ে করে প্রমাণ করে দে যে বিয়ে বলতে কিছুই বোঝায় না। কা তব কান্তা, এই প্রাচীন বাক্যটা নিয়ে নবতন মায়াবাদ প্রচার করতে নেমে পড়্।"

বাদল সোৎসাহে বলল, "তথাস্তু। উজ্জয়িনী হবেন আমার প্রথম শিষ্যা, আমার যশোধরা। তাঁকে বিবাহের বিরুদ্ধে দীক্ষিত করবার একমাত্র উপায় তাঁকে বিবাহ করা। তাই বলে তাঁকে ভালোবাসবার বা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার দায়িত্ব আমার নেই। উই ম্যারি টু ডাইভোর্স।"

সুধী তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

তখন বাদল তার চিঠিখানাতে মন দিল। ইওর্স সিন্‌সিয়ালি বি সি সেন পর্যন্ত লিখে থামল।

২

বাদলের ভাবী শ্বশুর ক্যাপ্‌টেন ওয়াই গুপ্ত বহুবিদ্য লোক। নামে ডাক্তার, আসলে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া। যৌবনকালে স্বাধীনচেতা ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে পসার জমাতে পারলেন না। সরকারী চাকরি নিতে বাধ্য হলেন। তখন তাঁর সান্ত্বনা রইল, আমি না হই

আমার পুত্র কন্যা স্বাধীন হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্র হল না, পুত্রকামনা থেকে গেল।

ডাক্তারসাহেব এত অল্পবয়স্ক পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে চাইতেন না, যদি না তাঁর পুত্র-আদর্শ বাদলের মধ্যে মূর্তি খুঁজত। তাঁর অন্য জামাতারা আধকবয়স্ক। কৌশাম্বীর স্বামী সিমলার বড় চাকুরে। কাঞ্চীর স্বামী কলকাতার ব্যারিস্টার। তাঁরা আর একটু হলেই শ্বশুরের সমসাময়িক হতেন, আপাতত শাশুড়ীর সমবয়সী। তাঁদের দেখলে যোগানন্দের পুত্রভাব সঞ্চার হয় না। অথচ মিসেস গুপ্ত বেছে বেছে তাঁদেরকেই জামাতারূপে নির্বাচন করেছেন, যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত এবং অত্যন্ত উপার্জনক্ষম।

বাদলের প্রতি মিসেস গুপ্ত কিছুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু যোগানন্দ ধরে বসলেন, কনিষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ আমিই স্থির করব। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার মায়ের তেমন বনে না। সে তার দিদিদের মতো নয়। তাকে নিয়ে তার বাবা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে আসছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। সেইজন্যে তার মায়ের কিংবা দিদিদের সঙ্গে তাকে বেশী মিশতে দেন নি, নিজের কাছে কাছে রেখেছেন। কৌশাম্বী ও কাঞ্চী লোরেটোতে লালিত। নিত্য নূতন পোশাক ও নিত্য নূতন পার্টি এই নিয়ে তাদের জীবন। তাদের বাল্যকাল কেটেছে কলকাতায় মায়ের সঙ্গে ও দিদিমায়ের বাড়িতে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল কেটেছে বাপের সঙ্গে ও বাংলার নানা শহরে। মাতে বাবাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হয় নি। তবু মা ভালোবাসতেন কলকাতা এবং বাবা যখন সরকারী চাকুরে তখন তাঁকে ক্রমাগত বদলি হতে হয়। উজ্জয়িনীর জন্মের কয়েক বছর পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বাংলায় অন্তরিত হন।

মিসেস গুপ্ত নিজে বিলেত না গিয়ে থাকুন, বিলেতফের্তার মেয়ে, স্ত্রী ও শাশুড়ী। চাকর বেয়ারার মুখে মেমসাহেব ডাক শুনতে শুনতে তাঁর ধারণা দাঁড়িয়ে গেছল যে তিনি অন্য দশজন বাঙালীর মেয়ের থেকে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বামীর সাহেবিয়ানার শৈথিল্য দেখে তাঁর লজ্জা করত। স্বামীর ত্রুটি ঢাকবার জন্যে তিনি অতিরিক্ত রকম মেমসাহেবিয়ানা ফলাতেন। তাঁর বসবার ঘরে ইংরেজী ধরনে কয়লার আগুন জ্বলত। অগ্নিস্থলীর উপরিতন ম্যাণ্টেল্‌পীসে একরাশ পুরাতন ক্রিস্‌মাস কার্ড ও নিউ-ইয়ার ক্যালেণ্ডার শোভা পেত এবং দেয়ালে আঁটা একখানি প্রতিকৃতির চতুষ্পার্শ্বে ফুল-পাতার wreath জড়ানো থাকত। প্রতিকৃতিটি পঞ্চম জর্জের স্বর্গত কনিষ্ঠ পুত্রের।

এমন যে মিসেস গুপ্ত তাঁরই কন্যা উজ্জয়িনী হল তার বাপের মতো কালো, যাকে সাধুভাষায় বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই এক অপরাধে মেয়েটি মায়ের মমতা হারিয়ে বাপের হাতে গিয়ে পড়ল। বাপের যৌবনকালের মানসী নারী ছিল নার্স, আতুরকে ক্লান্তকে মুমূর্ষুকে যে নারী সেবা ও সঙ্গ দেয়, শুশ্রূষা ও শান্তি দেয়। মেয়েকে তিনি চাইলেন সেই আদর্শে দীক্ষিতা করতে। বিবাহ না করে উজ্জয়িনী সেবা-সদন করবে এই রকম কথা ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে। উৎসাহ ও রক্ত একই সঙ্গে শীতল হয়। যোগানন্দ ভাবলেন বিবাহটা করে রাখা মেয়েমানুষের পক্ষে ইন্‌শিওরান্সের মতো। ওটাতে জীবনের ব্রতভঙ্গ হবেই এমন কোনো কথা নেই। স্বামীটি যদি উদার হয় তবে উজ্জয়িনী বিবাহ করে যত কাজ করতে পারবে বিবাহ না করে তত পারত না। মিশনারী ওল্ড মেড্‌দের শুষ্ক নীরস চেহারা ও ধারা তাঁর বিভীষিকা হয়েছিল। অতএব এমন একটি জামাতা চাই, যে উজ্জয়িনীর সমমনস্ক। "ইংলিশম্যান" কাগজে "A Youngman Looks at the

World" নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ তাঁকে অবাক করেছিল। কে এই পাটনার বি সি সেন? স্বনামধন্য দাড়ু সেনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। পত্রের উত্তরে দাড়ু সেন মশাই জানালেন, ছোকরা খুবই গিফ্‌টেড্‌, এবারকার বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু ওর বাবা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নন।

যোগানন্দ নিজে নাস্তিক মানুষ, সমাজে কোনদিন যান না। উপরন্তু বৈদ্য জাতটার প্রতি তাঁর অবৈজ্ঞানিক পক্ষপাতও ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মহিম সেন তাঁর কলেজের সহপাঠী। বছর কয়েক আগে মহিমের স্ত্রী কী এক ব্যাধিতে ভুগে কলকাতায় মারা যান। তখন যোগানন্দ মেডিক্যাল কলেজে একটিনি করছিলেন, মহিম কোথা থেকে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভাই, বাঁচাও। যোগানন্দের মনে পড়ে গেল এই সেই মহিম যার টিকি কেটে তিনি ফাইন গুনেছিলেন। সেই মহিমে ও এই মহিমে অনেক তফাৎ। সে ছিল ভয়ানক গরিব, চটি পায়ে ও চাদর গায়ে দিয়ে কলেজে আসত, ভালো ইংরেজী উচ্চারণ করতে পারত না, কিন্তু বই মুখস্থ করে নম্বর আদায় করতে পারত অসাধারণ। এ নাকি বেহারের কোন মহকুমা-হাকিম, রায়সাহেব উপাধি পেয়েছে, উপাধি সাহেব বলে সাহেব সেজেছে।

যোগানন্দ মহিমচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন। রায়বাহাদুর তো হাতে স্বর্গ পেলেন। একৃস্ গুপ্তের নাৎনী ও আই এম এস্ অফিসারের মেয়ে, এই যথেষ্ট। সেটি কালো না সুন্দর, ভালো না মন্দ, যোড়শী না ষষ্ঠী—এ সবের দিক দিয়েই গেলেন না। প্রথম চিঠিতেই পাকা কথা দিলেন। এক-খানা ফোটো পর্যন্ত চেয়ে পাঠালেন না। মেয়েটিকে অবশ্য একদা তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু তখন তার বয়স দুই কি আড়াই বছর। তখন বাদলের বয়স ছয় কি সাত। এরা যে একদিন বিবাহের উপযুক্ত হবে

এমন উদ্ভট কল্পনা কোনো কর্মক্লান্ত পুরুষের মনে স্থান পায় না। কোলের ছেলের সঙ্গে সম্ভবপর মেয়ের সম্বন্ধ করা স্ত্রীলোকদেরই মধ্যাহ্ন বিনোদনের বিষয়। এমনি একটি সম্বন্ধ বাদলের মা হয়তো করেছিলেন, কেবল উজ্জয়িনীর মায়ের সঙ্গে কেন, কত মেয়ের মায়ের সঙ্গে। তাঁর সেইসব পাতানো বেয়ানদের স্মরণশক্তি এখনো সজাগ হয়নি এই জন্যে যে, এখনো বাদল যথেষ্ট বড় এবং উপার্জনক্ষম হয়নি। বিলেতটা ঘুরে এসে মস্ত একটা চাকরি জুটিয়ে জাঁকিয়ে বসলে আর কয়েক বছর পরে মিসেস গুপ্তেরও কি হঠাৎ মনে পড়ে যেত না যে, তাই তো, বাদলের মাকে যে কথা দিয়েছিলুম, পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্যে এই বিবাহ প্রয়োজন।

মিসেস গুপ্ত আপত্তিও করলেন, সম্মতিও দিলেন। জানতেন উজ্জয়িনীর রং ও ঢং বাঙালী সাহেবদের পছন্দ হবে না। ও মেয়ের বিয়ের আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এক রায়বাহাদুরের বাড়িতে মেয়ে দিতে তাঁর মেমসাহেবী প্রেস্টিজে বাধছিল। তবু ছেলেটি ভবিষ্যতে বাপকে ছেড়ে শাশুড়ীকে গুরু করবে, যদিও বিলেত ঘুরে আসবে বাপেরই টাকায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও আশ্বাস।

৩

কৌশাম্বী ও কাঞ্চী এই পিতৃদত্ত নাম দুটোকে তাদের মা লোকমুখে খারিজ করিয়ে নিয়েছেন। তাদের নাম রটে গেছে লিলি গুপ্ত ও ডলি গুপ্ত। অধুনা লিলি চ্যাটার্জী ও ডলি মিটার। তারা এখন সিমলায় ও কলকাতায় নিজের নিজের বাড়িতে থাকে, মিসেস গুপ্ত মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছুকাল যাপন করে আসেন, বাকী সময়টা কাটান

বহরমপুরে, স্বামীর কর্মস্থলীতে। যখন বহরমপুরে থাকেন তখন ব্রেকফাস্টের টেবিলে চা ও চিঠি দুই-ই পরিবেশন করেন।

একদিন চাপরাশীর হাত থেকে সেদিনকার ডাক নিয়ে দেখেন উজ্জয়িনীর নামে একখানি খাম, ঠিকানাটা অপরিচিত হাতে লেখা। গুপ্তসাহেব তখন খবরের কাগজে ডুবেছিলেন, উজ্জয়িনী চিল দেখতে উঠে গেছে। চাপরাশী চলে গেলে মিসেস গুপ্ত চিঠিখানাকে বুকের কাছ দিয়ে ব্লাউসের ভিতর ঝুপ করে ফেলে দিলেন এবং শাড়িটাকে আর একটু উপরের দিকে টেনে দিলেন। স্বামীর চিঠিগুলো স্বামীর একপাশে রেখে দিয়ে বললেন, "আমাকে এবার অনুমতি দাও তো উঠি।"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপার থেকে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়।"

"তোমাকে আর কিছু দিতে হবে?"

"না, থাক্।"

"আর একটু চা?"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপাশ থেকে মাথা নাড়লেন। মিসেস গুপ্ত ওটা না দেখতে পেয়ে ঠাওরালেন মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। স্বামীর পেয়ালা থেকে তলানিটুকু পৃথক করলেন ও তাতে নূতন চা ঢেলে স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অন্যমনস্ক গুপ্তসাহেব পেয়ালাটি তুলে নিলেন।

সিঁড়ি ভেঙে মিসেস গুপ্ত সোজা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে উঠলেন। শুয়ে পড়ে খামখানা বের করলেন। ছিঁড়ে দেখলেন আগাগোড়া ইংরেজী। ইংরেজী তিনি বলতে পারতেন ভালো। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ইংরেজী তাঁর দুরস্ত ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক ইংরেজী বুঝবেন কেমন করে? তবু অদম্য কৌতূহলবশত চিঠিখানাকে উল্টে পাল্টে দেখলেন। কোথাও দন্তস্ফুট না করতে পেরে ক্ষুব্ধ হলেন এবং ভবিষ্যতে আর একবার চেষ্টা

করবার অভিপ্রায়ে ওখানাকে বালিশের নীচে চাপা দিলেন। যখন ঘর থেকে বেরলেন তখন দূর থেকে শুনলেন উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার বাবার কথা হচ্ছে।

উজ্জয়িনী বলছে, "আচ্ছা বাবা, চিলের মতো ডানা মেলে দিয়ে ওড়া কি খুব শক্ত ?"

তার বাবা হাসছেন।—"তুই একবার চিলের সঙ্গে উড়ে গিয়ে দেখে আয় না, বেবী !"

উজ্জয়িনী আপন মনে দুই বাহু তুলে চিলের মতো এলিয়ে দিচ্ছে ও ঝট্‌পট্ করছে। তার অধ্যবসায় দেখে তার বাবা হাসি চেপে বলছেন, "মন্দ এক্‌সারসাইজ নয়, বেবী। রোজ করলে সাইজও বাড়তে পায় না তোর মার মতো।"

তাঁদের বাড়ির কুতব মিনারী সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মিসেস গুপ্ত প্রবেশ করলেন। শ' খানেক বছরের পুরোনো বাড়ি। এক একখানা ঘরের বহর এমন যে পাশাপাশি পাঁচটা হাতীর পিঠে পাঁচটা জিরাফ দাঁড়ালে তাদের মাথা সিলিং-এ ঠেকবে না।

মিসেস গুপ্ত কোথা থেকে এক জোড়া শতচ্ছিদ্র মোজা পেড়ে এনে গম্ভীরভাবে রিফু করতে বসলেন। এটাও মেমসাহেবিয়ানার অঙ্গ। অবশ্য মোজা জোড়া কারুর কোনো কাজে লাগবে না, খুব সম্ভব বেয়ারা কিংবা চাপরাশীকে দান করা হবে। ধৈর্যের সঙ্গে মোজা রিফু করা চলতে লাগল বটে, কিন্তু কান দুটি খাড়া রইল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দের জন্যে ওৎ পেতে।

যোগানন্দ একখানা চিঠিকে লক্ষ্য করে বললেন, "মহিম লিখেছেন।"

যোগানন্দজায়া একবার চোখ তুলে স্বামীর চোখের সঙ্গে মিলালেন। তখনি নামিয়ে সূচিকর্মে মনোনিবেশ করলেন। কে কী লিখেছে শোনবার জন্যে কৌতূহল দেখালে তাঁর মর্যাদাহানি হয়।

অগত্যা যোগানন্দই একতরফা বলে গেলেন, "লিখেছেন ছেলে অক্টোবরের আগে বিলেত পৌছতে চায়, জাহাজে জায়গা রিজার্ভ করা হয়ে গেছে, ভারি তাড়াহুড়ো বাধিয়েছে—"

যোগানন্দজায়া আর একবার চোখ তুলে চোখাচোখি করলেন। ভাবটা এই যে, তাতে আমার কী!

কৈফিয়তের স্বরে যোগানন্দ বললেন, "তা আমাদের দিক থেকেও তো আপত্তি নেই। বেবীর আপত্তি না থাকলেই হল। কী বলিস রে বেবী?"

বেবীর মা বেবীর দিকে কটমট করে তাকালেন। বেবী তার বাবার দিকে শুধু বিস্ময়সূচক দৃষ্টি ফিরিয়ে রইল।

যোগানন্দ এতদিন কথাটা উজ্জয়িনীর কাছে পাড়েন নি। পাড়তে তাঁর সংকোচ বোধ হচ্ছিল। এত সকাল সকাল বিয়ে করতে উজ্জয়িনীর আপত্তি হবেই তো। তার বাবাই তো তাকে কবে থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন যে, দেশের সোশ্যাল সার্ভিস বিদেশিনীদের হাতে। এ ক্ষেত্রে কি আমরা কোনো দিন স্বরাজ পাব না?

একে বিবাহ, তায় অল্পবয়সে বিবাহ—যোগানন্দ নিজেই ইতস্তত করছিলেন। সাহস করে বললেন, "আচ্ছা বেবী, একটি সুন্দর ছেলে যদি তোকে এসে বলে, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, তা হলে তোর কি আপত্তি থাকতে পারে?"

উজ্জয়িনীর গালে কে রং মাখিয়ে দিল। সে মায়ের দিকে একবার আড়চোখে চাইল, মা যেন দুর্জয় ক্রোধ জোর করে চাপছিলেন। তারপরে খবরের কাগজ গুছাতে বসল। মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে মিসেস গুপ্ত বুঝলেন কী একটা বলতে চাইছে, তাঁরই ভয়ে বলছে না। তাই তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনি সশব্দে

মোজা-সেলাইয়ের পুঁজিপাটা সমেত প্রস্থান করলেন। অবশ্য বেশি দূর গেলেন না। আড়ালেই কোথায় কান পাতলেন।

উজ্জয়িনী বলল, "বাবা, তুমি আজকাল কী সব ভাব, আমাকে বল না তো!"

যোগানন্দ বললেন, "সেই সুন্দর ছেলেটির কথাই ভাবি। সে বিলেত চলে যাচ্ছে। তার যাবার আগে তাকে আমার বুকে নিতে চাই। তা সে রাজি হবে কেন, যদি না তুই রাজি হস্?"—এই বলে সস্নেহে কন্যার মুখের দিকে তাকালেন।

উজ্জয়িনী কাঁপছিল। এমন কথা সে কোনোদিন কল্পনায় আনে নি। মনে মনে একটা ব্রত বেছে নিয়েছিল, আদর্শও। বহুদিন থেকে সে স্থির করে রেখেছিল সিস্টার নিবেদিতার মতো সিস্টার উজ্জয়িনী হয়ে গরিবদের খুকীদের নিয়ে একটা ইস্কুল চালাবে। ইস্কুলের সঙ্গে ক্রমে জুড়ে দেবে একটি হাসপাতাল। অনাথাশ্রম কথাটা তার বিশ্রী লাগে। তাতে দীনতার উৎকট গন্ধ, সে দীনতা দয়ার পীড়নে বাড়ে। সিস্টার উজ্জয়িনীর সঙ্গে যারা থাকবে তারা তার বোন, হলই বা তারা পিতৃমাতৃহীন, হলই বা তারা নিঃস্ব। "ভিক্ষুণীর অধমা সুপ্রিয়া" একা তাদের অভাব মেটাবে।

উজ্জয়িনী বলল, "বাবা, তুমি কি আমার বিয়ে দিতে চাও?"

যোগানন্দ একটু দমে গেলেন।—"হাঁ, না, বিয়ে ঠিক নয় মা, বাগ্‌দান। লোকে ওইটেকেই বিয়ে বলে বটে। বলুক না, তুই যেমন আছিস তেমনি থাকবি, লাভের মধ্যে একটি সহকর্মী পাবি। হ্যাট-কোট-পরা বাঁদর নয়, নিজের মতো করে বাঁচবার স্পর্ধা রাখে।"

মিসেস গুপ্ত আর সইতে পারছিলেন না। পাশের ঘর থেকে

উঁচু গলায় বলে উঠলেন, "আমার জামাইদের যে বাঁদর বলে সে নিজে বাঁদর।"

কঠিন বাধা পেয়ে গুপ্তসাহেব থামলেন। উজ্জয়িনীও লজ্জায় নীরব রইল।

৪

সেদিনকার কথাবার্তার ওই শেষ। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে পিতাপুত্রীতে ও বিষয়ে শেষ কথা হয়ে গেল। উজ্জয়িনী অনেক ভেবে রাজি হল। বাদলকে সহকর্মীরূপে পাবার আশায় সে তার ব্রতের খানিকটা ভাঙল ও বাকীটাকে বাদলের উপযুক্ত করে গড়ল। এই তার জীবনের প্রথম আদর্শচ্যুতি। বাস্তবের সঙ্গে এই প্রথম সে রফা করল। এতে তার মর্মান্তিক কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু কাকে বোঝায়! তার কৌমার্য রইল না। সকল মেয়ের মতো তারও পতন ঘটল। সিস্টার উজ্জয়িনী হবার স্বপ্ন অকালে টুটল। ভারতবর্ষের একটি মেয়েও বিদেশিনীদের সমকক্ষ হল না। সকলের মতো তারও জীবনে ওই খাড়া বড়ি থোড় স্বামী শাশুড়ী শ্বশুর।

যাক্, স্বামীটি তবু বড়দি ছোড়দির স্বামীদের মতো হবে না, ভাবুক ও কর্মী হবে। দুজনে মিলে ইস্কুল খুলবে, খোকা ও খুকী দুই নেবে। একলা মানুষ বড় অসহায় বোধ করত, দুটি মানুষ পরস্পরের কাছে বল পাবে।

উজ্জয়িনীর বন্ধুতালিকা ছোট। তাতে একটিমাত্র নাম—তার বাবা। এইবার আর একটি নাম—তার স্বামী। নতুন বন্ধুটি বিলেত

যাচ্ছে, অতএব বিলেতে তার একটি বন্ধু থাকল। ভাবতে বেশ লাগে যে দেশে দেশে তার বন্ধু আছে। শিশুকাল থেকে বিলেত সম্বন্ধে তার কৌতূহল। একদিন সে বিলেতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবে কোথায় Little Nellএর দোকান ছিল, কোথায় কেনিলওয়ার্থ দুর্গ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কোথায় কাজ করতেন, ইংরেজদের পার্লামেণ্ট কেমন। অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনেছে, তাতে তার কৌতূহল কমেনি, বেড়েছে। এইবার তার বন্ধু যদি বিলেতে থাকে তো সে বিলেতে গিয়ে পথ ভুলে যাবে না, অসাধু গাড়োয়ানকে বেশী ভাড়া দিয়ে ফেলবে না। তার বন্ধু তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

উজ্জয়িনী যদি বাদলের চিঠি পেত তবে নিশ্চয় চিঠির জবাব দিত। সম্ভবতঃ সব কথার অর্থ বুঝত না, বাবার কাছে বুঝে নিত। বিবাহভঙ্গের কথায় চমকে উঠত—মা গো, তা নাকি হয়! কিন্তু খুশি হয়ে আলাপ করত। জিজ্ঞাসা করত, আপনি ওদেশে গিয়ে কী পড়বেন, দেশে ফিরলে কী করবার স্বপ্ন দেখবেন, সোশ্যাল সার্ভিসে জীবন ব্যয় করতে আপনার মন যায় কি না। হয়তো আপনি স্বাধীনতার উপাসক, সুভাষবাবুর মতো আই সি এস্ পাস করে ছেড়ে দেবেন। এমনি কত কথা। বাবার বন্ধুত্বে তার অতৃপ্তি ছিল, কারণ বাবার জীবনে নব নব সম্ভাবনা আশা করা যায় না, বাবাকে নিয়ে তার কল্পনা আকাশে আকাশে উড়তে পারে না, বন্দরে বন্দরে ভিড়তে পারে না। বাদলের সমস্ত জীবনটাই সামনে পড়ে। বাদলের বন্ধুত্ব তাকে কত নদীর কত সমুদ্রের সংবাদ দেবে, কত বিদ্যার কত অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাবে। হয়তো ভারতবর্ষের ভাবী নেতা হবে তার বন্ধু, অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার।

এইসব আকাশচুম্বী কল্পনার দ্বারা তার ভূমিসাৎ কল্পনার ক্ষতিপূরণ হল। ক্রমে ক্রমে ওতেই সে রস পেতে আরম্ভ করল। অন্যান্য মেয়েদের মতো সে পুতুল নিয়ে খেলা করেনি, লুকিয়ে প্রেমের গল্প পড়েনি, যেখানে ছেলেমেয়েরা মিলিত হয়ে খুশি হয়েছে—যেমন পার্টি বা অভিনয়—সেখান থেকে সরে গিয়ে সে মুক্ত আকাশের তলে তারা চিনতে বসেছে। সে যে কোনোদিন সামাজিক জীব হবে এ আশা তার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেছিলেন। পাগলী বলে তার দিদিরা তাকে ক্ষেপাত এবং নিজেদের দলবল থেকে বাদ দিত। ইস্কুলে যায়নি বলে মেয়ে-বন্ধু তার হয়নি। তার বাবা যেখানেই বদলি হন সেখানেই পাশের বাড়ির বাসিন্দেরা ইংরেজ, তাদের মেয়েরা বিলেতে কিংবা পাহাড়ে পড়াশুনা করে, কাজেই বিদেশী কোনো মেয়ের সঙ্গে উজ্জয়িনীর সচরাচর আলাপ হয় না এবং যদি বা কোনো সুযোগে কারুর সঙ্গে ভাব হয়ে যায় তেমন দুর্লভ বান্ধবীর পিতা কোথায় বদলি হয়ে যান।

বিবাহের সম্ভাবনা উজ্জয়িনীকে অকস্মাৎ মনে করিয়ে দিল যে তার জীবন অদ্যাবধি অর্ধাশনে কেটেছে, জীবনের বড় একটা রস তার পাতে পড়েনি। বাদলের সঙ্গে সম্বন্ধ তাকে কত অপূর্ব স্বাদ দিতে পারে এ কথা কল্পনা করতে গিয়ে সে প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারী কথা" খুলে বসল। এবার তার বাবাকে তার পড়ার সাথী করতে তার লজ্জায় বাধল। মনের কথার ভাগ দিতে না পারলে মনের অসুখ করে। তার মধ্যে একটা সদা-সচকিত ভাব এসে পড়ল। রয়ে রয়ে অকারণে চমকে ওঠে, যেন কেউ তার মনের ভাবনা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, যেন তার মনের ভাবনাগুলি চোরাই মাল।

৫

মিসেস গুপ্ত বিবাহের আয়োজনে গা করলেন না। তাঁর দলের লোক যোগানন্দকে খেয়ালী ও বিষয়বুদ্ধিহীন বলে গাল পাড়লেন। লিলি-ডলিরা গালে হাত রেখে বা হাতে গাল রেখে থ হয়ে রইল। বলল, "ও ডিয়ার! বেবীর যে এখনো পুতুলখেলার বয়স যায়নি। একটা ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে।" মিসেস গুপ্তের বোন মিসেস দাশ দুটি প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা সমেত প্রত্যেক নিমন্ত্রণে গিয়ে থাকেন, ঐ তাঁর নিত্যকর্ম। উজ্জয়িনীর বিবাহের বার্তা পেয়ে তাঁর মনে হল ওটা যেন তাঁর কন্যাদের অবমাননা। কেবল দু'চারজন উদারচরিত আত্মীয় সুখী হয়ে বললেন, কালো মেয়ের পক্ষে এই যথেষ্ট ভালো। এক্ষেত্রে সবুরে মেওয়া ফলে না।

অর্ধ হিন্দু ও অর্ধ ব্রাহ্ম মতে এক দিন উজ্জয়িনীর বিবাহ হয়ে গেল। বাদলকে প্রথম দৃষ্টিতেই তার ভালো লাগল। বিবাহের পূর্বে একবার বাদলের কিংবা তার প্রতিকৃতিকে দেখতে চায় কি না জিজ্ঞাসা করায় সে লজ্জায় মাথা নেড়েছিল। তার মা গোড়া থেকেই গাম্ভীর্য অবলম্বন করেছিলেন। একটা রায়বাহাদুরের ছেলে যে গোরু ছাড়া আর কিছু হতে পারে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। তাকে দেখলেই কি তার জন্মদুর্ভাগ্য খণ্ডে যাবে? তার বাবা জোর করে বলেছিলেন, আমি জানি সে সুন্দর। সুন্দরকে যাচাই না করলেও সে সুন্দরই থাকে।

উজ্জয়িনী বাদলকে দেখে পিতার মতে মত মিলাল। প্রত্যেক কুমারীই নিজের বলে যে মানুষটিকে পায় তাকে প্রথম দেখাতেই রূপবান ভেবে থাকে। উজ্জয়িনী বাদলকে বাদল বলে কি স্বামী

বলে—কী বলে রূপবান ভাবল সেই জানে। বাদলের কিশোরতুল্য লাবণ্যময় মুখচ্ছবি মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করে নিল। যেন বহুবর্ষের ব্যবধানে মুছে না যায়। এ কথা ভাবতে তার কষ্ট হচ্ছিল যে বাদল সপ্তাহকাল পরে সমুদ্রপারে চলে যাবে। তার চক্ষুর বিরহ কতকাল ঘুচবে না।

কে আগে কথা বলবে—বাদল, না, উজ্জয়িনী? বহুকাল নীরবে কাটবার পর বাদল ভাবল, ওটা পুরুষ মানুষেরই কর্তব্য। পুরুষেই তো প্রপোস্ করে। বলল, "এক্স্‌কিউস্ মি। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে কি?"

উজ্জয়িনী বিষম ব্যগ্রতার সহিত উত্তর দিল, "না, না, কিছুমাত্র না।"

"তবে আপনি বসে আছেন যে?"

"ঘুম পায় নি।"

কথা জমল না। বলবার মতো কিছু কোনো পক্ষই খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যেই কখন এক সময় বাদল ঢুলতে শুরু করেছে। একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই সে লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, "আই বেগ্ ইওর পার্ডন্।"

উজ্জয়িনী নীচু গলায় বলল, "হয় তো আমিই ব্যাঘাত করছি।"

বাদল সংকোচের হাসি হেসে বলল, "ইন্‌সম্নিয়ার রুগীর আপনি ব্যাঘাত করবেন কী করে?"

উজ্জয়িনী এর উত্তরে বলল, "অভয় দেন তো বলি অনিদ্রার লক্ষণ দেখছিনে।"

উজ্জয়িনী তার চিঠির জবাব দেয়নি বলে তার উপর বাদলের রাগ ছিল। এই সুযোগে বলল, "আমাকেও অনুমতি দেন তো জিজ্ঞাসা করি আমার চিঠির জবাব দিলেন না কেন?"

উজ্জয়িনী আকাশ থেকে পড়ল।—"কোন্ চিঠি?"

"জবাবের জন্যে দেড় মাস অপেক্ষা করছি। পান্নি সে চিঠি?"

"সত্যি পাইনি আমি"—উজ্জয়িনী মিনতির সুরে বলল।

বাদল সান্ত্বনার সুরে বলল, "যাক্। খানকয়েক বই দিয়ে যাব, চিঠির কাজ করবে।"

বাদল তার জন্যে বুক কোম্পানীর দোকান ঘেঁটে ইবসেন, অলিভ শ্রাইনার ও ডি এইচ লরেন্সের একরাশ বই কিনে আনল। তার সবগুলিতে স্বহস্তে উজ্জয়িনীর নাম লিখে দিল—কিন্তু উজ্জয়িনী সেন নয় উজ্জয়িনী গুপ্ত।

আলাপ করতে করতে কখন তাদের জড়তা কেটে গেছে। মেলামেশা সহজ হয়ে এসেছে। উজ্জয়িনী অনুযোগ করল, "ভুল লিখেছেন, মিস্টার সেন। দেশ ছাড়বার আগে শুধরে দিয়ে যান।"

বাদল বেশ সপ্রতিভভাবে বলল, "ভুল লিখিনি, মিস্ গুপ্ত। বইয়ের ভিতরটা পড়লেই উপরটার সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করবেন।"

উজ্জয়িনী কখনো এতগুলি নাটক উপন্যাস চোখে দেখেনি। আলাদিন সেই পাতালপুরীতে আনন্দে ও বিস্ময়ে পথ হারিয়েছিল। উজ্জয়িনীর মনে হল এইবার বুঝি কল্পরাজ্যে পথ হারাবে। ছেলেমানুষীর সুরে আব্দার জানিয়ে বলল, "বিলেত গিয়ে আমাকে আরো—আরো—বই পাঠাবেন?"

বাদল যেন তার দাদা! দাদা-সুলভ বীরত্বের ভঙ্গীতে বলল, "অল্-রাইট্। বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হবে কিন্তু। পাস হলে পুরস্কার।"

৬

বাদলকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিতে সপরিবারে গুপ্তসাহেব এলেন।

বাদলের সঙ্গে যোগানন্দের বড় বড় বিষয়ে তর্ক হয়ে গেছে। বাদল প্রমাণ করতে চায় যে, সে সব বিষয়ে অথরিটী। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্বন্ধেও তার নিজস্ব থিওরী আছে। কিন্তু যোগানন্দ তাকে সংস্কৃতে হার মানালেন। বাদলের মুখ দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলেন যে সে সংস্কৃত "উত্তররামচরিত" পড়েনি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাংলা সমালোচনা পড়ে তর্কে নেমেছে। এতে বাদলের মনটা যোগানন্দের প্রতি বিরূপ হয়ে গেল।

বিলেত সম্বন্ধে তাই তাঁর অযাচিত পরামর্শগুলো বাদল গণনায় আনল না। বলল, "পোস্টওয়ার ইংলণ্ড সম্পূর্ণ আলাদা জায়গা। আপনার সেকালের গুরু ও বন্ধুরা কোথায় তলিয়ে গেছে, আপনার সেকালের রুটিওয়ালা বা নাপিতের ঠিকানা জানেন তো বলুন, হয়তো তারা এখন পার্লামেণ্টের মেম্বার।"

বাপের সামনে যার মুখ খোলে না শ্বশুরের সামনে যে সে বিপিন পাল হয়ে উঠল এর কারণ যোগানন্দের ব্যবহারের জাদু। তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হতে জানেন, ছাত্রের সহিত সহপাঠী। তাঁকে সমবয়স্ক বলে ভ্রম করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল।

যোগানন্দ বললেন, "কী বল, বাদল, বম্বে অবধি তোমার সঙ্গে গেলে কেমন হয়? তর্ক করবার লোভটা দুর্দমনীয় হয়ে উঠছে যে।"

বাদলের হৃদয় অজানার প্রতীক্ষায় আনন্দে উদ্বেগে দোলায়িত হচ্ছিল। যাত্রার প্রাক্কালে কারুর কথায় মন দেবার মতো মন তার ছিল না, কারুর প্রতি আসক্তি তার চোখে জল এনে দিচ্ছিল না। সে টাইম-টেব্‌লের পাতা উল্টানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। গাড়ী কখন রায়পুরে পৌছবে, কখন নাগপুরে, কখন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে, তাই যেন সে মুখস্থ করছিল। উজ্জয়িনী তার জিনিসপত্র বার বার গুনছিল, একটা জিনিস

ভুলবশত অপরের বার্থের নীচে রয়েছিল, সেটাকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না, অকারণে কুলিগুলোকে বার বার দৌড় করাচ্ছিল।

মিসেস গুপ্ত তাঁর বিলিতী মুরুব্বি ও কুটুম্বগণের কাছে বাদলের পরিচয়পত্র লিখে এনেছিলেন। চেল্‌টনহামের এক অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান দম্পতি, এবারডিনের এক মিশনারী বুড়ী মিস, এক পিসতুতো বোনের জামাই, এক ননদের দেওরের ছেলে ইত্যাদি জনকয়েকের কাছে লেখা বাদলের পরিচয়পত্র আসলে তার শ্বশুরকুলের পরিচয়পত্র। পত্রের মধ্যে ঢের বাজে কথাও ছিল। যথা, "দেশে গিয়ে আর আমাদের মনে পড়ে না বুঝি।" "শত যুগ হল চিঠি পাইনি।" "দুষ্টু পিটারটাকে তার ভারতীয় খুড়িমার অনেক অনেক চুমু।" "আমরা হতভাগারা এই গরম দেশে পড়ে রইলুম।"

বাদলকে বললেন, "পৌঁছেই এঁদের সঙ্গে দেখা কোরো, বাছা। এঁরা হলেন কিনা আমাদের আপনার লোক।"

বাদল মনে মনে বলল, "চেল্‌টনহাম আর এবারডিন লণ্ডন থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা কিনা, পৌঁছেই ধন্না দেব!"—ভাবল, মাদার-ইন-ল'কে ইংরেজরা শতহস্ত দূর থেকে পরিহার করে, আমি তো এঁকে পরিত্যাগই করব। কা তব কান্তা, কা তব শাশুড়ী! এই হল আমাদের নব নীতিশাস্ত্রের বচন।

দয়া করে চিঠিগুলোকে জানালার কাছে স্তূপাকার করল, ট্রেন ছাড়লেই ইংলণ্ডের উদ্দেশে বাতাসে উড়িয়ে দেবে।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এলে উজ্জয়িনী বাদলের পায়ের ধুলো নিতে গেল। কার কাছে সে এমন অবৈজ্ঞানিক ও অন্‌-ইঙ্গবঙ্গ কুসংস্কারটা পেল সেই জানে। বাদল বলল, "এ কী!"

উজ্জয়িনীর হৃদয়ে সঞ্চিত বাষ্প মেঘরূপে বর্ষণের ছল খুঁজছিল,

মুষলধারে ঝরে পড়ল। বাদল তো অবাক! উজ্জয়িনী যে তাকে এই ক'দিনে ভালোবেসে ফেলে থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা সে কল্পনায়ও আনেনি। তার নিজের দিক থেকে যখন ভালোবাসা নেই তখন অপরের দিক থেকে থাকবে কেন? অতি অকাট্য যুক্তি।

তবু তার মনটা ঈষৎ ভিজল। সে বলল, "আপনাকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী দিয়ে যাই—Go farther, always go farther."

উজ্জয়িনী প্রণাম করে নেমে গেল। যোগানন্দ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "আমারও মন উড়ু উড়ু করছে, বাদল। ছুটি পেলে তোমার সঙ্গেই দৌড় দিতুম ও দেশে। যাক্, তোমার মনের সঙ্গে আমারও মন ইউরোপ বেড়াতে চলল। যত পার চিঠি লিখো।"

ভাসমান পুরী

১

জাহাজের সিঁড়িতে এক পা রেখে ভারতবর্ষের মাটি থেকে আর-এক পা তুলে নেবার সময় বাদল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। রেলপথ নর্মদা-তাপ্তির বন্যায় ভেসে যায়নি, ট্রেন বিলম্বে বম্বে পৌছায়নি, জাহাজ ইতিমধ্যে ছেড়ে দেয়নি। এবার জাহাজডুবি না হলে সে নির্ঘাত ইউরোপে পৌছে যাবে। আপাতত ইংলণ্ডের জাহাজ তো ইংলণ্ড।

জাহাজে উঠে বাদলের বাবার প্রথম উক্তি হল, "এরই নাম জাহাজ! বেশ বানিয়েছে তো? ইংরেজের মাথা আছে।"

জীবনে কখনো জাহাজে চড়েননি। কলকাতায় প্রথম এসে ট্রামে চড়বার সময় পল্লীগ্রামের লোকের মনের ভাব যেমন হয় তাঁরও হল তেমনি। তিনি উচ্ছ্বসিত বাক্যে সেই বিরাট জলদুর্গের বন্দনা করতে থাকলেন। প্রায় একুশ হাজার টন বইতে পারে সেই জাহাজ। তাতে ডাক্তার আছে, নাপিত আছে, ধোপা আছে। তার প্রকাণ্ড ভাণ্ডারে চর্ব্য এবং পেয় প্রচুর পরিমাণে মজুত। তার নিজস্ব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রত্যহ বেতার বার্তা প্রকাশিত হয়। তার নিজস্ব প্রেস আছে। ধন্য ইংরেজ! বলিহারি যাই! হতভাগা দেশী লোকগুলো বলে কিনা স্বরাজ চাই!

নিজের ক্যাবিনটা একবার দেখে নেবার জন্যে বাদল ছটফট করছিল। কিন্তু সেই গোলোকধাঁধার মধ্যে কোনটা যে ৩৭১ নম্বর বার্থ কে তাকে বলে দেবে? সে ইতস্ততঃ করছে। তার বাবা জাহাজের এক স্টুয়ার্ডকে

মস্ত একজন কেষ্টবিষ্টু ঠাওরে এক সেলাম ঠুকে বললেন, "সার্, আমি পাটনার রায়বাহাদুর এম সি সেন, য়াডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এটি আমার পুত্র মিস্টার বি সি সেন। ক্যাপ্টেন ওয়াই গুপ্ত আই-এম-এস, যিনি প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক এক্স গুপ্তের পুত্র, এটি তাঁরই জামাতা। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বিলেত যাচ্ছে।"

স্টুয়ার্ডটা কী বুঝল কে জানে। তার কাজের তাড়া ছিল। সে পিতাপুত্রকে জাহাজের এন্‌কোয়ারী অফিসে পৌঁছে দিয়ে "গুড্ মর্নিং, সার্" বলে টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে বিদায় নিল। রায়বাহাদুর এন্‌কোয়ারী অফিসে উপরোক্ত উক্তির পুনরুক্তি করলেন। অফিসের লোক বলল, "আপনার জন্যে কী করতে পারি?" রায়বাহাদুর একগাল হেসে বললেন, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনি কী না করতে পারেন! আমার একমাত্র সন্তান কত দূর দেশে চলে যাচ্ছে…(আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল)… একটু দেখবেন শুনবেন জাহাজে যে ক'দিন থাকে। গোমাংসটা যেন না খেতে হয়, হিন্দুর ছেলে।"

বাদলকে ঘোর লজ্জা থেকে বাঁচাল একটি অপরিচিত যুবক। বাদলকে ইশারায় ডেকে বলল, "ক্যাবিন খুঁজে পেয়েছেন? পান্‌নি? ৩৭১ নম্বর তো? আপনাকে ও আমাকে একই ক্যাবিনে দিয়েছে। আর একটি ভদ্রলোককেও দিয়েছে। মিস্টার রামমূর্তি।"

বাদলের খুব স্ফূর্তি বোধ হচ্ছিল। স্ফূর্তি গোপন করে বলল, "কোন্ রামমূর্তি? সেই প্রসিদ্ধ পালোয়ান নয় তো?"

যুবকটি হেসে বলল, "না বোধ হয়! কিন্তু না দেখলে বিশ্বাস নেই। রামমূর্তিকে দিয়েছে ঠিক আপনার বার্থের উপরের বার্থটা। ভেঙে পড়লে আপনার ঘাড়ে পড়বে কিন্তু।"

বাদলদের ক্যাবিন E ডেকে। পাঁচতলা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে যেমন উপরে উঠতে হয় জাহাজের তেমনি নিচে নামতে হয়। লিফ্‌ট্‌ ছিল। রায়বাহাদুর লিফ্‌ট্‌ দিয়ে নেমে যাবার সময় আর একবার ইংরেজ-স্মরণ করলেন।

"এই তোদের ক্যাবিন! বেশ তো। খুব বুদ্ধি খাটিয়েছে কিন্তু। হাত মুখ ধোবার ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকম জল অনবরত হাজির। ওটা কী?" (চাকরকে ডাকবার বেল্‌-এ হাত দিলেন। বহুদূরে কোথায় ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হল। অমনি একটা স্টুয়ার্ড ছুটে এল। গোয়ানিস্‌।)

রায়বাহাদুর প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন। ভাগ্যবান! ক্রমাগত বিলেত যাওয়া আসা করছে। ওর বংশপরিচয় নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ও তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "এখনি জাহাজ ছেড়ে দেবে। আর দেরি করবেন না।"

রায়বাহাদুর কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "য়্যাঁ?"

বাদলের দিকে অনিমেষচোখে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথলে পড়তে লাগল। তাঁর একমাত্র সন্তান বিদেশ যাচ্ছে। কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে শ্রীভগবানই জানেন। তার কুশলের জন্যে ভারতবর্ষের যেখানে যত দেবতা আছেন সকলের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলেন। কালীঘাটের কালী, কাশীর বিশ্বেশ্বর, পুরীর জগন্নাথ।

এদিকে ভয়ও হচ্ছিল পাছে তখনি জাহাজ ছেড়ে দেয়, তিনি জাহাজে থেকে যান। চাকরিটি খোয়াতে হবে। বাদলকে টেনে নিয়ে তিনি উপরের ডেক্‌-এ চললেন। লিফ্‌ট্‌ওয়ালাকে মোটা বখশিষ দিলেন। তখনো অনেক সময় ছিল। তাঁর মতো অনেকে তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে গল্প করছে, বিদায়ের ব্যথাকে পিছিয়ে রাখছে। রায়বাহাদুর রুমাল দিয়ে ভালো করে চোখ মুছলেন। জোর করে একটু হাসলেনও।

"তারপর, বাদ্‌লা। এডেন থেকে চিঠি দিস। সুয়েজ থেকে চিঠি দিস। পৌঁছে টেলিগ্রাম করিস। সুধী এতদিনে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। ওর সঙ্গে, ওর হেফাজতে থাকিস। সাবধান হয়ে রাস্তা পারাপার করিস, মোটর গাড়ীর সামনে বাহাদুরি দেখাসনে। বুঝলি? আর ঐ যে মাংসটা ওটা কখনো মুখে দিসনে। আর খবরদার কখনো বোল-শেভিকদের ছায়া মাড়াসনে।"

সময় আছে শুনে আশ্বস্ত হয়ে রায়বাহাদুর বাদলের জন্যে এক ইংরেজ মুরুব্বি পাকড়াও করলেন। কিন্তু বাদল কখন সেখান থেকে সরে পড়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করে বেড়াল। তার উত্তেজনার অবধি ছিল না। এতকাল পরে তার জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চলল! ইউরোপ! সে কি পৃথিবীর অংশ! কত মহামনীষীর তপস্যা তাকে সূর্যের মত দ্যুতিমান করেছে, তার দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়। কত কীর্তি কত কাহিনী কত ঘটনা কত আন্দোলন কত তত্ত্ব কত সন্ধান কত সালোঁ কত ক্লাব—ভাবতে বাদলের মাথা ঘোরে। বাদল যেন মঙ্গলগ্রহে চলেছে। এইবার সকলকেই সে স্বচক্ষে দেখবে। পথের ভিড়ে একদিন গায়ে গা ঠেকে যাবে। কে? না, অল্‌ডুস্‌ হাক্সলি। ট্রেনে যেতে যেতে কী সূত্রে আলাপ হয়ে যাবে। কে? না, মিড্‌লটন মারি। দুর্যোগে কার দিকে ছাতা বাড়িয়ে দেবে। কে? না, ভার্জিনিয়া উলফ্‌।

:

আর-একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে মুখোমুখি।—"চিনতে পারেন, বাদল বাবু?"

"বড় দুঃখিত হলুম।"

"আমি নওলকিশোর প্রসাদ। পাটনার ছেলে।"

"কলেজ কী? লণ্ডন না কেম্ব্রিজ না অক্সফোর্ড—কোথায় পড়বেন?"

যুবকটি সলজ্জভাবে বলল, "আমি শুধু একজনকে তুলে দিতে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে এঁকে দেখেন শোনেন। মিস্টার বাদলচন্দর সেন—মিসেস মিথিলেশকুমারী দেবী।"

বাদল bow পূর্বক 'হাউ ডু ইউ ডু' করল। মহিলাটি বেশ সপ্রতিভভাবে সু-উচ্চারিত ইংরেজীতে প্রাতধ্বনি করলেন।

বাদল যেন নিজের লোক পেয়ে গেল।—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুশি হলুম।"

"আমিও।"

"জাহাজে আর-কারুর সঙ্গে ভাব আছে কি?"

"না। একমাত্র আপনার সঙ্গেই।"

বাদলের ভারি আহ্লাদ হচ্ছিল। একে ইউরোপ চলেছে। তায় ইতিমধ্যে একটি মেয়ে-বন্ধুর মুরুব্বি। কিছু উপদেশ দিয়ে ফেলল।—"দেখুন, আপনার সী-সিক্‌নেস্ হতে পারে। এইবেলা কিছু কলা খেয়ে নিন। আমার সঙ্গে অনেক আছে।"

"কই, কোথাও তো এ কথা শুনিনি যে কলা খেলে সী-সিক্‌নেস্ ছাড়ে!"

"শুনবেন কী করে? ও যে আমাদের পেটেণ্ট মেডিসিন। আমার এক প্রোফেসারের প্রেস্ক্রিপশন।"

জাহাজ ছাড়বার আগে বাইরের লোকদের নেমে যাবার সংকেত জানাবার ঘণ্টা বাজল। নওলকিশোরকে নামিয়ে দেবার জন্যে বাদলের সঙ্গে মিথিলেশকুমারী সিঁড়ি অবধি গেলেন। নওলকিশোর দুজনের সঙ্গে করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে নেমে যাবার পর

যতক্ষণ জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ নিচে থেকে মিথিলেশকুমারীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলেই হোক কি বিদায়-বেদনাতেই হোক নওলকিশোরের চক্ষু ঝাপসা হয়ে এল। চোখে রুমাল দিলে পাছে বন্ধুকে শেষ দেখা দেখবার মেয়াদটুকু সংকীর্ণ হয়ে যায় এই মনে করে নওলকিশোর রুমাল বের করল না। তার গণ্ড বেয়ে জলের স্রোত বয়ে গেল।

কে কার দিকে তাকায়! সকলেরই অনুরূপ অবস্থা। যেমন জাহাজের উপরে তেমনি জাহাজ-ঘাটে। বাদলের পিতা যুগপৎ কাঁদছেন ও হাসছেন। হাসিটাও করুণরসাত্মক। বোধ করি মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে ওটুকুর ভান করছেন। ইংরেজরা প্রস্থানোন্মুখ বন্ধুদের উদ্দেশে বলছে, চীয়ারিও জ্যাক্, চীয়ারিও ওল্ড বোয়। রায়বাহাদুর তাদের অনুকরণে বলছেন, "চীয়ারিও বাদল, চীয়ারিও **Sonny Boy.**" রায়বাহাদুরের বম্বে-প্রবাসী বন্ধু ডাক্তার মিত্র পর্যন্ত ছোঁয়াচ এড়াতে না পেরে ছলছল চোখে বাদলের উদ্দেশে রুমাল নাড়ছেন।

সিঁড়ি সরিয়ে নিল। ঘাটের উপর যে দু'একটা চিঠির বস্তা তখনো অবশিষ্ট ছিল সেগুলিকেও ক্রেন্-এর সাহায্যে ওঠানো হল। জাহাজ খানিকটা চলে আবার থামল। তখন রায়বাহাদুর নওলকিশোর প্রভৃতি যাঁরা জাহাজের সঙ্গ ধরে হাঁটছিলেন তাঁরা বিদায় কালের এই অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধিতে পুলকিত হলেন। এবার তাঁরা সত্যিই হাসলেন।

কিন্তু বাদল অধৈর্য হয়ে উঠছিল। সুধীদা চলে গেছে কবে! বাদল যেতে পারছে না আজও! সুধীদা এতদিনে পৌঁছে জমিয়ে বসেছে ও দেশে। বাদল যাবার বেলায় বাধা পাচ্ছে।

অবশেষে জাহাজ পূরো দমে চলল। ইতমধ্যে কেউ কেউ জাহাজ-ঘাট ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেছেন। যাঁরা বাকী ছিলেন তাঁরা জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না। জাহাজ হঠাৎ মোড় ফিরল এবং কূল ধরে না ছুটে অকূলের দিকে ছুটল। জাহাজ ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে দেখে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাট ছাড়লেন। দু চারজন নাছোড়বান্দা শেষ চিহ্নটি যতক্ষণ না মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে রুমাল নাড়তে থাকল। তারা বোধ করি নবপরিণীত স্বামী কিংবা পরম উদ্যোগী প্রণয়ী। নওলকিশোর তাদের সবাইকে লজ্জা দিল। সে পলক ফেলল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, পাছে তার বন্ধুকে সে কম দেখতে পায়। বেচারা জানত না যে ইতিমধ্যে কখন মিথিলেশকুমারী ডেক থেকে খাবার ঘরে নেমে গেছেন।

বাদল নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। গেট্‌ওয়ে অফ ইণ্ডিয়া দেখা যাচ্ছিল তখনো। ওটা কেবল আসবার দ্বার নয় যাবারও। ভারতবর্ষের সিংহদ্বারকে বাদল মনে মনে প্রণাম জানাল। হয়তো ফিরে আসবে, হয়তো বিদেশে মরবে। বিদায়! যে দেশ তাকে বিশ বছর কোল দিয়েছে বিদায় তার কাছে, বিদায়!

৩

"মিস্টার সেন, লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ে গেছে। খেতে আসবেন না?" —এই বলে কুবেরভাই বাদলের পিঠের দিকে দাঁড়াল। বাদল ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল, "না, ধন্যবাদ। গা বমি বমি করছে।"

বাদল জাহাজে ওঠবার প্রাকালে পেট ভরে শুধু কলা-ই খেয়েছিল।

"তবে উঠুন, আমার হাত ধরুন, ক্যাবিনে নিয়ে যাই। শুয়ে থাকাই

এ রোগের একমাত্র ওষুধ।”—কুবেরভাই বাদলকে উত্তর দেবার অবকাশ দিল না, টেনে নিয়ে গেল। ক্যাবিনে শুইয়ে দিয়ে ফ্যান খুলে দিল। বলল, “ক্ষিদে পেলেই বেল্ টিপে স্টুয়ার্ডকে হুকুম করবেন। আমি চললুম খেয়ে খানিকটে ছুটোছুটি করতে।”

“তাতে আপনার অসুখ করবে না?”

“হাঃ হাঃ হাঃ। আমার সী-সিক্‌নেস্? শুয়ে থাকলেই আমার অসুখ করে। ঘুরে বেড়ালে করে না। কতবার জাহাজে চড়েছেন আপনি?”

“আমার এই প্রথম।”

“আপনি বাঙালী। না?”

“কায়ায় বাঙালী—মনোবাক্যে ইউরোপীয়।”

“বলেন কী! যাদের আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি আপনি তাদের দলে? ধিক্ ধিক্।”

“কেন ঘৃণা করেন?”

“একশ' কারণ। ওরা মাংস খায়।—”

“আপনি বুঝি নিরামিষাশী?”

“নিশ্চয়। নিরামিষ খাওয়াটা একটা সিম্বলিস্‌ম্ ছাড়া কী? আমরা ভারতবর্ষের লোক কারুর মাংস খাইনে, কারুর রক্ত চুষিনে।”

বাদলের মাথা ঘুরছিল। সে তর্ক করল না। কুবেরভাই বুঝতে পেরে বলল, “আমি কী নির্বোধ। আপনি শোন্। আমি আসছি।”

অসহ্য কষ্টের ভিতর দিয়ে তিনদিন তিনরাত কেটে গেল। বাদল সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে। কুবেরভাই তাকে দু তিন ঘণ্টা অন্তর একবার দেখা দিয়ে ডেকের গল্প বলে গেছে ও রাতের বেলা তার খাতিরে অধিক রাত্রি করে ফিরেছে।

রাত্রি একটার সময় বাদল দেখে ঘরে আলো জ্বলছে।—"কে? কুবেরভাই?"

"এই যে, সেন। এখনো জেগে?"

"ঘুম আসছে না যত চেষ্টা করছি।"

"একপাল মেষ একটির পর একটি যাচ্ছে—চোখ বুঁজে এই ধ্যান কর দেখি।"

বাদল অনেক কষ্টে হেসে বলে, "কতবার ভেড়া গুনেছি। গোলোক-ধাঁধার কেন্দ্র খুঁজেছি। মানসাঙ্ক কষেছি। আরো কত কী করেছি। মাঝখান থেকে আমার স্মরণশক্তি বেড়ে গেল, যা পড়ি তাই মনে থাকে, কিন্তু ঘুম আর হল না।"

কুবেরভাই এমন মানুষ দেখেনি। বিস্ময়ের সহিত রসিকতা মিশিয়ে বলল, "আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে আমার উপর নজর রাখ। ছাখ কেমন করে আমি পাঁচ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ি। দেখলে শিক্ষা হবে।"

কুবেরভাই সত্যসত্যই কথা রাখল। এক ঘরে অন্যের সঙ্গে শুতে বাদলের বিশ্রী লাগে। ঘুম তো আসেই না, তিলপরিমাণ নাসিকাধ্বনি তালপরিমাণ শোনায়। তবু তার সৌভাগ্য রামমূর্তি অন্যত্র একটা খালি ক্যাবিন পেয়ে সরে গেছে।

পরদিন কুবেরভাই রাত্রি ছুটোর পর এল। বেশ বুঝল বাদলের ঘুম আসেনি। তবু তাকে জাগাবার ভয়ে আলো না জালিয়ে নিঃশব্দে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। বাদল ভাবছিল কী ভাগ্যবান এই কুবেরভাই, নিদ্রা দেবী এর ইচ্ছাদাসী।

তিনদিন তিনরাত্রির পর কুবেরভাই বলল, "তোমার অসুখ অমন করলে সারবে না, সেন। এস আমার সঙ্গে খেতে ও খেলতে। জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিকে ও একবার ওদিকে

হেলতে পার যদি, তবে কিছুতেই গা বমি বমি করবে না। সাইকেল চড়তে জান তো ?"

"খুব জানি।"

"তবে আর কী ! ব্যালান্সের ঐ একই প্রিন্সিপ্ল।"

প্রিন্সিপ্লের নাম শুনে বাদল লাফ দিয়ে উঠল। আয়নার সামনে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লে—চোখ বসে গেছে, গাল ধ্বসে গেছে, নোনা হাওয়া লেগে মুখমণ্ডল চটচট করছে, স্নান না করায় চুলের চেহারা পুরোনো কম্বলের মতো। কুবেরভাই তাকে ধরাধরি করে স্নানের ঘরে পৌঁছে দিল।

জাহাজে এই প্রথম বাদল খাবার ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খেল। কোথায় মিথিলেশকুমারী ? বাদলের চোখ একে একে সব ক'টা টেবিল খানাতল্লাসী করল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছুরি কাঁটা চামচ সমান বেগে চালাচ্ছে। তাদের পেয়ালা ও প্লেট থেকে টুং টাং ধ্বনি উঠছে। ওয়েটারদের চাঞ্চল্যে সমস্ত ঘরটা তোলপাড়। একজন এসে বাদলের হাতে সেইদিনকার একখানা ছাপানো মেন্থ বাড়িয়ে দিল।

কুবেরভাই বলল, "মেন্থতে নেই এমন অনেক জিনিস চাইলে পাওয়া যায়। চাও তো ডাল ভাত ও নিরামিষ তরকারি দিয়ে যাবে। বলব ?" —কুবেরভাই নিজের জন্যে তাই আনতে দিল।

বাদল বলল, "যে দেশে যাচ্ছি সেদেশে যা খায় তাই আমার খাদ্য।" এই বলে 'পরিজ' ইত্যাদির ফরমাস দিল।

ব্রেকফাস্টের পর কুবেরভাই তাকে বসবার ঘরে নিয়ে যেতে চায়। বাদল বলে, "একজনের সঙ্গে দেখা করা আমার কর্তব্য।"—অনিচ্ছাসত্ত্বে কুবেরভাইকে সঙ্গে নিল।

মিথিলেশকুমারীর ঘরে টোকা মারতেই ভিতর থেকে অনুমতি এল। বাদল বলল, "গুড্ মর্নিং, মিসেস্—"

মিথিলেশকুমারী বললেন, "গুড্ মর্নিং। ইনি?"

যথারীতি পরিচয়ের পর মিথিলেশকুমারী বাদলকে বললেন, "মরেছি কি বেঁচে আছি একবার খবরও নিলেন না। কোথায় ছিলেন এতদিন? এ যে একটা যুগ!"

বাদল অপরাধ স্বীকার পূর্বক মার্জনা ভিক্ষা করে বলল, "আমি নিজেই শয্যাগত ছিলুম।"

"তারপর, আপনি কেমন ছিলেন?"

কুবেরভাই বলল, "আনন্দে ছিলুম। ধন্যবাদ।"

মিথিলেশকুমারী কৃত্রিম হাস্যভরে বললেন, "ভাগ্যবান।"—তিনি সেদিন বেশ সুস্থই ছিলেন। কেবল ভয়ে ভয়ে উপরে উঠছিলেন না। তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীটি তাঁকে টানাহেঁচড়া করে নড়াতে পারেন নি। ছোটখাট হস্তিনী বিশেষ। কিন্তু দুটি যুবকের অনুরোধ তাঁকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেকের উপর ঠেলে নিয়ে চলল।

জাহাজের ভিতরে কেমন একরকম গন্ধ। ডেকে ও-গন্ধ নেই। প্রচুর বাতাস অনবরত হু হু করছে। বাদল বুঝল গা-বমিবমির প্রধান কারণ ঐ জাহাজী গন্ধটা। এবং তার প্রধান প্রতিষেধক সমস্ত আকাশের রাশীকৃত নিঃশ্বাসের মতো ঐ বাতাস। মরি মরি কী আকাশ! যেন একটা বিশাল গোলাকার বৃন্তহীন ছত্র সমুদ্রকে আবরণ করেছে। "দশ দিক" বলে একটা কথা আছে বটে। তার থেকে একটা দিকে তো সমুদ্র। বাকী নয়টা যে কোথায় বাদল খুঁজে পেল না।

ডেকের উপর ইতিমধ্যে বেশ জনসমাগম হয়েছে। কারা ডেক্-টেনিস খেলছে। কারা দড়ির চাকতি ছুঁড়ে একটা বিশেষ বৃত্তের ভিতর

ফেলবার চেষ্টা করছে। নিজ নিজ চেয়ারে বসে অনেকেই কিছু পড়ছে বা সেলাই করছে। বেশীর ভাগ লোক পায়চারি করতে করতে এখানে ওখানে ভিড়ে যাচ্ছে, রেলিংএর উপর ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভারি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন কী একটা জরুরি কাজে যাচ্ছে—হয়তো উড়ুক্কু মাছ দেখতে।

বাদলের ইচ্ছা করছিল তাদের ছু'একটির পথরোধ করে বাহু মেলে দাঁড়ায়। বলে, থাম থাম থাম, আমাকে তোমাদের সঙ্গী করবে না? কুবেরভাইকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, "একটিকে আটকাব?"

কুবেরভাই সাতঙ্কে বলল, "কক্‌খনো ও-কর্ম কোরো না। ওদের বাপ মা-রা ঘ্যাক করে তেড়ে আসবে। কিংবা ভাববে আমাদের বাচ্চাদের একটি পুরুষ-আয়া জুটেছে। শাদাতে কালাতে এত মাখামাখি কিসের?"

বাদল ভাবল কুবেরভাইয়ের বড় ছোট মন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ পিছিয়ে দিল।

মিথিলেশকুমারী রেলিংএর উপর ঝুঁকে ফেনলীলা নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীর সঙ্গে একটি যুবক। সকলে মিলে আলাপ পরিচয় হল। মিস্ জাকারিয়া (দেশী খ্রীস্টান)। মিস্টার আচারিয়া (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ)। নাম শুনে কুবেরভাই রসিকতা করে বলল, "Rhyming Couplet"—সকলে হেসে উঠল।

মিস্ জাকারিয়া বললেন, "বা মিসেস্ দেবী, ডেক্-এ আসতে এত সাধলুম, তখন এলেন না!"

মিসেস দেবী মিষ্টি হেসে বাদলের প্রতি কটাক্ষপাত করলেন। কিন্তু বাদলটা এমন নির্বোধ যে রস গ্রহণ করল না। আপন মনে পায়চারি করতে করতে কখন গিয়ে সেইখানে উপনীত হল যেখানে টাইপ-করা সংবাদপত্র দেয়ালের গায়ে আঁটা থাকে।

৪

জাহাজ লোহিত সাগরে পড়তেই ভয়ঙ্কর গরম পড়ল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা কুবেরভাই দেশী পোশাক পরে ডেক্-এর উপর জুটল। সে ভেবেছিল ইংরেজরা তার এই বেশ দেখে মূর্চ্ছা যাবে. কিন্তু ইংরেজরা অনেকেই তাকে লক্ষ করল না, যারা লক্ষ করল তারা চুপ করে থাকল। এদিকে ভারতীয় মহলে সোরগোল পড়ে গেল। লক্ষ তো তাকে সকলেই করল, জনকয়েক গায়ে পড়ে তার সৎসাহসের প্রশংসা ও বাড়াবাড়ির নিন্দা করে গেল। ফলে তার আলাপীর সংখ্যা বাড়ল এবং তার দেখাদেখি কেউ কেউ দেশী পোশাক বার করে পরল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডিনার টেবিলে বাদল দেখে কুবেরভাই অনুপস্থিত। কী হল তার! বাদল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে কুবেরভাইকে খুঁজতে বেরল। দেখল সে ডেক্-এর এক প্রান্তে মুখ ভার করে বসে আছে।

"কী হয়েছে কুবেরভাই? অসুখ করেছে?"

কুবেরভাই বলল, "বস।"

পীড়াপীড়ির পর সে যা বলল তার মর্ম এই। সে ডিনার খাবার জন্যে খাবার ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এমন সময় প্রধান স্টুয়ার্ড তাকে আটকিয়ে বলল, একটা কোট গায়ে দিয়ে আসতে পারেন না? সে বলল, এই বা মন্দ কী? স্টুয়ার্ড বলল, না, না। ওটা একটা উত্তম প্রাচীন প্রথা। ওর ব্যতিক্রম কেন হবে তার কারণ দেখছি নে। কুবেরভাই বলল, বেশ। তবে আমি ডিনার খাব না আজ।

এই বলে ডেকে এসে বসে আছে। এই তার সত্যাগ্রহ।

বাদল বলল, "ছ্যাখ, ইংরেজের জাহাজে যখন যাচ্ছ ইংরেজী কায়দা মানতে হয়। লোকটা তোমাকে হিংসা বশত বাধা দেয়নি, কর্তব্যবোধে বাধা দিয়েছে।"

কুবেরভাই তর্ক করল। "ভারতীয়দের দেশে ওরা ভারতীয় কায়দা ভারি মানে কিনা!"

"পরে ও-কথা হবে। এখন নিশ্চয়ই তোমার জঠর জলে যাচ্ছে। তারই আঁচ লেগে মনও।"

বাদল তাকে ক্যাবিনে নিয়ে গিয়ে নিজের ফলের ঝুড়িটি উপহার দিল। বলল, "আমার বাবা সঙ্গে দিয়েছিলেন। এতদিন মনে ছিল না। য়্যাঁ, পচে গেছে?"

"সবটা পচে যায়নি। চমৎকার কমলালেবু তো? টাকায় ক'টা করে?"

কুবেরভাই আহার করে ঠাণ্ডা হল। তখন ডেক্-এ গিয়ে তর্কটা নতুন করে শুরু করল। "তুমি লক্ষ করেছ কি না জানিনে, এ জাহাজে ইংরেজ ও ভারতীয়ের মাঝখানে জাতিভেদ আছে। খাবার টেবিল ওদের আলাদা, আমাদের আলাদা।"

"সেটা কি খুব দোষের কথা, কুবেরভাই? গোরুখোরদের কাছে বসে তুমি খেতে রাজি হতে?"

"তা যদি বল, আমার পাশের লোকটি মুসলমান। সে রোজ গোমাংস চেয়ে নেয়। কই, তাকে তো শাদা গোরুখোরদের সঙ্গে বসতে বলে না?"

"তার কারণ সে শুধু গোরু খায় না, ভারতীয় খাবার ভালোবাসে, ডাল ভাত কারি।"

"তা বুঝি শাদা মহাপ্রভুরা খান না? একবার খবর নাও না?

ওঁরা সর্বভুক। হিন্দুর গোরু, মুসলমানদের শূওর, সমগ্র পৃথিবীর যত কিছু অখাদ্য কুখাদ্য সুখাদ্য কোনোটাতেই ওঁদের অরুচি নেই।”

“যাক, মিস্ জাকারিয়াকে আমি তাদের টেবিলে খেতে দেখেছি।”

“ঐ সব উচ্ছিষ্টভুক্ বিশ্বাসঘাতকের জন্যেই তো ভারতবর্ষের এই দশা। উনি ভাবেন ওঁর নামটা ও ধর্মটা বিদেশী বলে উনিও বিদেশিনী।”

এই সময় পূর্বোক্ত মুসলমান যুবকটি এসে বললেন, “আমি মিসেস্ দেবী ও মিস্ জাকারিয়ার কাছ থেকে আসছি। আপনারা কি দয়া করে আমার সঙ্গে আসবেন?”

বাদল ও কুবেরভাই গিয়ে দেখল মিসেস্ ও মিস্ তাঁদের পারিষদ-গণকে নিয়ে সভা করছেন। মিসেস্ অনুযোগ করে বললেন, “আপনারা দু’জনে কোথায় হারিয়ে গেছলেন? আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।”

“অনেক ধন্যবাদ। আজও কি গান চলছে নাকি?”

“না, আজ অভিনয় ও আবৃত্তি। মিস্টার আলী নিয়েছেন শাইলকের ভূমিকা। মিস্টার আচারিয়া তাঁর স্বরচিত সনেট শোনাবেন। আপনারাও যোগ দেবেন কি?”

বাদল লাজুক মানুষ। চুপ করে রইল। কুবেরভাই বলল, “উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজীতে বাক্যালাপ করতে হয় এই যথেষ্ট লজ্জা। এর উপর আমি পরের ভাষায় অভিনয় ও আবৃত্তি করে পরকে হাসাব না। মাফ করবেন।”

সকলে অপ্রস্তুত ও আহত হল। আনন্দের সভায় নিরানন্দ। মিসেস্ দেবী বললেন, “তবে আপনি নীরব শ্রোতাই হবেন—কেমন? আর আপনি?”

“আমিও।” বাদল বলল।

আচারিয়ার কবিসুলভ চেহারা। ঝাঁকড়া চুল, রিবন-এর মতো করে

বাঁধা টাই, সোনার শিকল-বাঁধা রিমলেস চশমা, চশমার নিচে থেকে তার চোখের মিটি মিটি চাউনি দেখা যায়। কবি হতে হলে যত কিছু তোড়জোড় আবশ্যক আচারিয়ার সমস্ত আছে। হাত উঠিয়ে নামিয়ে বুকে রেখে মাথা হেলিয়ে গদগদ ভাবে আচারিয়া সনেটগুলি পড়েন আর বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী বারংবার বাহবা দেয়।

আলীর শাইলক হল আর এক কাটি সরেশ। সে কখনো খেঁকী কুকুরের মতো গর্ গর্ করে, কখনো মাথায় চোট্ লাগা মানুষের মতো নির্বাক বেদনায় টলে পড়ে, পর মুহূর্তে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে আসে। "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" বলে শ্রোতৃমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিলে আলী সবিনয়ে bow করে ও আবার শুরু করে। শাইলকের ভূমিকা নেহাৎ শেষ হয়ে গেলে সকলের পীড়াপীড়িতে সে মার্ক য়্যাণ্টনীর ভূমিকা নিল।

৫

জাহাজের জীবন এমন যে, পায়ের তলায় সমুদ্র আছে না মাটি আছে তাও কারুর মনে থাকে না। এবং জাহাজটা যে চলছে এ কথা মনে হয় জাহাজ যখন একটা না একটা বন্দরে দাঁড়ায়। বাদলের মন থেকে ভারতবর্ষ তো মুছে গেলই, তার বদলে ইউরোপও জাজ্বল্যমান হল না।

বাদল জাহাজী সুখ দুঃখ, দলাদলি ও পরচর্চাতে মেতে গেল। আলী, আচারিয়া, কিষণলাল, নবাব সিং ইত্যাদি তাকে লুফে নিল। এদিকে কুবেরভাই হঠাৎ ভোল বদলে ফেলে ইংরেজদের সঙ্গে দু'বেলা খেলছে ফিরছে সাঁতার কাটছে ও—অসাধারণ তার দুঃসাহস—নাচছে! তা নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে হাস্য পরিহাস করতে লেগেছে বটে,

কিন্তু ভাগ্যবান বলে ঈর্ষাও করছে। কেউ কেউ বলছে, "ও কি যে সে লোক নাকি? গবর্ণমেণ্টের স্পাই। ওর মুখে ইংরেজবিদ্বেষ শুনে ভাগ্যিস্ মন খুলিনি!"

একদিন আলী বলল, "মিস্টার সেন, কেম্ব্রিজে যদি আপনি পড়েন তবে আমার একটু উপকার করতে হবে। আমি ইণ্ডিয়ান মজ্‌লিশের সেক্রেটারী পদের জন্যে দাঁড়াব। আপনার ভোট আজ থেকে আমার। রাজি?"

বাদল হেসে বলল, "কেম্ব্রিজে এ বছর জায়গা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমার। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমারো নেই। তবু দৈব বলে তো একটা কথা আছে? দৈবাৎ যদি আমরা দু'জনেই কেম্ব্রিজে জায়গা পাই তবে আপনার ভোট আমার। কেমন?"

"বেশ!" দৈব কথাটা শুনে বাদলের গা জ্বালা করছিল। যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান ভারতবর্ষের লোকগুলো দৈবের মুখ চেয়ে অসম্ভব কল্পনার পথে অধঃপাতে গেল। আল্‌নস্করের মতো উদ্ভট স্বপ্ন দেখা তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিষণলাল সম্প্রতি টিকি কেটেছে। তার চুল দেখলে টিকির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হিন্দী বলে, তাই মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। প্রায়ই ফরমাস খেটে বেড়ায়। মুখের ভাবটা যেন সর্বদা বিরক্ত হয়ে আছে। বাদলকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলে, "বাঙ্গালী বাবু, চিংড়ি মাছের সের কত?"

বাদল জবাব দেয়, "বলেন কেন! মাছের দর দেখে ছাতু ধরেছি। ছাতু খাই আর ভজন গাই আর হনুমানজীর আখড়ায় মুগুর ভাঁজি।"

"সেই জন্যেই তো অমন ফড়িংএর মতো চেহারা।" এই বলে সে

বাদলকে ধরে কাঁধে তুলতে যায়। বলে, "গায়ে জোর নেই, বাঙ্গালী বাবু! চালাবেন কী করে?"

"গায়ের জোরওয়ালা দারোয়ান রাখব, বেয়ারা রাখব। তা বলে একটা ভাবরাজ্যের ঝাঁকামুটে হব কী করতে?"

"ইস্! বাঙ্গালী বাবুর **intellectual arrogance** কত! হবেন তো কেরানী কিম্বা ইস্কুলমাস্টার!"

"যেমন জগদীশ কিংবা রবীন্দ্রনাথ। যাঁদের দেশের লোক বলে বিদেশে আপনি মান পাবেন, মিস্টার কুলি।"

কুবেরভাইকে আসতে দেখে কিষণলাল পালায়। কুবেরভাই হল কিনা স্পাই আর কিষণলাল স্টেট্ স্কলার। কুবেরভাই বাদলকে সঙ্গে নিয়ে পায়চারি করতে করতে বলে, "ঐ যে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি দেখছ ওর ব্যাপার জান?"

"য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নাকি?"

"খুব বেশী নয়। ওর সবাই ইংরেজ, কেবল ঠাকুমা না দিদিমা মাদ্রাজী।"

"তারপর?"

"তারপর ও তো মাদ্রাজ থেকে পাস হয়ে বিলেতে পড়তে যাচ্ছে মাস্টারি। কিন্তু শিকারী স্বভাব যায় কোথা? একজনকে তাক করে পুষ্পবাণ ছেড়েছে—"

"থামাও অমন কথা।"

"শোনই না। তারপর সেই যে ইংরেজ পুরুষটি সে তোমাদের কলকাতার না কোথাকার বেনে। ঐ যে বেঁটে মতন মোটাসোটা মানুষটি হে। মাথায় খুব কম চুল। প্লাস্ ফোর্স পরে।"

"হুঁ।"

"এখন সে পড়েছে কিনা আর এক জনের পাল্লায়। সেটি হচ্ছে

খাঁটি ইংরেজ মেয়ে। দুঃখের বিষয় তার একটি স্বামী আছে—তোমাদেরি চা বাগানে না কোথায়। স্বামীকে রেখে দেশে যাচ্ছে। তা একলাটি যাচ্ছে, পথে একটি সাথীর দরকার। পাকড়েছে আমাদের প্লাস্‌ফোর্স ওয়ালাকে।"

কুবেরভাই ছাড়বার পাত্র নয়। শ্রোতা পেয়েছে, বলবেই। "তারপর মহাযুদ্ধ বেধে গেছে!"

বাদল চমকে শুধাল, "কী রকম?"

"একদিকে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিস্, অন্যদিকে ইংরেজ মিসেস্। চোখে চোখে ঝগড়া চলছে।"

"তুমি এত কথা জানলে কী করে?"

"আমি কী না জানি? জানতে চাও তো তোমাদের মিসেস্ দেবীর ইতিহাস বলতে পারি।"

বাদল আঁৎকে উঠল। বলল, "আমি শুনতে চাইনে।"

"কিন্তু আমি শোনাতে চাই। সেই যে ছেলেটি ওঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিল সেটি একটি বিবাহিত যুবক এবং উনি একটি বালবিধবা।"

"শুনে আমি খুশিই হলুম, কুবেরভাই। আমি ফ্রি-লভ্‌কে শ্রদ্ধা করি।"

"তা তুমি যখন ছদ্মবেশী ইউরোপীয়ান তুমি করবেই তো। আমি কিন্তু ঘৃণা করি।"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চা করতে তোমার ঘেন্না করে না?"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চা কী? মানুষ আমরা, সামাজিক জীব। আমরা দশজনের খবর রাখব না? আমি কারুর রাস্তায় কাঁটা দিচ্ছিনে। আমি পুরাদস্তুর অহিংস। আমি জৈন।"

৬

বাদলের ঘুম ভাঙবার আগেই জাহাজ ভিড়েছে। সে পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে দেখল জাহাজ ঘাট। জল ছলছলের বদলে জন কলরব কানে এল। অশ্রুতপূর্ব ফরাসীভাষা। অদৃষ্টপূর্ব জনসজ্ঞ। কুলি, দোভাষী, গাইড্, "money changer," যাত্রীদের ঘরের লোক বা বন্ধু। অদৃষ্টপূর্ব মাটি।

বাদলের জাহাজের টিকিট সমুদ্রপথে লণ্ডন পর্যন্ত। কিন্তু বাদলের মন ধৈর্য ধরছিল না। চোদ্দ পনের দিন জাহাজে থেকে থেকে তার ইচ্ছা করছিল মাটিতে নেমে খুব খানিকটা ছুটাছুটি করে। তার পা যেন শৃঙ্খলের ভারে অবশ হয়েছিল, মুক্তির সম্ভাবনায় অধীর হল।

বাদল তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলল জিনিসপত্র সেই জাহাজে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়ে মার্সেলসে নেমে যাবে। গোটাকয়েক দরকারী জিনিস স্টকেসে পুরতে তার পনের মিনিটও লাগল না। স্টুয়ার্ডকে ডেকে এ: [illegible] কটা পাউণ্ড ধরে দিল—বখ্শিষ। পার্সারের কাছে গিয়ে ক্যাবিন ট্রাঙ্কে[illegible]র চাবি বুঝিয়ে দিল, লণ্ডনের ঠিকানা লিখে দিল। তার বদলে পেল [illegible] একখানা চিঠি—সুধীদার লেখা।

সু[illegible]ধীদা জানতে চায় বাদল জলপথে না স্থলপথে বাকীটা পথ কোন পথে [illegible] যাচ্ছে। লিখেছে, "লণ্ডনের বাইরে হেণ্ডনে আছি। ফাঁকা জ[illegible]য়গা, সেইজন্যে আমার পছন্দ। দোষের মধ্যে সময়ে অসময়ে এরোপ্লেনের উচ্চ গুঞ্জন। তোর জন্যে এই বাড়ীর একটা ঘর রাখতে বলেছি। তোর যদি না পোষায় ছেড়ে দিস। আমি কিন্তু এইখানেই থেকে যাব, আমার তো কিছুতেই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।"

বাদলের মন এক লম্ফে লণ্ডনের মাটিতে গিয়ে পড়ল। জাহাজ

তার অসহ্য বোধ হল। পথ তার দুস্তর বোধ হল। সুধীদা ভাগ্যবান, সে লণ্ডনে পৌঁছে গেছে, বাদলের এখনো অনেক বাধা।

বাদল পাসপোর্ট দেখিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে, তার এক হাতে স্যুটকেস অন্য হাতে কম্বল, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল, "সেন!"

বাদলের মনের নিচের তলায় নিতান্ত বাঙালীসুলভ কতকগুলো কুসংস্কার চাপা পড়েছিল। বাদল চটে গিয়ে মনে মনে বলল, "পিছু ডাকে কোন উল্লুক?"

কুবেরভাই তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "অত তাড়াতাড়ি কিসের? ট্রেন তো সেই সন্ধ্যা ছ'টায়।"

জাহাজে যে দুটি মানুষ এক ক্যাবিনে থেকেও প্রায় পর হয়ে পড়েছিল মাটিতে তাদের ছাড়াছাড়ি আসন্ন বলে বুক দুলে উঠল। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো তাদের মুখে বন্ধুত্বের হাসি।

"এস তোমাকে কাস্টম্‌সের পরীক্ষা পাস করিয়ে দিই। মাশুল দেবার মতো কিছু আছে? সিগার সিগ্রেট মদ সুগন্ধি দ্রব্য—"

"ওসব নেই। পায়াজামা, অন্তর্বাস, ক্ষুর—"

"ক্ষুর! বা রে ছেলে। দাড়ি নেই, তার ক্ষুর। দাড়ি কাটবার, না, গলা কাটবার?"

ফরাসী ফাক্‌তর (facteur) এসে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ নিয়ে যেতে চায়, ভাঙা ইংরেজীতে কী যে বলে। কুবেরভাই ও বাদল অতিকষ্টে তার হাত ছাড়িয়ে কাস্টম্‌স্‌ ঘরে পৌঁছায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, তবু মহাপ্রভুদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়ল না। এদিকে ফাক্‌তরদের সাহায্য যারা নিয়েছিল তারা পরে এসে আগে বেরিয়ে গেল। মিথিলেশকুমারী ও কিষণলাল বাদলদের দিকে ফিরেও তাকাল না। আর সেই যে ইংরেজ মিসেস্‌ তার দুটি হাত দুটি পুরুষের কাঁধে।

দেশের নিকটস্থ হবার আনন্দে সে লাফ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার টান সামলাতে না পেরে পুরুষ দুটি দৌড়িয়ে পাল্লা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

অবশেষে কাস্টম্‌সের কর্মচারী বাদলের কাছে এসে দুই একটা প্রশ্ন করল ও জিনিসের উপর চক্‌খড়ির দাগ দিল। বাদলরা বের হয়ে আসতেই সম্মুখে ট্যাক্সি। কুবেরভাই বাদলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। বাদল চেপে বসল। অগত্যা কুবেরভাইও।

বাদল বলল, "কুকের দোকানে গিয়ে চেক্ ভাঙাতে হবে, টিকিট কাটতে হবে, তার করতে হবে।"

এখনো কুকের দোকান খোলেনি। ব্রেকফাস্ট খায়নি বলে বাদলের ক্ষুধাও লেগেছে। বাদল বলল, "চল না একটা কাফেতে কিংবা রেস্তোরাঁয়।" কিন্তু সেখানে গিয়েও তার মন টেঁকে না। কখন কুকের দোকান খুলবে, টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসা যাবে, লণ্ডনে পৌছে সুধীদার সঙ্গে দেখা হবে।

কুকের দোকান খুলল। কুকের লোক বলল, "এখুনি একটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু সেটাতে গেলে চেঞ্জ করতে করতে কাল যে সময় লণ্ডনে পৌছবেন সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে গেলেও সেই সময়।"

বাদল হতাশ হয়ে কুবেরভাইয়ের দিকে তাকায়। কুবেরভাইয়ের ভাব থেকে বোধ হয় সে বলছে, কেমন? বলেছিলুম কি না?

কুকের প্ররোচনায় বাদলরা কুকের বাস্-এ করে সমুদ্রতটবর্তী Bandol গ্রামে গেল। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করে সেই বাস-এই ফিরল। সমস্তক্ষণ বাদল ছটফট করতে থাকল, চেয়ে দেখল না কেমন দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে সে গেল ও এল, যেখানে বসে খেল সে ঘরের জানালা থেকে তালী বনের ভিতর দিয়ে সূর্যভাস্বর আকাশ ও মন্ত্রশান্ত সাগর পরস্পরের মুকুরের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল।

রাত্রে একটা পুরা বার্থ পেয়ে ঘুমতে পারবে ভেবে বাদল ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিল। তার খেয়াল ছিল না যে ইউরোপের ট্রেনে সাধারণ ফার্স্ট ক্লাস শুধু বসবার জন্যে। শোবার জন্যে অতিরিক্ত দিয়ে sleeping car-এর টিকিট কিনতে হয়। হাত পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা নেই দেখে তার কান্না পাচ্ছিল। অনিদ্রারোগীর অনিদ্রাকে বড় ভয়।

যাক্, বেশ আরাম করে বসা যাবে। বাদল পায়ের উপর পা রেখে ঠেস দিয়ে বসে **Daily Mail**-এর **Paris Edition** পড়ছে। জাহাজে দেখা এক আধা পাগলা বুড়ো এসে হা হা করে হেসে উঠল। কী ব্যাপার? বুড়ো বলল, "এই সীট্ আমার রিজার্ভ করা।" বাদল কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, "য়্যাঁ?"

কুবেরভাই ছিল সেকেণ্ড ক্লাসে। বাদল তাকে খুঁজে বের করে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ডাকল, "কুবেরভাই!"

"কী হয়েছে, সেন? কী ব্যাপার!"

"ও-হো-হো! ফার্স্ট ক্লাসে মোটে একটি সীট্ খালি ছিল, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মাথা-পাগ্লা বুড়ো বন্ধু বলছে ওটা তার রিজার্ভ করা।"

"ওঃ সেই বুড়ো? প্লাস্-ফোর্স্ ওয়ালাকে হস্তান্তরিত হতে দেখে মেয়েটি যাকে শিকার করেছিল? সে আবার ফার্স্ট ক্লাসে চড়তে যায় কোন সাহসে?"

কুবেরভাই গিয়ে বুড়োর টিকিট দেখতে চাইল। বুড়ো বলল, "নিগার।" কুবেরভাই তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "এটা ইণ্ডিয়া নয় যে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ফার্স্ট ক্লাসে উঠবে, দাদু! তোমাকে আমি কুকের দোকানে টিকিট কিনতে দেখিনি?"

ধরা পড়ে গিয়ে বুড়ো ফিক করে হেসে উঠল। বলল, "একটু তামাশা করছিলুম।" এই বলে কুবেরভাইয়ের সঙ্গে নেমে গেল।

গাড়ী চলবার পর দেখা গেল বাদলের পাশের সীটের মালিক গাড়ীতে ওঠেননি। বাদল বিনা বাক্যব্যয়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটুকু দখল করল। সবটা শরীর আঁটে না, তবু যথালাভ।

অন্ধকার রাত্রি। দিব্য শীত। বাদলের সীট্ ও তার পার্শ্ববর্তিনীর সীটের মাঝখানে একটি ছোট বেড়া ছিল। বাদল তার উপর মাথা রাখল। শীতের ভয়ে জানালা দরজা বন্ধ। অন্ধকার রাত্রিতে দেখাও যায় না দু'ধারের দৃশ্য। হয়তো ঘুম এসেছিল। হয়তো তন্দ্রা। হঠাৎ এক সময় তার মনে হল কে যেন তার মাথার কাছে মাথা রেখেছে। কার মাথার চুল যেন তার কপাল ছুঁচ্ছে। সে উঠে দেখল কামরা অন্ধকার। বারান্দার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একজন বুকের উপর দুই বাহু বেঁধে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে ঘুমচ্ছে। আর একজন পায়ের উপর পা রেখে ঘুমচ্ছে। আর একটি পুরুষ; সেও ঘুমন্ত। বাদলের পাশের মহিলাটি বাদল যেখানে মাথা রেখেছিল সেইখান ঘেঁষে একটি বালিশ পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে।

ফ্রান্সের মধ্যভাগ দিয়ে ট্রেন ছুটেছে। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। ঘুমন্ত পুরীতে সেই একা প্রহরী জেগে। তার একান্ত নিকটে নিদ্রিতা নারী। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর বালিশের একাংশ বেদখল করে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন প্রভাতে উঠে দেখে তার আগে অন্যেরা উঠেছে। মহিলাটি তাকে বালিশটা ছেড়ে দিয়েছেন।

৭

প্যারিসে কুবেরভাই নেমে গেল। বাদলকে বলল, "কখনো যদি

এদিকে আস আমাকে খবর দিয়ো, সেন। আমার কাকার এখানে মণিমুক্তার কারবার। ঠিকানা লিখে রাখ।"

কুবেরভাইয়ের অন্তর্ধানে বাদলের একটু দুঃখ হল। কিন্তু সে যাকে পিছনে রাখে তাকে মনে রাখে না। ট্রেন Gare de Lyon ছাড়ল। বাদলও কুবেরভাইকে ভুলল।

গাড়ী বায়ুবেগে ছুটেছে। ফ্রান্সের ট্রেন হালকা ও ভূমি মোটের উপর সমতল। প্রধানত চাষের জমি। উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ঝর্ণা। ঝোপ। নামমাত্র পাহাড়। মাঝে মাঝে নতুন গড়া বাড়ী। বিজ্ঞাপনের ফলক।

ক্যালে। সমুদ্রকে বাদল ইতিমধ্যেই ভুলেছিল। আবার সমুদ্র দেখা দিচ্ছে। ট্রেন থামল, যাত্রীরা নামল। ফাকৃতর! ফাকৃতর! বাদল এবার ফাকৃতরের কবল থেকে বাঁচল না। জিনিসগুলি নিয়ে ফাকৃতর যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বাদল চিন্তিত হয়ে জাহাজে উঠল।

জাহাজে উঠে দেখে ডেক-চেয়ার ভাড়া করে খোলা ডেকের উপর অনেক লোক বসে গেছে। বন্ধ ডেকের বেঞ্চিতে বাদল জায়গা করে নিল। কিন্তু কোথায় ফাকৃতর? জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় ফাকৃতর মশাই একগাল হেসে মাল সমেত উপস্থিত। "আপনাকে কোথায় না খুঁজেছি? সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, নিচের ডেক, উপরের ডেক।"—বলে হাত পাতল। তার ইংরেজী শুনে বাদলের যা হাসি পাচ্ছিল! মজুরি পেলেও ছাড়বার পাত্র নয়। বখ্‌শিষ চায়। রসিক লোক। আশাতিরিক্ত পেয়ে কপালে হাত ঠেকাল।—"বঁজুর মঁসিয়ে।"

নাঃ! ফরাসী ভাষাটা না শিখলে নয়। লণ্ডনে পৌঁছেই আরম্ভ করে দেওয়া যাবে। ফরাসী না জানা থাকায় ট্রেনে ভালো করে খাওয়া

হয়নি, খাবার জল চেয়ে খনিজ জল (সোডা ওয়াটার) পেয়েছে। ফরাসী না জানায় কুলির অনুসন্ধান করতে পারেনি, সুটকেস্‌টার মমতা ত্যাগ করেছিল।

ইতিমধ্যে জাহাজ চলতে শুরু করেছে। মেঘলা দিন। ঠাণ্ডা হাওয়া। বর্ষাও টিপ টিপ পড়ছে। সুটকেস্ ফেরৎ না পেলেও বাদলের চলত। কম্বলখানা ফিরে পেয়েছে বলে ফাকৃতরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

ইংলিশ চ্যানেলটুকু এক ঘণ্টার পথ। গারট্রুড ইডার্ল সাঁত্‌রে পার হয়েছে। কিন্তু জাহাজে করে পার হতে গিয়ে বাদল যত কষ্ট পেল নিশ্চয়ই তত কষ্ট পায়নি। সকলের সামনে তার বার বার বমি হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তার টুপি উড়ে গেল, চুল সজারুর মতো হল, মুখ অপরিষ্কার, পোশাক নোংরা। মাথা ভারি, চোখ লাল, গা ঘিন্ ঘিন্।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে—দূর দিগ্বলয়ে অস্পষ্ট তটরেখা। ইংলণ্ড এসেছে—**white chalk cliffs of Dover**! না, না, পাহাড় তো নয়! এক রাশ বাড়ী। যাই হোক, ইংলণ্ড তো?

বাদল মনে মনে জানুপাত করল। ব্রিটানিয়ার দক্ষিণ করপৃষ্ঠে একটি চুম্বন অর্পণ করে মনে মনে বলল, বন্দে প্রিয়াম্।

৮

ফরাসী ফাকৃতরের মতো গুঁফো খ্যাঁকশিয়ালী নয়। ইংরেজ পোর্টার ষণ্ডা, গোঁফদাড়ি কামানো, নীরব স্বভাব। ডোভারে এত মানুষ নামল, এত পোর্টার ছুটল, কিন্তু মার্সেল্‌স্ ও ক্যালের সিকি পরিমাণ গোলমাল নেই।

"আপনার জিনিস নামিয়ে নেব, সার ?"

"নাও।"

পাসপোর্ট ও কাস্টম্‌সের ঝুঁকি পুইয়ে বাদল বোট-ট্রেনে চড়ে বসল। ফার্স্ট ক্লাসে কেউ নেই বললেও চলে, তার কামরায় সে একা। পোর্টারকে একটা শিলিং ফেলে দিতেই সে টুপিটাকে বেশীরকম উঠিয়ে ধন্যবাদ ও শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে গেল।

বাদলের মন উড়ু উড়ু। কখন লণ্ডনে পৌছবে? স্থধী নিতে আসবে কি না। ভিক্টোরিয়া থেকে হেণ্ডন কত দূর ?

ট্রেন ছাড়লে দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার, সূর্যাস্তের আভা সমতল মাঠের উপরকার দৃঢ়মূল ঘাসের উপর পড়েছে। পর পর অনেকগুলো স্থড়ঙ্গ। চকখড়ির পাহাড় শাদা নয়, দিব্য সবুজ।

কত ছোট ছোট শহরের ছোট ছোট স্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন এক দৌড়ে ভিক্টোরিয়ায় পৌছল। তখনো গোধূলির আমেজ আছে। ইংলণ্ডের গোধূলি দীর্ঘস্থায়ী।

বাদল জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দু'দিকে চাইল। অমনি দেখল স্থধী সেকেণ্ড ক্লাসে তার খোঁজ করছে।

বাদলের মন উল্লাসে অধৈর্য হল। সে ভব্যতার মাথা খেয়ে চিৎকার করে উঠল, "স্থধীদা—।"

স্থধী ও তার সঙ্গে কে একটি ভারতীয় যুবক পিছু ফিরে দেখল— বাঁদরটা ফার্স্ট ক্লাসে। দু'জনে হাসাহাসি করতে করতে বাদলের কামরার কাছে যখন উপস্থিত হল বাদল তখন স্থট্‌কেস হাতে করে নামছে। স্থট্‌কেস মাটিতে রেখে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতেই স্থধী তাকে একরকম বুকের উপর নিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ দু'জনেরই বাগ্‌রোধ। ইতিমধ্যে নূতন ভারতীয়টি বাদলের স্থট্‌কেস হাতে করে শুধাচ্ছে, "এই ? না, আর আছে ?"

বাদলকে সুধী তার সঙ্গে পরিচিত করে দিল। "ইনিই বাঁদর, আর ইনি কুমারকৃষ্ণ দে সরকার।"

প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চলতে চলতে দে সরকার বলল, "দেখুন, মিস্টার সেন, আমার এখানে দু'রকম পরিচয় আছে। ইণ্ডিয়ানরা জানে আমি কুমার কে ডি সরকার, নিশ্চয় জমিদারের ছেলে। আর নেটিবরা জানে আমি মঁসিয়ে ড্য সারকার।"—এই বলে হাসতে লাগল।

বাদল হেসে বলল, "দুটো পরিচয়ই সমান য়্যারিস্টক্র্যাটিক।"

সুধী বলল, "এখন সমস্যা হচ্ছে ট্যাক্সি করা যাবে, না, য়্যারিস্টক্র্যাটরা টিউবে করে যাবেন? হেণ্ডন অবধি ট্যাক্সি করে গেলে প্রায় পাউণ্ড-খানেক লাগে। আর বাদল যে রকম চেহারা নিয়ে এসেছে টিউবে চড়লে মূর্চ্ছা যাবে।"

ট্যাক্সিই করা গেল। তখন দে সরকার বলল, "আজকের মতো বিদায় হই ভাই চক্রবর্তী আর সেন।"

বাদলের এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে বিশেষ ভালো লেগেছিল। শুধাল, "কেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না?"

"আমি? কুমার বাহাদুর থাকবেন Suburbiaয়? কেন? Mayfair কি নেই? Belgraviaয় স্থানাভাব?"—স্বরটা নামিয়ে কারুণ্যের সঙ্গে বলল, "আমি ব্লুম্‌সবেরীতে থাকি, ভাই।"

৯

লণ্ডন! গোধূলির শেষে অন্ধকার নামছে। অসংখ্য আলোকের টুকরা আকাশে ও মাটিতে। রাস্তার পর রাস্তা ডাইনে ও বামে সম্মুখে ও পশ্চাতে রেখে ট্যাক্সি ছুটেছে। বাদলের সাধ্য কী যে চিনে রাখে। সত্য সত্যই সে লণ্ডনে পৌঁছেছে। তার আবাল্যের অলকা

অমরাবতী লণ্ডন! কোন শহরকেই বা সে এত ভালো করে চেনে? সেই রোমান যুগ, স্যাক্সন যুগ, নর্মান যুগ, ডিক হুইটিংটন, টাওয়ার অফ লণ্ডন, মারমেড ট্যাভার্ন, নেল্ গুইন্, ডকটর জনসন, ক্রাইস্টস্ হস্পিট্যাল, সোহো···ক্রমান্বয়ে কত স্মৃতি যে তার মনের পর্দার উপর বায়োস্কোপের ছবির মতো উদয় হবামাত্র অস্ত গেল। বাদল ভাবল, পূর্ব জন্ম হয়তো মিথ্যা নয়।

সুধী একটি কথাও বলছিল না। তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। পূর্ণ কলসের শব্দ নেই। কেবল ড্রাইভার যখন হেণ্ডনের কোন রাস্তায় যাবে জিজ্ঞাসা করল সুধী বলল, "টেণ্টারটন ড্রাইভ্।"

ট্যাক্সি থামতেই বাড়ীর দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একটি পাঁচ ছয় বছরের মেয়ে একটি ষোল সতের বছর বয়সের মেয়ের হাত ধরে ও গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিকে বিদায় করে সুধী ও বাদল বাগানের গেট বন্ধ করল। সুধী বলল, "কি রে মার্সেল, তুই এখনো ঘুমতে যাসনি?"

সুজেৎ (Suzette) সলজ্জভাবে বলল, "আপনার বন্ধুকে দেখবে বলে বায়না ধরল। বিছানায় কিছুতেই থাকতে চাইল না।"

সুধী ও বাদল পা-পোষে জুতো মুছে হ্যাট-ওভারকোট রাখবার স্ট্যাণ্ডে হ্যাট রাখল। তখন সুধী বলল, "পরিচয় করিয়ে দিই। মিস্টার সেন, ম্যাদ্‌মোয়াজেল সুজেৎ—।" যথারীতি অভিবাদন ইত্যাদি।

"আর ইটি হল আমাদের ছোট্ট মার্সেল, লক্ষ্মী মার্সেল, Jolie petite Marcelle."

মার্সেল ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানাল। "না, petite না।"

তখন সুধী হেসে বলল, "তবে আমার ভুল হয়েছে। Jolie grande Marcelle" এই বলে মার্সেলকে দুই হাতে তুলে উঁচু করে ধরল। "ইস,

আমার চেয়েও বড়! সুজেতের চেয়ে, বাদলের চেয়ে, সকলের চেয়ে মার্সেল বড়! plus grande Marcelle!"

বাদলকে নিয়ে উপর তলায় যাবার সময় সুধী সুজেৎকে বলল, "তোমার মাকে বোলো আমরা হাত মুখ ধুয়ে আসছি। আর মার্সেলকে ঘুম পাড়াতে দেরি কোরো না।"

বাদলের ঘর। একখানা লোহার খাটে বিছানা তৈরি। একটা পড়ার টেবিলের উপর ফুলদানী ও ফুল। একটা হাত মুখ ধোবার টেবিলের উপর চীনামাটির কুঁজো ও বেসিন, একটা আয়না-লাগানো আলমারি। অগ্নিস্থলীতে বাদল আসবে বলে কয়লার আগুন জ্বালানো হয়েছে।

সুধী বলল, "লণ্ডনে শীত এখনো পড়েনি। গরম দেশ থেকে আস্‌ছিস্‌, তোর একটু বেশীরকম শীত বোধ হতে পারে ভেবে তোর ঘরে আগুনের ব্যবস্থা হয়েছে। গরম জল দরকার হবে? দাঁড়া, আমিই নিয়ে আসছি।"

বাদলের মুখ হাত ধোয়া হয়ে গেলে সুধী তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। একই আকারের একই রকম ঘর—কেবল ওয়ালপেপারের নক্সা আলাদা। এবং পড়ার টেবিলের উপর পরিপাটী করে সাজানো বই ও পত্রিকা।

"দেখি দেখি কী বই কিনেছ?—ওঃ, Spenglerএর সেই বইখানা? 'Decline of the West'—বাজে কথা, ইউরোপের কখনো বার্ধক্য আস্‌তে পারে? ইউরোপ চিরযৌবন।"

"পাছে বাইরেটা দেখে মোহাবিষ্ট হই, সেই ভয়েই তো এই মোহমুদ্গার আনানো। কিন্তু কিনিনি বাদল, Mudieর লাইব্রেরীতে চাঁদা দিয়ে ধার করেছি।"

"ওঃ! হাউ ক্লেভার! আমাকে মেম্বার করিয়ে দেবে সুধীদা?"

"তুই চল্। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হ'। বিশ্রাম কর্। Mudie তো পালিয়ে যাচ্ছে না, তুইও কয়েক বছর থাকছিস।"

জাহাজে মনের মতো খোরাক না পেয়ে গ্রন্থকীট উপবাসী ছিল। স্পেংলারখানাকে বগলদাবা করে খাবার ঘরে চলল।

চিঠির জবাব

১

দুই বন্ধুর মাঝখানে দুই মাসের ব্যবধান। মনের কথা জমে গেছে দুই শত বছরের। কোনখান থেকে কে আরম্ভ করবে স্থির করতে পারল না। অগত্যা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখল।

পরদিন রবিবার। সেদিন মধ্যাহ্নে দে সরকারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভোজনের পর তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে।

"এই দে সরকার ভদ্রলোকটি কে, সুধীদা? ব্লুম্স্বেরীতে থাকেন—বোহিমিয়ান নাকি?"

"স্কুল অফ ইকনমিক্সে পড়েন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আলাপ।"

"বাই জোভ্। এরি মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভর্তি হয়েছ? আমি কবে হব, সুধীদা?"

"অনেক নিয়ম কানুন। একটু বেগ পেতে হবে।"

ব্রেকফাস্টের পর বসবার ঘরে এসে দু'জনে বসল। রবিবারে সুধীর জন্যে "অব্‌সার্ভার" ও বাড়ীর লোকের জন্যে "নিউস্ অব্ দি ওয়ার্লড" নেওয়া হয়। বাদল সমান আগ্রহের সঙ্গে উভয় কাগজ আগলে বসল। কোনোখানা হাতছাড়া করতে চায় না।

মার্সেলের সঙ্গে খেলা ও পড়া সুধীর নিত্যকর্ম হয়ে গেছে। মার্সেল এসে নীরবে তার এক পাশে দাঁড়াল। সুধী বলল, "আয়! তোর ছবির বই কোথায়?"

মার্সেল তার শতচ্ছিন্ন ছবির বই ও ছবিওয়ালা ছোটদের কাগজগুলি

হাতে করে এনেছিল। ঐ কয়টিই তার সম্বল। প্রথম প্রথম সুধী অনুযোগ করে বলত, "মার্সেলকে নতুন বই কাগজ দাও না কেন?" সুজেৎ উত্তর দিত, "দু'দিনেই ছিঁড়ে ফেলে। দস্যি মেয়ে।" ক্রমশ সুধী বুঝতে পারল এদের অবস্থা ভালো নয় এবং মার্সেল অতি শান্ত মেয়ে, এত শান্ত ও এত গম্ভীর যে তার বয়সের মেয়েদের পক্ষে ওটা অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয়। তারপর একটু একটু করে সুধী জানল, মার্সেল সুজেতের আপন বোন নয়। এমন কি দূর সম্পর্কের কেউ নয়।

মার্সেলরা ফরাসী, সুজেৎরা বেলজিয়ান। যুদ্ধের সময় সুজেতের মা-বাবা তাকে নিয়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসে, তখন থেকেই ইংলণ্ডে তারা আছে। সুজেৎরা শ্রমিক শ্রেণীর লোক, যুদ্ধের পরে যখন নামমাত্র মূল্যে বাড়ী পাওয়া যায় তখন এই বাড়ীখানা কেনে। বাপ মিস্ত্রী, মা ঘর সংসার বোঝে। সুজেৎ সবে স্কুলের পড়া শেষ করে কোন একটা দোকানে কাজ পেয়েছে। পেয়ীং গেস্ট না নিলে তাদের চলে না, ট্যাক্স যে অনেক।

কয়েক বছর আগে তাদের পরিচিত একটি ফরাসী কুমারী লণ্ডনের কোন এক সাধারণ সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে নবজাত কন্যাটিকে তাদের জিম্মা দেয় এবং মাসে মাসে কন্যাটির জন্যে নিজের রোজগারের অংশ পাঠাতে থাকে। কন্যাটির পিতাও খবর পেয়ে কন্যাটিকে দেখে যায় ও মাসে মাসে নিজের রোজগারের অংশ পাঠায়। অবশ্য মা-বাবা যা পাঠায় তা সামান্যই এবং মাঝে মাঝে বেকার হয়ে পড়লে সেটুকুও পাঠাতে অক্ষম হয়।

মার্সেল জানে না ওরা তার কে। সে জানে মাদাম তার মা, মঁসিয়ে তার বাবা, সুজেৎ তার দিদি। এরা তাকে যথার্থ ভালোবাসে, কিন্তু তার প্রয়োজনমতো ছবির বই ও খেলার পুতুল কিনে দেওয়া এদের

অবস্থায় কুলয় না। বুড়ীর বয়স বাড়ছে, বুড়োর চাকরি কোন দিন যায়, সুজেতের বিয়ের যৌতুক সঞ্চয় করতে হয়।

সুধী বলে, "মার্সেলকে আমার হাতে দিন। আমি তাকে নিজের খরচে মানুষ করব। তার বিয়ের যৌতুক আমি দেব।"

মাদাম বলে, "তা হলে ওর বাবাটি মারা যাবে। বুড়োমানুষ—মার্সেলকে ছেড়ে থাকতে পারে না বলে রোজ সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।"

সুজেৎ বলে, "কিরে মার্সেল, এঁর সঙ্গে এঁর দেশে যাবি ?"

মার্সেল যেমন নিঃশব্দ তেমনি নিস্পন্দ। পাথরের মতো অচঞ্চল। পাথরে গড়া মূর্তির মতো ওজনে ভারি। মেয়েটি অতি প্রিয়দর্শন। তাকে না ভালোবেসে থাকা যায় না। তার প্রতি করুণা তো হয়ই।

সুধী তাকে আরও টেনে নিয়ে বলল, "তোর জন্যে নতুন বই কিনে আনব রোজই ভেবে যাই, রোজই মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখি দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইবার তোর নতুন দাদা কিনে আনবেন।"

তারপর সুধী ও মার্সেল একই বই সুর করে পড়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে।

"Jack and jill
Went up a hill"

তারা কেমন করে পাহাড়ে উঠল, পাহাড় কত উঁচু—এসব মার্সেল হাতেকলমে শিখতে ভালোবাসে। সুধী যেমন করে যা করে সেও তেমনি করে তাই করে। জ্যাক ও জিল সেজে দু'জনে সোফার উপর আছাড় খায়। ওর নাম পাহাড় থেকে পড়া।

টাইমপিস ঘড়ির আড়ালে মুখ রেখে সুধী বলে,

"Dickory Dickory dock
It is bath-time, says the clock."

মার্সেল ভাবে সত্যিই যেন ঘড়িটা তার সঙ্গে কথা কইছে। সেও বলে "ডিকরি ডিকরি ডক্…" কিন্তু বাকীটা বলতে না পেরে থেমে যায়। তারপর স্থজেৎ এসে তাকে পাকড়াও করে। এবার সত্যি সত্যি স্নান করতে হবে—It is bath-time, says the clock! মার্সেলের মুখ শুকিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। মার্সেল যে খুব লক্ষ্মী মেয়ে নয় সেটা তার স্নানের সময় ধরা পড়ে।

২

বেল বাজছে শুনে স্থধী দরজা খুলে দিতে উঠে গেল। রান্নাঘর থেকে মাদামও ছুটে এসেছে।

দে সরকার টুপি উঠিয়ে অভিবাদন করল।

"আরে আস্থন আস্থন। বাড়ী খুঁজে পেলেন কী করে?"

"কোন মুল্লুকে বাড়ী করেছেন, মশাই। দেড় ঘণ্টা ধরে খুঁজছি। গাইড বুকে খুঁজে পাইনে, যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে এদিক দিয়ে ওদিকে যাও, তারপরে তিনটে রাস্তা ছাড়িয়ে ডাইনে যাও, তারপরে চারটে ল্যাম্প পোস্ট পেরিয়ে বাঁয়ে তাকাও—ওঃ! মাফ করবেন। আপনাকে দেখতে পাইনি।"

"তাতে কী? আপনি কি মঁসিয়ে দ্য সারকার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি মাদাম—?"

দে সরকারকে দেখে বাদল বই ফেলে উঠল। করমর্দনের পর দে সরকার বলল, "তারপর কী খবর! বাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

বাদল বলল, "বেশ। তবে ইংলণ্ডে এসে কন্টিনেণ্টালদের সঙ্গে থাকতে উৎসাহ বোধ করছিনে।"

"তা যদি বলেন, নেটিব পরিবারে বড্ড খরচ, মিস্টার সেন।"

নেটিব কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বাদল বলল, "বিজ্ঞাপন দিলে ভালো ইংরেজ পরিবারে জায়গা পাইনে ?"

"কেমন করে পাবেন ? যাদের পয়সা আছে তারা পেয়ীং গেস্ট নেবে কেন ? ওতে তাদের প্রাইভেসী নষ্ট হয়। পরের মন জোগানোর হাঙ্গামাও আছে ?"

"ধরুন যদি কোনো পরিবারে বন্ধুতা হয়ে যায় ?"

"হলেও স্থবিধে নেই। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গহস্থ ফ্ল্যাটে কিম্বা আধখানা বাড়ীতে বাস করেন। সাময়িক অতিথির জন্যে অতিরিক্ত ঘর রাখতে এত খরচ যে কদাচিৎ কেউ রাখেন।"

বাদল ভেবেছিল রোম্যান্টিক ভাবে কত পরিবারে প্রবেশ পাবে, কত ঘরে ঘরের একজন হবে। তার কল্পনায় ঘা লাগল। সে বলল, "তবু এমনো হতে পারে যে আমারি জন্যে তাঁরা ফ্ল্যাট বদলাবেন। ছোট ফ্ল্যাট থেকে বড় ফ্ল্যাটে যাবেন।"

দে সরকার খুব একচোট হেসে নিল। বলল, "আপনি মশাই বিদেশে এসেছেন না শ্বশুরবাড়ী এসেছেন ? ভুল ভাঙতে বেশী দেরি হবে না কিন্তু।"

স্থধী মৃদু মৃদু হাসছিল। বাদলের জন্যে তার দুঃখ হচ্ছিল। কল্পনায় ও বাস্তবে অনেক গরমিল।

স্থজেৎ এসে সলজ্জভাবে দাঁড়াল। বলতে চায় খাবার দেওয়া হয়েছে। স্থধী বুঝতে পারল। বলল, "আস্থন খেতে যাই। মিস্টার দে সরকার, মাদ্‌মোয়াজেল স্থজেৎ।"

খেতে বসে দে সরকার বাদলের কানে কানে বলল, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। এইখানেই থেকে যাও না, সেন ?"

বাদল বলল, "কোথাও তিন মাসের বেশী থাকব না ভাই দে সরকার। লণ্ডনের সব ক'টা পাড়া দেখতে চাই।"

"তা হলে সব রকম লোকের সঙ্গে থাকতে প্রস্তুত হও। সব পাড়াতেই ভদ্র নেটিব শ্বশুরবাড়ী অতি বড় ভাগ্যবানও আশা করতে পারে না। এমন কি নেটিবরাও আশা করে না।" এই বলে দে সরকার অতি কষ্টে হাসি চাপল। ইংরেজদের দেশে তার দু'বছর কেটেছে। সে ভারতবর্ষে বসে বসে বিলিতী নভেল পড়েনি।

আহার শেষ হলে লাউঞ্জে বসে দে সরকার কফি ও সিগ্রেট প্রচুর ধ্বংস করল। লোকটি আলাপ জমাতে অসাধারণ পটু। মঁসিয়ে এবং মাদাম তাকে ছাড়তেই চায় না। তার কাছে যত রাজ্যের খোশ গল্প শুনে মুগ্ধ। চালও তার রাজারাজড়ার মতো। তাকে সিগ্রেট দিতে আসবার আগেই সে তার হাতীর দাঁতের সিগ্রেট কেস্ খুলে মঁসিয়েকে সিগ্রেট দিতে উঠে গেছে। মাদাম সিগ্রেট খায় না বলে মাদামের সঙ্গে করেছে মধুর রসিকতা। সুজেৎ তাকে gallantryর সুযোগ না দিয়ে রান্নাঘরে বাসন ধুচ্ছে বলে তার যে আক্ষেপ! এমন কি ছোট্ট মার্সেলকে সে উপেক্ষা করেনি। পকেট থেকে এক গাদা টফি বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

পরনে তার ছাইরঙের স্যুট, নিখুঁত কাট। তার লম্বা গড়ন ও সুন্দর গায়ের-রং-এর সঙ্গে এত ভালো মানায় যে একমাত্র ঐ পোশাকই যেন তার জন্মগত গাত্রাবরণ। ময়ূরের যেমন পেখম কিংবা মেষের যেমন পশম। চার্লি চ্যাপলিনের যেমন গোঁফ এবং প্যাণ্টলুন, হারল্ড লয়েডের যেমন চশমা, দে সরকারের তেমনি ছাই রং-এর স্যুট।

কফির পেয়ালায় সিগ্রেটের ছাই ফেলতে ফেলতে দে সরকার বলছিল, "হ্যাঁ, কী বলছিলুম মঁসিয়ে। আমি যখন Marble Archএর কাছে সার্ভিস ফ্ল্যাট নিয়ে একা থাকতুম তখন একদিন এক বেলজিয়ান যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। দেশে ফেরবার সময় সে

আমাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতেই যা বাকী রেখেছিল। এতদূর বন্ধুতা! নিমন্ত্রণপত্র যে কতবার লিখেছে, এই সেদিনও একখানা পেয়েছি। যাই বলুন, বেলজিয়ানদের মতো মিশুক জাত আমি আজো দেখলুম না।"

এই বলে দে সরকার সিলিংএর দিকে মুখ তুলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। অতঃপর অবশ্য মাদাম চা-এ থাকতে আব্দার ধরল এবং মঁসিয়ে চলল আর এক বাক্স সিগ্‌রেট আনতে। দে সরকার কিন্তু কিছুতেই থাকতে পারে না, অন্যত্র তার চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। আগামী সপ্তাহে আসতে পারবে কি? না, মনে করে দেখে আগামী সপ্তাহটার সবটাই তার আগে থেকে বিলিব্যবস্থা করা। আচ্ছা, সে টেলিফোন করে জানাবে দু'একদিন পরে—অকস্মাৎ যদি এনগেজমেণ্ট পিছিয়ে যায়।

স্থধী ও বাদলকে নিয়ে দে সরকার রাস্তায় নেমে পড়ল।

৩

দে সরকার লণ্ডনের ঘুঘু। কোথায় পাঁচ গিনি দামে চলনসই স্থট পাওয়া যায় এবং কোথায় সাত গিনি দামে, কোন দোকানের ওভারকোট কিনতে হয় এবং কোন দোকানের ড্রেসিং গাউন—লণ্ডনের চাঁদনি ও চৌরঙ্গী দুই তার নখদর্পণে। বাদলকে একদিন টিউব-এ চড়িয়ে, বাস্-এ বসিয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে ক্যালিডোনিয়ান রোডের ওধারে কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল হাটে নিয়ে গেল। সেখানে সস্তার চূড়ান্ত। কুৎসিত পোশাক পরা কুৎসিত চেহারার যৌবনে স্থবির কতকগুলো স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিনিসের নাম ও দাম হাঁকছে। বাদল ত্রাহি ত্রাহি করছে দেখে দে সরকার বলল, "এই

বুঝি তোমার লণ্ডন দেখার সংকল্প! এস এস, ক' নম্বরের মোজা চাই, এঁকে বল।"

এক সপ্তাহের মধ্যে দে সরকারের তৎপরতায় বাদল শীতের জন্যে যা কিছু দরকার সবই কিনে ফেলল। তার নতুন স্যুট, নতুন জুতো, নতুন হ্যাট। দে সরকার পই পই করে বলে দিয়েছে কোন টাইয়ের সঙ্গে কোন মোজা ও কোন রুমাল মানায়। ওভারকোট কিনে দিয়েছে স্যুটের সঙ্গে ও হ্যাটের সঙ্গে মিলিয়ে। পকেটে এক সেট আয়না-চিরুণী সব সময় রাখতে শিখিয়েছে। দে সরকার না থাকলে বাদল কেমন করে জেণ্টলম্যান হত? সুধীদা এ বিষয়ে অকর্মণ্য। বড় জোর জানে কোথায় নিরামিষ রেস্তোরাঁ ও Mudieর লাইব্রেরী। তার পোশাক বলতে দেশে তৈরি মোটা খদ্দরের গলা-বন্ধ কোট ও প্যাণ্টলুন, মোটা খদ্দরের টুপী। ফরমাস দিয়ে একটা দেশী পশমের গলা-বন্ধ ওভারকোট করিয়ে এনেছে। টাই মাফলার ইত্যাদির বালাই নেই তার। সুধীদা লণ্ডনের ফ্যাশানের ধার ধারে না। সুধীদা পুরাদস্তুর বিদেশী। বাদল সুধীদার সঙ্গে ঘর করল বটে, কিন্তু দে সরকারের সঙ্গে বাইরে ঘুরল।

দে সরকার বলে, "চাল দেওয়া জিনিসটাকে নেটিবরা একটা আর্ট করে তুলেছে, সেন। পোরো পাঁচ গিনির স্যুট, কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করলে অম্লানবদনে বোলো আট গিনির। থেকো সপ্তাহে দু'গিনি খরচ করে, কিন্তু চাল থেকে যেন সকলে ঠাওরায় সাউথ কেনসিংটন কিংবা সেণ্ট জন্‌স্ উডের বাসিন্দে। না, না, মিথ্যা কথা বলতে বলছিনে। কিন্তু snobকে যে সমাজে উঁচু আসন দিয়েছে সে সমাজে একটু আধটু অত্যুক্তি করলে বিবেকে বাধে না।"

বাদল বলে, "তুমিও খুব অত্যুক্তি কর বুঝি?"

"সকলের কাছে নয়। আমি এ বিষয়ে একান্ত সায়েন্টিফিক। যে রকম লোকের কাছে যে রকম advertise করলে ম্যাকসিমাম ফল পাওয়া যায় সে রকম লোকের কাছে সে রকম চাল দিই। বেঁচে থাকলে একদিন লর্ড নর্থক্লিফ কিংবা গর্ডন সেল্‌ফ্‌রিজ হব।"

দে সরকার আরো বলে, "আর ছাখ কাউকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোরো না। যখন কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে তখন তাকে চা খাওয়াতে চাও তো Tea Roomsএ নিয়ে যেয়ো, লাঞ্চ খাওয়াতে চাও তো রেস্তোরাঁতে দেখা করতে বোলো। কিন্তু বাড়ীতে ডেকে দারিদ্র্য দেখিয়ো না।"

দে সরকার এও বলে, "কেম্ব্রিজে তো এ বছর জায়গা পেলে না। এ বছরটা অপেক্ষা করবে, না এখানকার কোনো কলেজে ভর্তি হবে? আমি বলি, ব্যবসা শেখ।"

বাদল বলে, "ব্যবসা আমার মাথায় ঢোকে না ভাই দে সরকার, যদিও খুব কৌতূহল জাগায়। এক একটা ডিপার্টমেণ্ট স্টোর কেমন করে চালায় জানতে এত ইচ্ছা করে। সেদিন যখন সেল্‌ফ্‌রিজের দোকানে নিয়ে গেলে আমি ভাবছিলুম আমাদের পাটনা সেক্রেটারিয়াট তার তুলনায় কী! এককালে আমার খেয়াল ছিল লর্ড সিংহের শূন্য সিংহাসনটা পূর্ণ করব। এখন মনে হচ্ছে কী ক্ষুদ্র অভিলাষ!"

"লাটগিরিও চোখে লাগে না, সেল্‌ফ্‌রিজগিরিও ধাতে সয় না, অথচ সেনগিরি যে কী তাও আমাদের বলনি।"

"আমি নিজেই জানিনে ভাই। আমার মনে হয় আমি যেন একটা নেবুলা। হতে হতে কী যে হয়ে উঠব আমাকে ভাবতে সময় দাও।"

বাস্তবিক বাদল ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। লণ্ডনের বি-এ

ডিগ্রির জন্যে আবার সেই সমস্ত পুরোনো বইয়ের পাতা ওল্টাতে ও পরীক্ষা দিয়ে মরতে তার বিশ্রী লাগছিল। পি-এইচ-ডি'র থিসিস লেখবার অনুমতি পাবে কিনা সন্দেহ। পেলেও মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে গ্রন্থকীট হয়ে নতুন দেশের দৃশ্যরাশিকে উপেক্ষা করা তার বিবেচনায় অপরাধ। অথচ সুধীদা দিনের পর দিন তাই করে যাচ্ছে। সুধীদা যদি ডিগ্রীর জন্যে পড়ত তা হলে বাদলও পড়বার উৎসাহ পেত, কিন্তু সুধীদা বিদেশী ডিগ্রীর মর্যাদা মানে না। সে যদি চাকরি করে তো দেশী ডিগ্রীর জোরেই করবে। তার অভাব অল্প; আয় অধিক না হলেও চলে।

বাদল বলে, "আমার মন চায় মনে প্রাণে ইংরেজ হতে, ইংরেজের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ করতে, ইংরেজ যে যে সমস্যার সমাধান খুঁজছে সেই সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে। কলেজে পড়ে আমি কতটুকু ইংরেজ হতে পারি বল? ইংলণ্ডের সব অঞ্চল দেখব, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশব, সব প্রচেষ্টাতে যুক্ত থাকব এই আমার মনস্কামনা।"

দে সরকার এমন পাগল দেখেনি। বিলেতে এত ছেলে আসে, কেউ ব্যারিস্টার কেউ আই-সি-এস কেউ চার্টার্ড য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট কেউ এঞ্জিনীয়ার হয়ে ফেরে। সকলেরই একটা না একটা লক্ষ্য আছে। এমন কি যারা ফুর্তি করতে আসে তাদেরও একটা উপলক্ষ থাকে, তারা পড়ুক না পড়ুক পড়ার ফীটা দেয় এবং পরীক্ষায় অলিখিত খাতা দাখিল করে। অবশ্য বাড়ীর লোক জানে ছেলের হঠাৎ অসুখ করেছে কিংবা ইংরেজ পরীক্ষক ইণ্ডিয়ান ছাত্রকে পাস হতে দিচ্ছে না কিংবা ফল আরো ভালো হবে বলে ছেলে এ বছরটা হাতে রেখেছে। এই সব নিষ্কর্মা ধনী সন্তানদের সকলেই রেপাব্লিকান ন্যাশনালিস্ট, কেউ কেউ দুর্ধর্ষ কমিউনিস্ট। সকলেই নিখুঁত ইংরেজী বলতে চেষ্টা করে,

নিখুঁত ইংরেজী পোশাক পরে, ইংরেজ বন্ধু পেলে ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কি এই পাগ্‌লাটার মতো মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চায়?

দে সরকার বলে, "আমি স্বদেশী নই, আমি সব-দেশী। ভারতবর্ষই আমার দেশ নয়, ভারতবর্ষও আমার দেশ। ও দেশের মধ্যে তুমি এমন কী দেখলে যার দরুন ওকে একেবারে অস্বীকার করলে?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলে, "দশটা পথের থেকে একটা পথ বেছে নিলে অন্য নয়টা আপনিই উপেক্ষিত হয়। পথিকের মনে উপেক্ষা ভাব কেন জন্মাল সে প্রশ্ন কেউ করে না। প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে, পথিক তার লক্ষ্যের পক্ষে যে পথ অনুকূল সেই পথ বেছে নিয়েছে কিনা।"

দে সরকার তর্কে পরাস্ত হয়ে বলল, "জানি মশাই জানি! বাড়ী থেকে যতদিন টাকা আসতে থাকবে ততদিন ওদের যেমন কমিউনিজম তোমার তেমনি anglicism! বাপের ব্যাঙ্ক ফেল করলে কিংবা হঠাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি হলে বড় বড় মিঞারা দেশে ফিরে মাথা মুড়িয়ে কালো মেয়ে বিয়ে করে নগদ কয়েক হাজার টাকার মূলধন হস্তগত করে যা করে থাকেন তুমিও তাই করবে। লম্বা চওড়া কথা কেন আওড়াও, যাদু? চোস্ত ইংরেজী বলতে চাও, শেখ। Correct পোশাক পরতে চাও, পর। রোস্ট বীফ খেতে চাও, খাও। কিন্তু 'মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চাই' (দে সরকার বাদলের স্বরের নকল করল)—অতখানি মৌলিকতা আমি বরদাস্ত করতে পারব না, কারণ পৃথিবীতে কেউ কোন দিন অতখানি মৌলিক হয়নি।"

বাদলের মুখ কান লাল হয়ে গেল। সে তোৎলাতে তোৎলাতে অনেক কষ্টে যা বলল তার মর্ম—পৃথিবীতে সে এর আগে জন্মায়নি; কাজেই সে অভূতপূর্ব; ভূতপূর্বদের সঙ্গে তার মেলে না। দে সরকার

যেন নিজের সংকীর্ণ মাপকাটি দিয়ে তাকে মাপ করবার ধৃষ্টতা ত্যাগ করে। ছাতা চেনা জুতো চেনার মতো মানুষ চেনা অত সোজা নয়, ক্যালিডোনিয়ান মার্কেট পর্যন্ত যার দৌড় সে যেন সেইখানেই দাঁড়ি টানে।

এরপর দে সরকার দে চম্পট। বাদলের সঙ্গে আর তার দেখা হয় না। বাদলও লায়েক হয়ে গেছে। একলা লণ্ডনের এক মাথা থেকে আর এক মাথা অবধি যেতে পারে। পথ হারালে নিকটস্থ আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল স্টেশন কোথায়, তার খোঁজ করে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বারকয়েক ট্রেন বদল করে হেণ্ডনে উপস্থিত হয়। ভারি ফুর্তি! পথ ভোলাই তো পথ চেনা। বাদল অতি সহজে এই তত্ত্বটা আবিষ্কার করে ফেলল।

৪

বাদল পৌঁছে অবধি বাড়ীতে কিংবা শ্বশুরবাড়ীতে চিঠি লেখেনি, কেবল দুটো cable করেছিল। সে যে কোনোদিন ভারতবর্ষে ছিল এ ধারণাকে তার ইংলণ্ডগত মন একদণ্ড স্বীকার করছিল না। বর্তমানকে ভোগ করতে হলে অতীতকে ভুলে থাকা দরকার। অতীতের স্মৃতির একটি কণাও যদি বর্তমানের চেতনায় লেগে থাকে তবে সেইটুকু উচ্ছিষ্ট সমস্তটা ভোজ্যকে অপবিত্র করে দিতে পারে।

জাগ্রত অবস্থায় না হয় ভারতবর্ষকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু স্বপ্নে তো মনে হয় ভারতবর্ষেই আছি—সেই কতকাল পূর্বের দিদিকে দেখছি তিনি হঠাৎ উজ্জয়িনী হয়ে কলকাতার বাড়ীর ছাদে বড়ি দিচ্ছেন।

এরূপ স্বপ্ন বাদলকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এত কষ্ট করে এত সহস্র ক্রোশ দূরে এলুম, তবু এদেশের স্বপ্ন না দেখে সেই কোন পূর্বজন্মের স্বপ্ন

দেখছি। বাদল স্থির করল দিনের বেলা কোন ভারতীয়ের সংস্রবে আসবে না, কোন ভারতীয় বই বা চিঠি পড়বে না, বাসা বদলিয়ে সুধীদাকে এড়াবে এবং প্রতি সপ্তাহে দেশের চিঠি এলে সুধীদাকে দিয়ে পড়াবে ও উত্তর লেখাবে।

শনিবার রাত্রে দেশের ডাক এলে অন্যান্য বার সে পড়ে তুলে রাখত, উত্তর দেবে দেবে করে দেবার সময় পেত না। সেবার যখন ডাক এল বাদল সুধীকে বলল, "সুধীদা, কাল তো রবিবার। আমার চিঠিগুলো পড়ে জবাব লিখে দিতে পারো?"

সুধী বলল, "সে কী রে! আমার জবাব ওঁরা চাইবেন কেন? উজ্জয়িনীরা তো আমার নামও শোনেননি বোধ করি।"

"শুনেছেন হে শুনেছেন। পোর্ট সৈয়দ থেকে তুমি কী একটা বিয়ের উপহার পাঠিয়েছিলে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, কে এ কথা না জানে!"

"তা বলে আমি তোর প্রাইভেট চিঠির জবাব দেব? ছি! ছি!"

"প্রাইভেট চিঠি কাকে বলছ? মিস্ গুপ্তর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তোমারও ধরতে গেলে তাই। Mere acquaintance! সাত দিনে সাত ঘণ্টাও আলাপ হয়নি।"

সুধী সস্নেহভাবে বলল, "পাগ্‌লা!"

কিন্তু সত্য সত্যই বাদল চিঠি খুলল না, তুলে রাখল না, সুধীর ঘরে ফেলে রেখে ভুলে গেল। বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষের ডাক যাবার সময় অতিক্রান্ত হলেও যখন জবাব দিল না তখন সুধী ভীত হয়ে বলল, "বাদল, কাকামশাই অত্যন্ত ভাববেন। কাজটা ভালো করিসনি।"

বাদল বলল, "চিঠির জবাবের কথা বলছ? তুমি দাওনি? বা রে! এই নিয়ে চার সপ্তাহের চিঠি জমল।"

"চা-র স-প্তা-হে-র! করেছিস কী? আমার আজকাল দেখাশুনা করবার সময় হয় না বলে তুই অমানুষ হয়ে গেছিস? কাল সকালেই একটা cable করে দিতে হবে। কাকামশাই বড্ড ভাবেন।"

"ভালো কথা স্থধীদা, তোমার মাদামকে সাত দিনের নোটিস দিলে চলবে, না আরো বেশী দিনের? আমি Putneyতে উঠে যাচ্ছি।"

স্থধী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে রইল। বলল, "হেণ্ডন থেকে পাটনী লণ্ডনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তা জানিস?"

"ম্যাপে দেখেছি।"

"তবে তোর সঙ্গে রবিবারেও দেখা হবে না—শুধু যেতে আসতেই চারটি ঘণ্টা লাগে।"

"ধরে নিয়ো আমি কেম্ব্রিজে আছি।"

"হুঁ। এদিকে যে কলেজগুলো খুলে গেল। ভর্তি হবিনে?"

"নাঃ! ভেবে দেখলুম আইন পড়ব। তার মানে বার-ডিনার খাব এবং টো টো করে বেড়াব। Called যদি হই তো English Bar-এই প্র্যাকটিস করব। ইণ্ডিয়ায় আমি ফিরছিনে, ভাই স্থধীদা।"

স্থধীর প্রাণটা কেমন করে উঠল। যেন বাদল চিরকালের মতো পর হয়ে যাচ্ছে। এতদিন তাকে পক্ষীমাতার মতো পক্ষপুটে রেখেছিল; এখন সে বড় হয়েছে, উড়তে চাইছে।

স্থধী বলল, "সম্ভব হলে আমিও Putneyতে উঠে যেতুম। কিন্তু মার্সেলকে নিয়ে একটা নতুন শিক্ষাপদ্ধতির এক্সপেরিমেণ্ট করছি। সেও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।"

বাদল বলল, "সেই বেশ। আমি যে পরিবারে থাকব তাতে একজনের বেশী বাইরের লোক নেবে না। তাদের জায়গা নেই, এর আগে বাইরের লোক নেয়ও নি। কেমন করে তাদের আবিষ্কার করলুম জানো, স্থধীদা?"

৫

বাদল চলে গেলে পরে বাদলের বাবাকে চিঠি লেখবার ভার সুধী বিনা দ্বিধায় নিল। কাকামশাই তারই হাতে বাদলকে সঁপে দিয়েছেন। তার চিঠির উপর তাঁর যতটা আস্থা বাদলের চিঠির উপর ততটা নেই। তিনি ভালোই জানতেন যে বাদল সাংসারিক বিষয়ে অমনোযোগী ও অজ্ঞ। দরকারী টেলিগ্রামকেও সে ছেঁড়া কাগজের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে থাকে, রেজিস্ট্রী করে রসিদ নিতে ভুলে যায়, বাজার করতে পাঠালে দোকানদার যে দর হাঁকে সেই দর দিয়ে আসে—ওসব কথা দূরে যাক, স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটতে জানে না। কোনোবার বাদল যদি বা ট্রেনে ওঠে তার জিনিস ওঠে না। কোনোবার তার জিনিসপত্র যদি বা ট্রেনে ওঠে সে নিজে ওঠে না। প্রায়ই তার চশমা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলে, "সুধীদা, তুমি দেখেছ?" সুধী তার কান দুটো মলে কান থেকে চশমাটাকে টেনে বের করে। তখন বাদল বলে, "How funny! চশমাটা সারাক্ষণ চোখেই ছিল, তা নইলে সেটাকে খুঁজে বেড়াবার মতো দৃষ্টিশক্তি যে থাকত না।"

এই অসহায় ছেলে বিরাট লণ্ডন শহরে অপরিচিতদের সহিত একাকী বাস করবে! দে সরকারকে যতক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরত ততক্ষণ মোটর চাপা পড়বার সম্ভাবনা ছিল না। এখন নিষ্কর্মার মতো টো-টো করে বেড়াবে—আইন পড়া তো তিন মাসে ছয় দিন ডিনার খেয়ে আসা?

সৌভাগ্যক্রমে সুধী ও বাদল উভয়েরই বাড়িতে টেলিফোন ছিল। সুধী প্রত্যহ একবার করে রাত্রে ফোন করে খবর নেয়। "দিনটা কেমন কাটল?"—"বেশ চমৎকার। আজ গেছলুম Gray's Innএ ভর্তি হতে। কিছুতেই নিতে চায় না। ইণ্ডিয়ান কম নিয়ে থাকে। বললুম,

আপনিও যেমন ব্রিটিশ আমিও তেমনই ব্রিটিশ। এই দেখুন পাসপোর্ট। এই Innএর উপর আমার জন্মগত অধিকার। পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করে বলল, আপনার বাবা ম্যাজিস্ট্রেট? তবে তো আইনের চর্চা আপনার বংশগত। তারপর ভর্তি হবার অনুমতি পেলুম। চেক লিখে দিয়েছি।"

"দিনটা কেমন কাটল?"—"খুব ভালো, ধন্যবাদ। মিসেস উইল্সের সঙ্গে সারাদিন গল্প করে কাটিয়েছি। **Devon, glorious Devon**— সেইখানে তাঁর ও তাঁর স্বামীর জন্ম ও বিবাহ। সে আজ কতকালের কথা। তারপর এঁরা লণ্ডনে এসে স্থায়ী হন। কতরকম অবস্থা পর্যায়! ওঃ সে অনেক কথা। আজ আমাকে এক্সকিউস্ কর! গুড নাইট।"

ইতিমধ্যেই কথায় কথায় 'ধন্যবাদ' ও 'এক্সকিউস্ কর!' এই তার আত্মীয়তম বাদল। সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। তার নিজের দিক থেকে বাদলের প্রাত স্নেহ কমেনি তো? বাদল যে বড় অভিমানী ভাইটি। একবার সুধী তাকে না দেখিয়ে মাসিকপত্রে লেখা ছাপিয়েছিল বলে বাদল একরকম প্রায়োপবেশন করেছিল বললে চলে।

সুধী একদিন জিজ্ঞাসা করল, "কিরে, আমার উপর রাগ করিসনি তো?"—"না, রাগ করব কেন? এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি বলে বলছ? রোসো, আগে মিউজিয়ামে ভর্তি হই, সেইখানেই মাঝে মাঝে দেখা হবে। রবিবারে আসতে চাইছ? অনেক দূর—অনেক-গুলো চেঞ্জ। কাজ কী এত কষ্ট করে?"

এর পর সুধী বাদলকে ফোন করা কমিয়ে দিল। কাকামশাইকে চিঠি লেখবার সময় এলে জিজ্ঞাসা করে, "তোর কিছু বলবার আছে?"— "কিছুই বলবার নেই, ধন্যবাদ।"

উজ্জয়িনীর চিঠি নিয়ে সুধী মুশকিলে পড়ল। বাদল চলে যাবার পরেও সুধী উজ্জয়িনীর চিঠি খুলতে সংকোচ বোধ করল। কিন্তু দেখতে দেখতে যখন কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল তখন সুধী ভাবল উজ্জয়িনীর ধৈর্যের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। সুধী দ্বিধার সহিত চিঠিখানা খুলল।

বেশি নয়, ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। তাতে আছে, মিস্টার সেন, বিলেতে গিয়ে আমাদের ভুলে গেছেন বোধ করি। কেমন লাগছে? কার কার সঙ্গে আলাপ হল? শুনেছি ওখানে একটা ভালো চিড়িয়াখানা আছে। আমি আপনার দেওয়া বইগুলি পড়ে ভালো বুঝতে পারিনে। অলিভ শ্রাইনারের Lyndalকে আমার বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ইবসেন থেকে কি উপদেশ পাওয়া যায়? আমরা ভালো আছি। আজ আসি। ইতি। বিনীতা শ্রীউজ্জয়িনী।

পুনশ্চ ঃ—ওখানে কি বড় শীত? বরফ পড়ছে বুঝি? বেশী বাইরে বেরবেন না। ঠাণ্ডা লাগলে সময়মতো প্রতিকার না করলে নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। কিছু ফরাসী ডাকটিকিট পাঠাবেন? বাবার আশীর্বাদ জানবেন।

৬

বিবাহ সম্বন্ধে বাদল কিছু বলেনি। সুধীও জিজ্ঞাসা করেনি। সুধী জানত ব্যাপারটা যদি সুখের হত তবে বাদল আপনা থেকেই বলত। উজ্জয়িনীর বয়স কত, সে কতদূর পড়েছে, তাকে দেখতে কেমন—সুধীকে বাদল আভাসটুকুও দেয়নি। মনে মনে তার একটি প্রতিমা গড়বার পক্ষে মালমসলা তার চিঠি। সুধী কল্পনা করল উজ্জয়িনী ছোট একটি মেয়ে, বয়স তের চোদ্দ, দেখতে কিছু গম্ভীর। বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি, সরল, শিষ্ট। সুজেতের মতো মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে

না, সপ্রতিভ। অল্পবয়সীর মতো চিড়িয়াখানায় কৌতূহলী অথচ বয়সের অনুপাতে চিন্তাশীল।

কিন্তু কী লিখবে? উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা Sigrid Undsetকে চিঠি লেখার থেকে কঠিন। দু'জনেই অপরিচিতা, কিন্তু একজন খ্যাতি-সম্পন্না। খ্যাতিতে দূরত্ব হ্রাস করে।

সুধী লিখল :—

কল্যাণীয়াসু,

আমি বাদলের জ্যেষ্ঠ—অতএব আপনারও। বাদল নানা কাজে ব্যস্ত। তার চিঠিপত্র আমাকেই পড়তে হয়। আমি তার কেবল অগ্রজ নই, সচিব ও সখা। উপরন্তু সেক্রেটারী। সেই অধিকারে এ পত্র লিখছি। এটি আপনার পত্রের উত্তর।

বাদলের শারীরিক কুশল। সে থাকে দক্ষিণ পশ্চিমে, আমি উত্তর পশ্চিমে। সম্প্রতি কিছুকাল দেখা হয়নি, কিন্তু প্রায়ই ফোন-যোগে কথাবার্তা হয়। উদ্বেগের কারণ নেই। সে ভালো জায়গাতেই আছে।

চিড়িয়াখানা এখনো দেখতে যাইনি। আমার বোন মার্সেল টিউবে কিংবা বাসে চড়লে অসুস্থ হয়ে পড়ে, জানিনে তার কী অসুখ আছে। তাকে না নিয়ে একা গেলে সে মনে কষ্ট পাবে। ভেবেছি একদিন তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে নিয়ে যাব। কিন্তু লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়ী বড় একটা দেখতে পাইনে।

ফরাসী ডাকটিকিট কাছে নেই, আনিয়ে দেব। উপস্থিত বেলজিয়ান ডাকটিকিট পাঠাচ্ছি।

আমার পত্র যদি আপনার পছন্দ হয় তো ভবিষ্যতে যে পত্র লিখব তাতে সাহিত্যের কথা থাকবে। আপনার বাবাকে আমার

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আপনি আমার প্রীতি নমস্কার জানবেন।
ইতি। নিবেদক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে সুধী ভাবল কনিষ্ঠাকে আপনি বলাটা ঠিক হল না। কিন্তু প্রথম চিঠিতেই বা 'তুমি' লিখি কী করে? একে তো সে বাদলের চিঠির বদলে আমার চিঠি পেয়ে বিষম অভিমান করবে। বাদ্‌লাটা এমন পাগলা। নিজের মন নিয়ে ব্যাপৃত, পরেরও যে মন বলে কিছু আছে সে খবর রাখে না। বিয়ে করলে বদলাবে ভেবেছিলুম। কই, কোনো পরিবর্তন তো দেখলুম না। যে কে সেই। কিন্তু চিরদিন সে এমন থাকবে না, থাকতে পারে না। ইংলণ্ডের মোহ টুটলে দেশের টান দুর্বার হবেই। তখন তার স্মৃতিকে ও স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করবে দেশরূপিণী একটি নারীমূর্তি। তখন উজ্জয়িনীর আর কোনো ক্ষোভ থাকবে না। দীর্ঘসঞ্চিত অভিমান আনন্দাশ্রুপ্রবাহে ধৌত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সুধী তার নিজের পড়া ও পড়ানোতে মন দিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে শীতপ্রধান দেশে গেলে গরম পোশাক পরতে হয়, গরম ঘরে থাকতে হয়, যে খাদ্য থেকে প্রচুর তাপ পাওয়া যায় তেমন খাদ্য খেতে হয়। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে দেহের একটা বনিবনা ঘটাতে হয়। সুধী ভাবল, শুধু তাই? এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে এলুম। এ দেশের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পশু-পক্ষী-ওষধি-বনস্পতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে না? শকুন্তলা আশ্রমতরু ও আশ্রমমৃগদের কাছে বিদায় নিয়েছিল, আমি আগমন সংবাদ জানাব। তোমরা ছিলে, আমি এলুম। তোমরা আমাকে স্বীকার কর, আমি তোমাদেরকে স্বীকার করি।

সুধীর পড়ার ঘরের জানালা খুললে দৃষ্টিপথে পড়ে বহুদূরবিস্তৃত মাঠ।

ওর উপর উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ইংলণ্ডের সকল মাঠের মতো এটিও অসমতল। কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপত্যকা। একটি সেতু। Asphalt পিহিত রাজপথের দ্বারা যেন মাঠের কোমল গাত্র ছড়ে গেছে।

সুধী মনে মনে বলল, "তোমরা প্রতিদিন একটু একটু করে আমার অঙ্গ হবে, আমি প্রতিদিন একটু একটু করে তোমাদের অঙ্গ হব। আমি যখন ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাব তখন যাব অথচ যাব না। যেখানেই যাই তোমরা আমার সঙ্গে চলবে।"

৭

কয়েক দিন থেকে অনবরত টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। রবিবার। বের হবার তাড়া নেই, বের হয়ে সুখ নেই। সুধীর ঘরে কয়লার আগুন জ্বলছিল, সুধী চেয়ারটাকে আর একটু টেনে নিয়ে আগুনের উপর হাত রাখল। কনকনে ঠাণ্ডা। হাত জমে গেছে। কলম ধরে লিখতে বসলে কলম চলে না।

কাল রাত্রে উজ্জয়িনীর আর একখানি চিঠি এসেছে। উজ্জয়িনী উত্তরের জন্য দেড় মাস অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। উত্তর তো যথাকালে পাবেই, এই ভরসায় সে যখন তার লিখতে ভালো লাগে তখন লেখবার অনুমতি চায়। অবশ্য বাদলের কাছে।

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সুধীকে আকুল করেছিল। তন্ন বিত্তা যন্ন দীয়তে। সুধী প্রতিদিন যা আহরণ করছে তাকে মনের রসায়নে স্বকীয় করে কারুর কাছে ধরে দেবার তাড়না অনুভব করছিল। আগে ছিল বাদল। বাদলের সঙ্গে মৌখিক আলোচনায় তার চিন্তা তার কাছে স্পষ্ট

হত। মুখ কী বলে কান তা শোনবার জন্য লালায়িত। হাত কী লেখে চোখ তা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব। নিজের ভিতরে কেমন মৌচাক বাঁধা হচ্ছে মন সে বিষয়ে কৌতূহলী।

উজ্জয়িনীকে লেখার দ্বারা ডায়েরী লেখবার অপ্রীতিকর দায় এড়ানো যায়। ডায়েরীতে মাত্র একটি মন আপনাকে মন্থন করে অবসন্ন হয়। চিঠিপত্র ছুটি মনের ঘাত-প্রতিঘাত। তোমার ভাবের করাঘাতে আমার ভাবের ঘুম ভাঙবে। আমার ভাবনার ঢিল লেগে তোমার ভাবনার মৌচাক থেকে মধু ক্ষরবে।

সুধী কিছুক্ষণের জন্যে নিচে নেমে গেল। বলল, "মাদাম, মার্সেলকে সুজেৎ পিয়ানো বাজাতে শেখাচ্ছে, ভালোই। যেন উপরে উঠতে দেয় না। আমার এখন অন্য কাজ।"

উজ্জয়িনীর চিঠিখানা আর একবার পড়ল। শাদা কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে রুল টানা। হাতের লেখাটি ঝরঝরে। অক্ষরগুলি কাঁচা। উত্তরের অপেক্ষা না করে মাঝে মাঝে চিঠি লেখবার সংকল্প জানিয়ে উজ্জয়িনী লিখছে :—

লরেন্সের বইগুলো গোড়া থেকেই বেহাত হয়েছে। দিদিরা পড়তে নিয়ে ফেরত দেয়নি। মেজদি নাকি মাকে লিখেছে, লরেন্সের বই খুকীর হাতে দেওয়া যায় না। তার বদলে ওকে আমি Fairy tales কিনে দেব। ইস্! তবু যদি আমার বয়স সতের না হত। আচ্ছা বলুন দেখি কেন ওরা আমাকে খুকী বলে ক্ষ্যাপায়। কেউ কেউ বলে পাগলী। আমি বাবাকে বলে দিই। বাবা বলেন, যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় আমি পাগলী?

এতগুলো নভেল নাটক দেখে বাবার চক্ষু স্থির। বললুম, বাবা বুঝিয়ে

দাও। বাবা বললেন সময়ের অপব্যয়=আয়ুক্ষয়। এবং নাটক-নভেল পড়া=সময়ের অপব্যয়। তখন তিনি শ্লেট পেন্‌সিল নিয়ে অঙ্ক কষছিলেন, তাঁর অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। ভাবলুম এখুনি বলবেন, খুকী, বোস। সেদিন যে বলছিলুম একটা শাদা মোরগের সঙ্গে একটা কাল মুরগীর যদি বিয়ে হয় আর তাদের যদি আটটা ছানা হয় তবে ছানাগুলোর রং কী কী হবে, সেই ধাঁধার জবাব দে।

কাজ নেই বাবা মুরগীর ছানার রংএর আঁক কষে। পড়ছিলুম ইবসেনের "A Doll's House." পালিয়ে এসে বাগানে বসে শেষ করা গেল। কিন্তু অর্থ?—

উজ্জয়িনী আরো কিছু লিখে চিঠিখানার যথাবিধি ইতি করেছিল।

সুধী লিখল:—

কল্যাণীয়াসু,

মিউজিয়ামের পাঠাগারে সে দিন বাদলের সঙ্গে দেখা। কখন এসে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। আমি চেয়ার চেড়ে উঠে বললুম, কথা আছে, মিউজিয়ামের বাইরে চল। তার সঙ্গে একটি ভারতীয় যুবক ছিল। বাদল বলল, এঁর নাম আলী। ইনি খবর এনেছেন এঁর ও আমার বন্ধু মিথিলেশকুমারীর অসুখ। দেখতে যাচ্ছি। তুমি আমাকে টিউব অবধি এগিয়ে দিতে পারো?

পথে চলতে চলতে বললুম, বাদল, উজ্জয়িনী তোরই চিঠি চান, আমার চিঠি না। তোর কি সত্যিই সময় নেই? বাদল বলল, সত্যিই সময় নেই। মিসেস উইল্‌সের সঙ্গে তর্ক করা, বাজার করা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। মাঝে মাঝে ট্রেনে ও বাসে করে শহরে আসতে কয়েক ঘণ্টা অপব্যয় করা। এর পরে যেটুকু সময় থাকে সেটুকুতে বই কাগজ ঘাঁটা। আমি বললুম, সাতদিনে একখানা চিঠি লেখা। সত্যিই সময় নেই?

বাদল বলল, বা রে। আজ Poppy Day ; তোমার গায়ে Poppy কই ? একটি মেয়ের বাক্সে ছ'পেনী ফেলে বাদল বলল, এঁর কোটের বাট্‌ন্‌হোল্‌-এ একটি পপি পরিয়ে দিন। মেয়েটি সেই শ্রেণীর মেয়ে যারা বিদেশী পথিক দেখলে তার ইংরেজীজ্ঞান পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করতে এগিয়ে আসে, বলতে পারেন ক'টা বেজেছে ? বাদলের মুখে ইংরেজী শুনে তাকে পরীক্ষার পাস নম্বর দিল। আমার রবিঠাকুরী টুপীটি দেখে আমার ইংরেজীজ্ঞান সম্বন্ধে তার সন্দেহ দৃঢ় হল। বলল, এঁর কোটে বাট্‌ন্‌হোলই নেই। এইখানে বলে রাখি আমার ওভারকোট খাস বিলিতী নয়।—আমি বললুম তবে পপিটি আমি আপনাকেই উপহার দিলুম।

টটনহ্যাম কোর্ট রোড। টিউব স্টেশনে বাদলকে পৌঁছে দিয়ে আমি মিউজিয়ামে ফিরলুম। তারপরে আর বাদলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কাল আপনার দ্বিতীয় পত্র এল। দেশ ছাড়বার আগে যদি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আসতুম তবে আপনার পত্রের যেখানে যেখানে পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে সেখানে সেখানে চোখ পড়বামাত্র মনের পর্দার উপর ছবি জ্বলে উঠত। দেখতে পেতুম ইনি আপনার মেজদি, ইনি আপনার মা, ইনি আপনার বাবা। পত্রের উত্তর লেখবার সময় আঁধারে ঢিল ছোঁড়ার মতো হত না।

তবে আপনাকে আমি চিনি। পত্রের বাতায়নপথে দেখেছি, কল্পনায় বাকীটুকু বানিয়ে নিয়েছি। প্রতি পত্রে আপনি স্পষ্টতর হচ্ছেন। যেন একটি চেনা মানুষ দূর থেকে নিকটে আসছেন।

ইবসেনের ডল্‌স্‌ হাউসের অর্থ কী ? আমি যতদূর বুঝি, ঘর ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ঘর, বাহির ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বাহির। তাঁতী তার বাড়ীতে বসে কাপড় বুনত, তাঁতিনীর সাহায্য নিত। এখন তাঁতী

যায় কারখানার মজুর হয়ে, তাঁতিনী কুটীরে পড়ে থাকে। সমাজ ছিল গৃহের সমবায়। গৃহের দুটি চরণ—গৃহস্থ ও গৃহিণী। এক সময় দেখা গেল যে গৃহস্থ গৃহের ত্রিসীমানায় নেই, গৃহিণী গৃহ আগলে পড়ে আছে পুরুষ আপিসে আদালতে পার্লামেণ্টে মিউনিসিপালিটীতে স্ত্রীকে অর্ধাসন দেয় না। এতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তভঙ্গ হয়। স্ত্রী দাবি করছে নূতন সামঞ্জস্য, নূতন সহধর্মিতার আদর্শ। নতুবা সে যেন একটি পুতুল। যে ঘরে তাকে রাখা হয়েছে সেটা যেন একটা খেলাঘর। সেখানে পুরুষ একটু আমোদ করবার জন্যে ক্লান্তি দূর করবার জন্যে সেবা লাভ করবার জন্যে আসে। স্ত্রীকে নিজের ভাবনায় ভাগ নিতে দেয় না; স্ত্রীর ভাবনার ভাগ নিতে বললে ক্লাবে বেরিয়ে যায়।

নারীর বিদ্রোহ মূলতঃ এই নিয়ে। নারী সর্বত্র পুরুষের সঙ্গিনী হবে। পুরুষশূন্য গৃহে গৃহিণী হয়ে তার সার্থকতা নেই। আমার বিশ্বাস এই হচ্ছে ইবসেন প্রমুখ মনীষীর মনের কথা।

দরজায় দুটি টুক্ টুক্ করে টোকা মারার শব্দ শুনে সুধীর ধ্যানভঙ্গ হল। সে বলল, "আয়।" কিন্তু মার্সেল দরজা খুলবামাত্র যে ঘরে ঢুকল সে মার্সেলের কুকুর "জ্যাকী"। দুই পায়ে দাঁড়িয়ে জ্যাকী সুধীর কাঁধে দুটি পা রাখল। তার জিব লক লক করছে, চোখ দুটি একবার সুধীর মুখে একবার টেবিলের উপর রাখা চিঠিতে কী যেন অন্বেষণ করছে। মার্সেল ছুটে এসে তাকে নামাবার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত হল। বলল, "যা, যা-আ, যা।" বিরক্তিতে তার কান্না পেতে লাগল। কুকুরটা তার হুকুমে নিচে থেকে তার সঙ্গে উঠে এসেছে, তার বিনা হুকুমে ঘরে ঢুকে মিস্টার চক্রবর্তীর কোল জুড়ে বসেছে। "ওঃ! ওঃ! যায় না কেন? যা, যা—।" রীতিমতো নরে বানরে যুদ্ধ।

নিচে থেকে সুজেৎ দৌড়িয়ে এল। খোলা দরজায় টোকা মারতেই

সুধী তার দিকে তাকাল। সুজেৎ তার স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "মার্সেল আপনাকে খবর দিতে এসেছিল—খাবার দেওয়া হয়েছে।"

সুধী বলল, "ওঃ তাই ? আমি ভেবেছিলুম সার্কাস দেখাতে এসেছে। আয় রে মার্সেল।"

জ্যাকী পথ দেখাতে দেখাতে চলল, সুধীরা তার অনুগমন করল।

প্রথম শীত

১

বাদলের সঙ্গে কতকাল গল্প করা হয়নি। এতদিনে তো লণ্ডনের ধারা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে, নূতনত্বের আকর্ষণে ছুটে বেড়াবার তাগিদ তেমন প্রবল নয়, রয়ে সয়ে দেখলে শুনলে কোনোকিছু পালিয়ে যায় না। স্থধী একদিন ফোন করে বলল, "বাদল, সামনের উইকেণ্ডে এ বাড়ীতে থাকবি? জায়গা আছে।" বাদল বলল, "মিসেস উইল্‌সের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি।"

মিসেস উইল্‌স্ রাজি হলেন। অতএব বাদলও। শনিবার সন্ধ্যায় মাদামের সদর দরজার বেল বাজল। "আমি খুলব," "আমি খুলব," বলতে বলতে মার্সেল ও স্থজেৎ ছুটে এল।

বাদল পুরাতন কুটুম্বের মতো নিঃসংকোচে পাপোষে জুতো ঝাড়ল, স্ট্যাণ্ডে টুপি ওভারকোট লটকাল, লাউঞ্জে প্রবেশ করে একটা গদীওয়ালা চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়ে আগুনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল। তার স্থটকেসটা নিয়ে মার্সেল ও স্থজেৎ কাড়াকাড়ি করছে, কেউ কাউকে সিঁড়িতে উঠতে দিচ্ছে না, দুজনেই স্বল্পভাষী বলে শুধু উভয়ের "উঃ" "আঃ" "না" ইত্যাদি অনুযোগসূচক অব্যয় শব্দ কানে আসছিল।

স্থধী সেই ঘরেই বসেছিল। বলল, "ভেবেছিলুম তুই এখানে চা খাবি।"

বাদল বলল, "খাবই তো। খাওয়াও না এক পেয়ালা? অবশ্য শুধু চা, আর কিছু না। কী ভয়ানক ঠাণ্ডা!"

সুধী চায়ের কথা মাদামকে বলে এল

বাদল বলল, “জ্বালাতন করেছে সারাদিন। তর্ক আমি করতে ভালোবাসি শুনতেও ভালোবাসি। কিন্তু কেবল বুলি, কেবল ধুয়ো, কেবল কুড়িয়ে পাওয়া ঘসা পয়সার মতো বিশেষত্ববিহীন সর্বজনব্যবহৃত বচন।”

সুধী জানত জিজ্ঞাসা না করলেও ব্যাপারটা কী তা বাদল আপনা থেকেই বলবে। বাদল বলল, “কে বলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছে! বি-এ এম্‌-এ পাস করার নাম শিক্ষিত হওয়া নয়। নেতি নেতি করে ভাবতে শেখা চাই। লোকে যেটাকে সত্য মনে করছে সেটা নাও হতে পারে সত্য।”

সুধী দেখল আসল ঘটনাটা বাদলের মনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। অনেকখানি মাটি খুঁড়লে তবে ঘটনারত্নটি উদ্ধার হবে। সুধী ভাবল, এক কোপ মেরে দেখি যদি উদ্ধার হয়।

সুধী বলল, “মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে জোর তর্ক হয়ে গেল বুঝি?”

বাদল যেন ধরা পড়ে গেল। হঠাৎ ঘেমে বলল, “আগুনের এত কাছে বসা ঠিক হয়নি।” একটু দূরে সরে বসে বলল, “কী বলছিলে? না, মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে না। তাঁর একটি নতুন বাহনের সঙ্গে। হা-হা-হা। দেবীদের বাহনরা তো সাধারণত চতুষ্পদ হয়েই থাকে। ভুলে যাচ্ছি কী তাঁর নাম—বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কিংবা সেই রকম কিছু। লোকটির বহিরঙ্গ ঠিক আছে, খুব স্মার্ট পোশাক পরিচ্ছদ। চোখে প্যাঁস্‌নে। কী পড়েন জানিনে।”

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাদল বলল, “ভালো কথা, একটা হাসির কথা তোমাকে জানাই। মিথিলেশকুমারী বব্‌ করেছেন। শুধু তাই নয়। ছিলেন মিসেস দেবী, হয়েছেন মিস দেবী। হা হা হা!”

মিথিলেশকুমারী কে তাই সুধী জানত না। শুধু নাম শুনেছিল। জানবার আগ্রহ তার ছিল না

বাদল বলল, "বিন্ধ্যেশ্বরীজীর ধারণা স্ত্রীস্বাধীনতা এদেশের মেয়েদেরকে মাতৃত্বের অযোগ্য করে তুলেছে। বলেন, How can a typist make a good mother? বেচারি টাইপিস্টের অপরাধ সে হাঁড়ি ঠেলে সময় কাটায় না, টাইপরাইটার খট্‌খট্ করে সময় কাটায়। কিছুদিন আগে বাবুদের বুলি ছিল—সতীত্ব গেল গেল। এখনকার বুলি মাতৃত্ব গেল গেল!"

মঁসিয়ে রান্নাঘরে মাদামের সঙ্গে কথা বলছিল। বাদলের গলা শুনে বসবার ঘরে এল। যথারীতি অভিবাদনের পর বলল, "মিস্তার সেনের শীতটা কেমন লাগছে?"

বাদল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "চমৎকার!"

"চমৎকার! এই দারুণ শীত বৃষ্টি কুয়াশা! কয়েকদিনের মধ্যে বরফ পড়বে—"

মঁসিয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাদল বলল, "তবে তো আরো চমৎকার হয়। ইংলণ্ডে থেকে সুইটজারলণ্ডে থাকা যাবে। স্কেট করা যাবে, শী করা যাবে।" বাদলের কল্পনা সর্বত্র বরফ দেখতে লাগল।

বাদল অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল, "হাঁ, ইংলণ্ডের শীতকালটা চমৎকার। খুব শীত করে বটে, কিন্তু কয়লার আগুন পোহাতে কেমন মিষ্টি লাগে! গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাকলে বাইরে ভিজেও আরাম আছে। কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, তবু আমি মাইল চারেক হেঁটে বেড়িয়েছি, কারুর গায়ে ধাক্কা লাগাইনি।"

খাবার ডাক পড়ল।

খেতে খেতে বাদল বলল, "শুনবে মাদাম, আমার কতটা উন্নতি

হয়েছে ? ভারতবর্ষের মানুষ হাজার সাহেব সাজুক তার সাহেবিয়ানার অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে গোমাংস খাওয়া। সে পরীক্ষায় ফেল করাটাই নিয়ম, না করাটা নিপাতন। যার একে একে সব সংস্কার গেছে তার ঐ একটি সংস্কার যায় না। এই নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিদিন দুবেলা লড়াই করেছি, তোমাদের এখানেও। কিন্তু জয়লাভ করলুম এই সেদিন, সেও অপরের ষড়যন্ত্রে। শুনবে ঘটনাটা ?”

সুধীর মুখে খাবার রুচছিল না। বাদল, তার বাদ্‌লা, গোমাংস খেতে শিখেছে! কখনো বিশ্বাস হয়! না খাওয়াটা হতে পারে কুসংস্কার, হতে পারে অযৌক্তিক। তবু ভারতবর্ষের অতি দীর্ঘ ইতিহাস ও অতি ব্যাপক লোকমত কি কিছুই নয়!

২

পরদিন উপরের ঘরে বাদল ও সুধী আগুন পোহাচ্ছে। অগ্নি-স্থলীর পার্শ্বে বাদলের পিতার চিঠি। কাল রাত্রের ডাকে এসেছে।

তিনি লিখেছেন, সুধী ও বাদল যেন পশ্চাত্যের জীর্ণ কঙ্কাল বহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে না। যেন পাশ্চাত্যের বাহ্য চাকচিক্যে সম্মোহিত হয় না। যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্বথা বর্জনীয়।

বাদল বলল, “জগতের ইতিহাসে কি চিরকাল এই চলতে থাকবে ?”

সুধী বলল, “কী চলতে থাকবে ?”

বাদল নিজের চিন্তায় বিভোর থেকে ভাবে, সকলেই বুঝি সেই একই চিন্তায় বিভোর। সুধীদার পাল্টা প্রশ্ন শুনে তার কাণ্ডজ্ঞান ফিরল। সে বলল, “আমি ভাবছিলুম প্রবীণের সঙ্গে নবীনের এই

যে ভাবনা-বৈষম্য, এই যে দুরকম ইডিয়ম ব্যবহার করা, এর কি প্রতিকার নেই ?”

বাদল কী উপলক্ষে অমন কথা পাড়ল সুধী ধরতে পারল না। বলল, “হঠাৎ একথা তোর মনে উঠল কেন ?”

“দেখলে না, বাবা লিখেছেন, যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্বথা বর্জনীয় ? তুমি লিখলে লিখতে ও কথা ?”

বাদল অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করতে লাগল, “যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।” হঠাৎ খাড়া হয়ে আলস্য ভেঙে বলল, “বাবা একটু কষ্ট করে একটা বাংলা অভিধান পাঠালে পারতেন। ‘ভালো’ ‘মন্দ’ এ দুটো কথার অর্থ কী, সংজ্ঞা কী, সীমানা কতদূর— কে আমাকে বুঝিয়ে বলবে ? বাংলা ভাষার উপর আমার তেমন দখল নেই।”

বাদল পায়চারি করতে করতে চিন্তা ও তর্ক করতে ভালোবাসে। কিছুক্ষণ বাদে বলল, “কোনো দুজন মানুষের পক্ষে একই জিনিস ভালো নাও হতে পারে একথা আমরা তরুণরা দেখে ও ঠেকে শিখেছি। এই ধর বৃষ্টি। চাষারা দুহাত তুলে আনন্দ জানাচ্ছে। বাবুরা গজ্ গজ্ করছেন। মঁসিয়ে খক্ খক্ করে কাশছে আর আমি তো খুব খুশিই হয়েছি। কিংবা ধর বরফ। অনেকে পা পিছলে পড়ে হাড়-গোড় ভাঙবে। অনেকে পিছলাতে পিছলাতে নক্সা কাটতে কাটতে স্কেট করবে। মিসেস উইলসের সঙ্গে যুদ্ধের গল্প হচ্ছিল। তিনি বললেন, কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশ।”

সুধী বলল, “তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে ‘ভালো’ ও ‘মন্দ’ এক নয়। এবং ‘মন্দ’কে ছেড়ে ‘ভালো’কে নিতে হবে।”

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল, "আমি বলি 'ভালো' ও 'মন্দ' একই বস্তুর দুই বিশেষণ। এবং বস্তুটির অর্ধেক নিয়ে অর্ধেক ফেলা সম্ভব নয়। হয় পূরো নিতে হবে, নয় পূরো ফেলতে হবে। এই ধর বীফ। বাবা বলবেন মন্দ, আমি বলব ভালো। তিনি পূরো বর্জন করবেন, আমি পূরো গ্রহণ করব।"

সুধী মনে গ্লানি বোধ করছিল। বলল, "তর্ক থাক্‌, বাদলা। অন্তত দুহাজার বছর ধরে 'ভালো' ও 'মন্দ' নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়ে এসেছে। আরো দুলাখ বছর হবে। সেইজন্যে তর্কের উপর আমার আস্থা নেই।"

বাদল তর্কের পক্ষ নিয়ে তর্ক করতে উদ্যত হয়। সুধী নিজের দুই কানে দুই হাত দিয়ে বলে, "নন্‌ভায়োলেণ্ট নন্‌কোঅপারেশন।" দুজনেই হেসে ওঠে।

বাদল আবার এসে সুধীর কাছে বসল। সুধী বলল, "কাকামশাই লিখেছেন, উজ্জয়িনী এখন থেকে তাঁর কাছে থাকবেন, এই রকম কথা চলছে।"

"বটে? আমার লাইব্রেরীটা তা হলে তাঁকে উৎসর্গ করে দেব, আমার তো ফিরে যাবার সংকল্প নেই।"

"পাগল!"

"সত্যি সুধীদা। তোমার কাছে এলে স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ভারতবর্ষে এককালে আমি ছিলুম বটে। নতুবা ইংলণ্ডই আমার পক্ষে একমাত্র সত্য।"

"পাট্‌নীতে কেমন ঘর পেয়েছিস্? খাওয়াদাওয়া কেমন?"

"এই রকমই।"

"ঘুম কেমন হয়?"

"হয় না।"

সুধী দুঃখিত হল। বাদলের যে কোনো দিন ঘুমহানি দূর হবে সে আশা সুধীর ছিল না। সুধী বলল, "বাদল, ঘুম তোর যথেষ্টই হয়। তবু তোর কেমন একটা সংস্কার হয়ে গেছে যে ঐ ঘুম যথেষ্ট নয়। তোর রোগ আসলে ঘুমহানি নয়, ঘুমহানি বিষয়ক সংস্কার।"

বাদল বলল, "রোগটা যাই হোক আমাকে অর্ধজীবী করে রেখেছে। ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে যখন মিশি তখন নিজেকে মনে হয় অভিশপ্ত।"

"খুব মিশছিস নাকি ?"

"খুব নয়। টট্‌ন্‌হাম কোর্ট রোডের Y. M. C. A.-তে গিয়ে থাকি। ওখানকার ছেলেরা বেশীর ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য করে। কিন্তু খেলাধূলায় প্রত্যেকের মন পড়ে আছে। ছুটি পেলেই ড্রিল, জিমন্যাষ্টিক, সাঁতার, ওয়াটারপোলো, বেস্ বল, বাস্কেট বল, ফুটবল। পড়াশুনার দিকটা কাঁচা। তা বলে দেশবিদেশের খবর কেউ কম রাখে না, সব বিষয়ে দুচারটে কথা সকলেই বলতে কইতে পারে।"

এর পর উঠল মিসেস উইল্‌সের প্রসঙ্গ। কিন্তু উঠতে না উঠতেই নীচের তলা থেকে সোরগোল শোনা গেল।

৩

এতদিন পরে মঁসিয়ে দ্য সারকার এসেছেন, তাই নিয়ে আনন্দ-কলরোল। জনপ্রিয় দ্য সারকার একে bow করছেন, ওর করমর্দন করছেন, সুজেতের করপৃষ্ঠে চুম্বন রাখছেন, মার্সেলকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

সিঁড়ির উপর দুটি স্তম্ভীভূত নরমূর্তি দেখে দে সরকার বলল,

"নেমে আসুন, নেমে আসুন, মশাইরা। গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখছেন নাকি?"

মাদাম বলল, "আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দিচ্ছিনে, মঁসিয়ে। এইখানে খেতে হবে, গল্প করতে হবে।"

মঁসিয়ে (মাদামের স্বামী) বলল, "হাঁ মঁসিয়ে, আজ আপনাকে আমরা ছাড়ছি নে। কাল মিস্‌তার সেন এসেছেন, আজ আপনি।"

বাদল যে এ বাড়ীতে ছিল না দে সরকার সে কথা জানত না। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ফাঁস করে দেওয়া দে সরকারের স্বভাব নয়। তার ওভারকোট খুলে দিতে মঁসিয়ে এগিয়ে এল, সুজেৎ তার টুপি চেয়ে নিল, দে সরকারের আপত্তি কেউ গ্রাহ্য করল না।

মঁসিয়ের সঙ্গে সিগ্রেট বিনিময় হয়ে গেলে দে সরকার সুধীকে বলল, "এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়। আমার কিছু বলবার আছে।"

সুধী বলল, "বলতে আজ্ঞা হোক।"

"এমন দুর্যোগে দিশী খিচুড়ি খেতে নিশ্চয়ই আপনাদের—না অন্তত আপনার—মন চায়। মিস্টার সেন অবশ্য ইংরেজ।"

বাদল বলল, "মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে ইংরেজেরও আপত্তি নেই।"

সুধী বলল, "কিন্তু খিচুড়ি পাই কোথা?"

"সেই কথাই তো নিবেদন করতে যাচ্ছি। মশাইরা যদি দয়া করে গরীবের গ্যারেটে পদার্পণ করেন তবে আমি স্বহস্তে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াই। তবে আমার হাতে খেলে যদি জাত যায়—"

দে সরকারের দুষ্টুমি বাদলকে হাসাল। সে বলল, "তবে আমরা কিছু গোবরের জন্যে ভারতবর্ষে চিঠি লিখব।"

"তা যদি বলেন গোরু এদেশেও দেখা যায়। কিন্তু মিস

মেয়ো আমাদের বদনাম রটিয়েছে যে অপরে খায় গোরু আর আমরা খাই গোবর। সেই থেকে রক্ত টগবগ করছে। যাক্ ও কথা। খিচুড়ি খাবেন গরীবের গ্যারেটে? এ বেলা নয় ও বেলা।"

বাদল বলল, "রাজি। আমার জীবনে এমন সুযোগ তো আসে না।"

সুধী বলল, "মাদামকে খবরটা দিয়ে রাখতে হবে।"

দে সরকার বলল, "ফোন নম্বর জানা থাকলে ফোন দ্বারা নিমন্ত্রণ করতুম। অবশ্য ক্রটি মার্জনা করতেন। এতখানি আসা কি কম হাঙ্গাম? টিউব, বাস্, শ্রীচরণ। কবে এরোপ্লেনের দাম কমবে, আমাদের দুঃখ দূর হবে!"

বাদল দরদের সহিত বলল, "বাস্তবিক।" যদিও এরোপ্লেনের কর্কশ গুঞ্জন বাদলের হেণ্ডন ত্যাগ করার অন্যতম কারণ ছিল।

বাদল জানত না দে সরকার তার উপর রাগ করে তাকে এতকাল বর্জন করেছিল, সুধীও জানত না। দে সরকারের সঙ্গে যে আর দেখা হয় না এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। লণ্ডনে কে কার খবর রাখে? বিরাট শহর—কলকাতার আটগুণ বড়। যার সঙ্গে একবার কোনো সূত্রে আলাপ হয়ে যায় তার সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হয় না।

বাদল বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা একটা মিরাক্ল, মিস্টার দে সরকার।"

দে সরকারের রাগ পড়ে গেল। সে বানিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যেই এতদিনে এ বাড়ীতে আসা। আগে আসিনি বলে মাফ করবেন।"

বোকা বাদল বুঝতে পারল না যে দে সরকারের সম্প্রতি বান্ধবীবিচ্ছেদ

ঘটেছে, তাই সে সুজেতের সন্ধানে এসেছে। বাদল বলল, "আগে এলে আমাকে পেতেন না। আমি পাট্‌নীতে উঠে গেছি।"

দে সরকার বিস্মিত হল। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করা দে সরকারের স্বভাব নয়। সে বলল, "ওঃ পাট্‌নী! চমৎকার জায়গা! পাট্‌নী হীথ—খোলা ময়দান। সুখে আছেন। সেবার পাট্‌নী হীথে বেড়াতে বেড়াতে—"

৪

দে সরকার বিনয়বশত গ্যারেট বলেছিল বটে, কিন্তু ঘরখানি তার সুধীর ঘরেরই মতো উপরতলার একটি ঘর।

দে সরকার বলল, "বসুন। অমন করে কী দেখছেন? এই ঘরখানার প্রত্যেক ইঞ্চির একটি করে ইতিহাস আছে। ঐ চেয়ারখানিতে একজন বসত, ঐ ওয়ালপেপার একজনের পছন্দ মতো বসানো, ঐ টাইমপীস একজনের উপহার।"

বাদল ফস করে জিজ্ঞাসা করে পরে জিভ কাটল, "ঐ একজনটি কে?"

"সে কি একটি? তিনজনের উল্লেখ করলুম, মিস্টার সেন। কিন্তু মিস্টার সেন কেন বলছি? আপনাকে তো আগে 'সেন' ও 'তুমি' বলতুম।"

বাদল সতর্ক হয়ে নিয়েছিল, কৌতূহল জ্ঞাপন করল না। 'Sunday Times' ওল্টাতে লাগল। সুধী ও দে সরকার খিচুড়ির উদ্যোগ করতে বসল।

দে সরকারের কাবার্ডে ডাল চাল নুন ঘী (মাখন) ইত্যাদি মজুত ছিল। 'Barber's Bellatee Bungalow' থেকে খরিদ করা। কিছু বড়ি বেরিয়ে পড়ল দেশ থেকে প্রেরিত। দে সরকারের

ভাণ্ডারে আদা, লঙ্কা, গোলমরিচ, হলুদ ইত্যাদি এত রকম রসদ ছিল যে বহুতর ভারতীয় আহার্য প্রস্তুত করা যায়।

সুধী সুধাল, "আপনি কি প্রায়ই এই সব করেন নাকি ?"

"প্রায়ই। ঐ একটা বিষয়ে আমি এখনো খাঁটি বাঙালী আছি। দেশের ধর্ম বদলাক, সমাজ বদলাক, স্বরাজ হোক, সোভিয়েট হোক, কিন্তু আমাদের সনাতন রন্ধনকলাটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"—সকলে হাসল।

দে সরকার পাকা রাঁধুনি। সুধীও মন্দ রাঁধে না। দুজনে মিলে দেখতে দেখতে খিচুড়ি, আলুর দম ও পায়েস বানাল এবং বড়ি ভাজল। পড়ার টেবিলটা খাবার টেবিলে রূপান্তরিত হল, ওর উপর তিন গ্লাস জল রইল, কোথা হতে একটা ফুলদানীতে করে কিছু carnation ফুল উড়ে এসে জুড়ে বসল। কাবার্ড থেকে চাটনী নামল।

দে সরকার বলল, "সেনের খুব অসুবিধা হবে জানি—ছুরি কাঁটা নেই। তবে হাত ধোবার সময় গরম জল জোগাতে পারব।"

বাদলের অসুবিধা হচ্ছিল না বটে, কিন্তু খাবারের গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে কেমন-কেমন লাগছিল, যেন আঙুল অশুচি হয়ে যাচ্ছে। খোশগল্প করতে করতে খাওয়া যখন শেষ হল তখন সুধী বলল, "এমন তৃপ্তির সহিত ভোজন বহুদিন থেকে হয়নি।"

দে সরকার বলল, "এবার দক্ষিণা দিতে হবে নাকি, ঠাকুর ?"

"দিন। এদেশে দক্ষিণা দিয়ে ভোজন করতে হয়, দক্ষিণা নিয়ে ভোজন করা ইংলণ্ডের মাটিতে আমিই প্রবর্তন করি।"

দে সরকার একটি তিন পেনি মুদ্রা বাক্স থেকে বের করল। আমাদের দুয়ানি আকারের রজতখণ্ড। বলল, "ঠাকুর, গত বড়দিনের নিমন্ত্রণে একজনদের বাড়ী থেকে এইটি অর্জন করে এনেছিলুম—আমার ভাগ্যে

উঠেছিল। সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে এটিকে। আসল মানুষটিকেই যখন হারালুম তখন এটিকে কাছে রেখে কেন স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকব? আমি স্মৃতিভারমুক্ত হতে চাই।"—এই বলে তিন-পেনি-খণ্ডটি সুধীর হাতে গুঁজে দিল।

ঘরের ইলেক্‌ট্রিকের আলো হঠাৎ নিবিয়ে দিয়ে সুধী বলল, "বলুন আপনার কাহিনী।" সুধী বুঝতে পেরেছিল দে সরকার নিজের কাহিনী কারুকে বলতে না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাস করছে।

দে সরকার বলল, "ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে বলব?"

"নির্ভয়ে।"

"তবে এই শর্তে বলব যে আপনারাও আপনাদের কাহিনী বলবেন।"

"উত্তম।"

দে সরকার আরম্ভ করল :—

"আমার জীবনে একটার পর একটা প্রেম আসে আর আমাকে ধরাশায়ী করে রেখে যায়। আমার কাজকর্ম যায় চুলোয়, আমার জীবনের ব্রত হয় ভঙ্গ, আমাকে আবার গোড়া থেকে গড়তে হয়।

"ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানো কল্পনা করতে পারেন? কী অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ সেই পুনরুত্থান! ভাঙা হাড় জোড়া লাগে, উঠে দাঁড়াই, চলি। আবার লগুড়াঘাত। আর পারিনে। তবু পারি। মানুষ যে কত পারে তার ধারণা তার নিজের নেই। এই জন্যেই তো আমার সন্দেহ হয় যে মানুষ আত্মবিস্মৃত সর্বশক্তিমান। আত্মবিস্মৃত ভগবান।"

বাদল বাধা দিয়ে বলল, "ঐখানে আমার আপত্তি। ভগবান একটা **fallacy**, যেমন জাম্ববান একটা **myth.**"

দে সরকার বলে চলল—

"স্কুলজীবনের প্রেমকে আপনারা বলবেন calf-love. আমার ভালো মনেও পড়ে না। এক এক জনের জীবন কী দীর্ঘ! আমি যেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আছি। নিজের বাল্যকাল নিজের কাছে সত্য যুগের মতো পুরাতন।

"কলেজে পড়বার সময় যাকে পেলুম তার আসল নাম বলব না, আপনারা বাংলা মাসিকপত্রে প্রায়ই তার নাম দেখতে পান—"

বাদল বাধা দিয়ে বলল, "আমি তো বাংলা মাসিকপত্র ভুলেও পড়িনে, আমার কানে কানে বলুন না?"

"পড়েন না সেটা আপনাদের সেকেলে সাহেবিয়ানা, সেই প্রাঙ্‌মাইকেল যুগের। লর্ড সিংহের মতো লোক যা পড়েন আপনি তা পড়েন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা—যাতে থাকে আপনি তা পড়েন না। Shame!"

সুধী উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "বাদলকে ভুল বুঝবেন না, দে সরকার। বাংলা সাহিত্য ওর বেশ ভালো করে পড়া আছে এবং রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বই ওর লাইব্রেরীতে। কিন্তু বাংলা মাসিকে ও চিন্তার খোরাক পায় না। বলে, 'জল-মেশানো চিন্তা'। বাস্তবিক, আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাবুকরা ভালো জিনিস ইংরেজীতে লিখে খেলো জিনিস বাংলাতে লেখেন। তা যাক, আপনি আসল নাম নাই বা বললেন। ধরে নিলুম তাঁর নাম পদ্মিনী দেবী।"

দে সরকার হেসে বলল, "পদ্মিনী নারী বললে অত্যুক্তি হবে হয়তো। পদ্মিনী দেবীই বলব।…

"পদ্মকে পেলুম আমি যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। থার্ড ইয়ারটা ছাত্র সমাজের অলিখিত আইন মেনে scrupulously ফাঁকি দিয়েছি। ফোর্থ ইয়ারে ক্লাসের ধুরন্ধর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছি, কি হে,

বিশ্ববিদ্যালয় কী কী বই পাঠ্য নির্দেশ করেছে? ভাবছি কেমন করে আরম্ভ করা যায়, সেকেণ্ড ক্লাস অনার্সটা তো পেতেই হবে।…

"ক্লাসের শেষ সারির বেঞ্চির খানিকটে আমার রিজার্ভ করা। সেইখানে বসে আমি গল্প ও কবিতা লিখি। সর্বসম্মতিক্রমে ঐ আমার স্টুডিও। পাশের ছেলেরা আড্ডা দেবার সময় পরস্পরকে বলে, এই, আস্তে। দেখছিসনে উনি লিখছেন? প্রথম প্রথম ওরা চেষ্টা করেছিল আমার ধ্যান ভাঙাতে। কিন্তু আমি বললুম, আড্ডা আমি দুবেলাই দিয়ে থাকি, প্রমাণ চান তো আসুন আজ সন্ধ্যায়। কিন্তু কাজের সময় কানের কাছে ঢাক বাজালেও আমি টলব না। ওরা হাল ছেড়ে দিল। তারপর থেকে ওরা আমার বন্ধু।…

"আমাদের বেঞ্চিতে আমরা অন্য কারুকে বসতে দিইনে। কিন্তু একদিন দেখলুম সামনের সারি থেকে একজন আমার পাশের ছেলেটির সঙ্গে জায়গা অদল বদল করেছেন। বললেন, এখন থেকে এইখানেই বসব, আপনার আপত্তি আছে? বললুম, থাকলে আপনি শুনবেন কেন? তিনি বললেন, ছি ছি, রাগ করবেন না। আপনি সাহিত্যিক, আপনি তরুণ, আপনি বিদ্রোহী—শ্রদ্ধা করি বলেই তো কাছে এসেছি। ছেলেটিকে দেখতে বড় মধুর। লাজুক নয়, সপ্রাতিভ। কিন্তু তার মনের স্বপ্ন তার দেহের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।…

"আমি জিজ্ঞাসা করলুম আপনার নামটি জানতে পারি? সে বলল, অবশ্য। আমার নাম মৃত্যু।…বাপ-মায়ের রাখা নাম, না, নিজের দেওয়া নাম?…দুইই। ওঁরা বলেন মৃত্যুঞ্জয়, আমি বলি মৃত্যু। মৃত্যুকে জয় করতে পারে কেউ? মৃত্যুই জেতা।…

"একদিন মৃত্যু বলল, একখানা কাগজ বার করছি। বার করছি ঠিক না। আমাদের পারিবারিক কাগজখানাকে জগতের করছি।

মাতৃগর্ভে শিশু চিরকাল থাকে না, থাকলে জগতের প্রতি অন্যায় হয়। আমি বললুম, অন্য সময় খুঁজে পেলেন না? পরীক্ষার খড়্গ মাথার উপর ঝুলছে।...দুর্ভিক্ষের দিনেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। প্লাবনের রাত্রে ঘর ভেসে গেছে, গাছের উপর নারী আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে।...

"বাংলা মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা বারো মাসের যে কোনো মাসে বেরতে পারে। এমন কি চৈত্র মাসেও কোনো কোনো কাগজের বর্ষারম্ভ হয়েছে জানি। মৃত্যুর কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরবে আশ্বিন মাসে—প্রথম থেকেই পূজার সংখ্যা। সেজন্যে আমার লেখা চাই। আমি সাহিত্যিক, আমি তরুণ, আমি বিদ্রোহী। জিজ্ঞাসা করলুম, আর কার কার কাছে লেখা চেয়েছেন, মৃত্যুবাবু? উত্তর হল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশ সেনগুপ্ত— আমি বাধা দিয়ে বললুম, নরেশ সেনগুপ্ত তরুণ নাকি? মৃত্যু বলল, বয়সের ওই মুখোসখানা তো প্রকৃত নয়, প্রাকৃতিক। কুমারবাবু, আপনিও জড়বাদী হলেন?..."

বাদল চুপ করে শুনছিল। আর থাকতে পারল না। বলল, "আপনি কি জড়বাদী, না, Vitalist, না, অধ্যাত্মবাদী?"

দে সরকার রসিকতা করে বলল, "আমি বিসম্বাদী। অর্থাৎ আমি বাদী মাত্রেরই সঙ্গে বিবাদ বাধাই। আমি কিছু মানিনে, কিছুতে বিশ্বাস করিনে, আমার কোনো লেবেল নেই।"

বাদল উচ্ছ্বাস গোপন করতে না পেরে বলল, "ঠিক আমার মতো।"

দে সরকার নির্দয়ভাবে বলল, "মোটেই না। আমি জাতীয়তাই মানিনে। আপনি স্বজাতীয়তা ত্যাগ করে বিজাতীয়তা বরণ করেছেন। আমার বাড়ী Cosmopolis, সে জায়গা কোথাও নেই। আপনার বাড়ী লণ্ডন।"

বাদলের মুখখানা লাল হয়ে গেল কি কালো হয়ে গেল অন্ধকারে দেখা গেল না। কিন্তু সুধী তো বাদলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। সে অনুমানে বুঝে বলল, "গল্পটা আমার বড় ভালো লাগছিল। এইবার পদ্মিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—সর্বগুণান্বিতা অনবদ্য সুন্দরী। নিন্, খেই ধরিয়ে দিলুম।"

৫

দে সরকার বলল, "আশ্চয্যি, তখন অনবদ্য সুন্দরীই মনে হত বটে; দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস তো আছে। মনটা এখনকার মতো বিশ্লেষণশীল হয়নি। কিন্তু কী বলছিলুম? মৃত্যু আমাকে একদিন একরাশ লেখা দিয়ে বলল, 'দেখে দাও না!' মৃত্যুদের বাড়ীর সকলেই লেখক, মায় বেড়াল কুকুর পর্যন্ত। ঠাকুর পরিবারেও এমনটি দেখা যায় না। ইনি কে হে, মৃত্যু?…ওঃ। উনি? আমার পটল মামা; আমাদের বাড়ীতে থেকে ডাক্তারি পড়েন।…আর ইনি?…রাঙা পিসির কথা জিজ্ঞাসা করছ? ওঁর জোরেই তো কাগজ বার করছি। আমার সমবয়সী ও মন্ত্রী।…মৃত্যুদের বাড়ীর সকলের নাম-পরিচয় একে একে জানলুম। তখন ওঁদের সঙ্গে মেশবার কৌতূহল জাগল। বললুম, মৃত্যু, এ সব মূল্যবান document আমার মেসে থাকলে বেহাত হবে, নাম বদলে অন্যেরা ছাপবে। একটা আপিস কর। মৃত্যুদের বৃহৎ বাড়ীর এক কোণে আমাদের আপিস বসল। সাইনবোর্ড খাটানো গেল—'কনীনিকা। বয়ঃকনিষ্ঠদের মুখপত্র।'"

এবার সুধী বাধা দিয়ে সুধাল, "কই, নাম শুনেছি বলে মনে হয় না তো?"

দে সরকার উত্তর করল, "আমাদের প্রথম সংখ্যাই হল শেষ

সংখ্যা আর বর্ষারম্ভ হল বর্ষশেষ। তার কারণ মৃত্যু বেচারা মৃত্যু-মুখে পড়ল।"

বাদল বলে উঠল, "আঃ হাহা!"

দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে বলল, "মৃত্যু যে দিন প্রথম তাদের ওখানে আমাকে নিয়ে গেল সেদিন আমাকে আপিস ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে প্রত্যেককে বলতে বলতে চলল, মা গো, সেই বিখ্যাত লেখক—(চা খেতে বল) রাঙা পিসি, সেই তরুণ লেখক—(সেই যিনি অশ্লীল লেখেন?) শৈলেন, সেই স্টাইলিস্ট্ লেখক—(আচ্ছা, আমি আসছি তাঁর কাছে)।"

বাদল আন্দাজ করে বলল, "সেই রাঙা পিসিটিই পদ্ম, না?"

"তিনিই। তবে তাঁর নাম পদ্ম নয় আসলে।

"ঘনিষ্ঠতার বিলম্ব হল না। দুএকদিন পরে তাঁর সঙ্গে যেই প্রথম দেখা হয়েছে ফস করে বলে বসলুম, আপনার কাছে একটা নালিশ আছে। নালিশটা আপনারই নামে। পদ্ম একটু একটু কাঁপছিল। কী নালিশ? আপনি নাকি বলেছেন আমি অশ্লীল লিখি? পদ্ম থতমত খেয়ে বলল, কে বলেছে? মৃত্যুঞ্জয়? তার পরে ক্রমশ তার লজ্জা ভাঙল। আমার কবিতা পড়ে সে প্রথম জানল যে তার মতো সুন্দরী আর নেই, সেই এ যুগের হেলেন, বেয়াত্রিচে, এমিলিয়া ভিভিয়ানী। পদ্মর স্বামী তাকে বিয়ে করেই স্বর্গে চলে যান—সেই থেকে পদ্ম এতদিন তাঁর ফোটো পূজা করে আসছিল। কিন্তু ফোটো তো ফিরে পূজা করে না। পূজার ক্ষুধা পদ্মর আমি মেটালুম। তখন আমার ফোটো পদ্মর বাক্সে উঠল।…

"ইতিমধ্যে বেচারা মৃত্যুর হল অকাল-মৃত্যু। কাগজ গেল সহমরণে। কোন সূত্রে ওদের বাড়ী যাই? তখন একটা ছল আবিষ্কার করলুম।

মৃত্যুর যাবতীয় লেখা সংগ্রহ করে বই করে বার করব। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুর স্মৃতি থাকবে। পদ্ম লিখবে মৃত্যুর জীবন কথা। আমি লিখব ভূমিকা।...

"ছ মাসের মধ্যে আমরা পরস্পরের অন্তর্যামী হলুম। যতক্ষণ দেখা হয় না ততক্ষণ মরে থাকি। দেখা হলে এত খুশি হই যে সব সময়টা বাজে বকি। সেও মিষ্টি লাগে। নমো নমো করে বি-এ পরীক্ষা দিলুম, কোনোমতে ডিগ্রীটা পেলে বাঁচি।...

"অবশেষে পদ্মকে লিখলুম, নী—, প্রেমকে স্থায়ী করবার উপায় পরিণয়। তার সময় আসেনি কি? পদ্ম জবাব দিল না। লিখলুম, নী—, আমাদের দুজনের জীবনকে করে তুলব একখানি উপন্যাস। দুজনে মিলে একখানি জীবনোপন্যাস লিখব—নিখিলের কথা, বিমলার কথা, তোমার একটি পরিচ্ছেদ, আমার একটি পরিচ্ছেদ, এমনি করে অসংখ্য পরিচ্ছেদ। পদ্ম জবাব দিল না।...

"যে দিন তার সঙ্গে দেখা হল তার চোখে দেখলুম জল টলমল করছে। তার কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁপা ফুলের মতো শাড়ী, ঋজু তরুর মতো গড়ন, শুকতারার মতো চাউনি। সে আমার স্ত্রী; সে আমার ভবিষ্যৎ; সে আমার যশ ও লক্ষ্মী, সন্তান ও সার্থকতা। এক নিমেষে বহু দিবসের সৌধ টলে পড়ল, তার কয় বিন্দু অশ্রুর মতো।...

"পদ্ম বলল, আমার শ্বশুরের মাথা হেঁট হবে, আমার শাশুড়ী অভিসম্পাত দেবেন। তা ছাড়া আমাদের জাত এক নয়।...

"কানের ভিতর দিয়ে গলানো সীসে মরমে প্রবেশ করল। আমার বাবা তার শ্বশুর নন, আমার মা তার শাশুড়ী নন, এঁদের প্রতি তার কর্তব্য নেই। জাত! আপনারা বাংলা নভেল পড়েছেন—মিস্টার সেনও। তাতে নায়ক নায়িকার জাত লেখা থাকে না, তবু বাঙালীর

সমাজে জাত প্রবলভাবে আছে। বাংলা খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে লেখে, 'জাতির অপমান,' 'জাতির সংকল্প' ; তবু জাতি বলে কিছুই নেই। আছে জাত। ধর্ম বদলাতে পারি, পেশা বদলাতে পারি, মিস্টার সেনের মতো দেশ বদলাতে পারি, কিন্তু জাত বদলানো যায় না।...

"ইংলণ্ডে পালিয়ে এলুম। লিখে কিছু পাই। বন্ধুরা চাঁদা করে কিছু পাঠায়। আর প্রেম নয়, পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে, কাজ। Man of action হতে হবে—Cliveএর মতো, Cecil Rhodesএর মতো, Henry Fordএর মতো, Leninএর মতো।...

"কিন্তু মানুষ প্ল্যান করে, আর বিধাতা বলে যদি কেউ বা কিছু থাকেন তিনি প্ল্যান ভাঙেন। অন্তত প্রেম সম্বন্ধে আমি destiny মানি গ্রাক্‌দের মতো। প্রেম আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস নয়। সে আমার কথা না শুনে পালায়, আমায় খবর না দিয়ে আসে। কিন্তু আজ কি আপনাদের সময় হবে, ভাই চক্রবর্তী ও সেন ? বারোটার আগে না উঠলে টিউব পাবেন না। ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরতে হবে।"

সুধী এতক্ষণ নির্বাক ছিল। হঠাৎ দে সরকারকে জিজ্ঞাসা করল, "পদ্মর খবর পান ?"

"মাঝে মাঝে। পদ্ম চিঠি লেখে, পদ্মদের বাড়ীর অনেকেই চিঠি লেখেন। আমি সর্বত্র জনপ্রিয়।"

"টেণ্টারটন ড্রাইভেও। কিন্তু আমাদের সুজেৎটিকে ভোলাবেন না, দোহাই আপনার।"

"পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিলে আগুন কী করবে ?"

"না, না। ওটি বড় নিরীহ, বড় সরল। ওকে একটু প্রশ্রয় দিলেই বিয়ের স্বপ্ন দেখবে, গৃহলক্ষ্মী হবার স্বপ্ন। যে স্বপ্ন ভাঙবেই সে স্বপ্ন জাগাবেন না।"

সুধী একটু থেমে বলল, "মেয়েদের পক্ষে ষোল সতের ও ছেলেদের পক্ষে উনিশ কুড়ি বড় বিপজ্জনক বয়স। ও-বয়সে মানুষ বিনা বিবেচনায় দেহ ও মন বিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। পদ্মর বয়স যদি তখন ষোল-সতের হত আপনি হাত পেতে আশার অতিরিক্ত পেতেন। জাত কুল শ্বশুর শাশুড়ী তাঁর মনেই উঠত না।"

দে সরকার বলল, "নিয়তি।"

জল পড়ছিল না, কিন্তু আকাশ ঘোলাটে হয়ে রয়েছিল। মেঘ ও কয়লার ধোঁয়া মিশে ঐ অপরূপ রং। রবিবারের রাত্রি—সিনেমা হতে লোকজন বাড়ী ফিরছে।

মাটির নীচে স্টেশন। টিকিট-উইণ্ডো পর্যন্ত গিয়ে দে সরকার টুপী তুলল।—"চীয়ারিও।"

সুধী বলল, "পুনর্দর্শনায় চ। মাঝে মাঝে লাঞ্চের সময় বিরক্ত করব।"

"ওঃ! নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি যদি বাড়ী না থাকি ল্যাণ্ডলেডীকে বললেই আমার ঘরে পৌঁছে দেবে। কাল আসবেন? বুড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। দেড়টার আগে আসবেন দয়া করে।"

বাদল চিন্তায় মগ্ন ছিল। কখন বিদায় নিয়ে কেমন করে ট্রেনে চড়ল তার নজর ছিল না। বাদল ভাবছিল, প্রিয়জনকে পাবার জন্যে মানুষ ধর্ম বদলাতে পারে, পেশা বদলাতে পারে, কিন্তু জাত বদলাতে পারে না। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে জন্মসূত্রে তোমার জাত নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, সে নির্দেশের উপর আপীল চলে না। Determinism! মানুষের এর চেয়ে অসহায়ত্ব আর কী হতে পারে। দে

সরকার বলে, নিয়তি! আমি হলে কী বলতুম? বলতুম, কাপুরুষতা।

৭

মিসেস উইলসের বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। নিঃসন্তান। চোখে কৌতুকের স্থির বিদ্যুৎ। শরীর দেখে মনে হয় না যে কিছুমাত্র বল আছে। কিন্তু একাকী সকল গৃহকর্ম করেন, দাসী রাখেননি। পোশাক পরিচ্ছদে সৌখীন। অবসর পেলেই নতুন জামা তৈরি করতে বসেন কিংবা পুরোনো জামাকে নতুন চেহারা দিতে।

বাদলের সঙ্গে **latch key** ছিল। সদর দরজা খুলে মিসেস উইলসের কাছে হাজিরা দিতে গেলে মিসেস উইলস বললেন, "এই যে বার্ট্। কখন এলে?"

"এইমাত্র আসছি, মিসেস উইলস।"

"তারপরে? উইকেণ্ড সুখে কাটল?"

"মন্দ না। ধন্যবাদ। কেবল ঘুমটা—"

"জানি। ভালো হয়নি। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কেমন হল?"—মুচকি হেসে বললেন, "ঐ তো তোমার প্রাণ।"

বাদল উৎসাহ পেয়ে বলল, "শুনবেন, মিসেস উইলস? কাল থেকে ভাবছি কোন উপায়ে ইণ্ডিয়ার থেকে কাস্ট্ উৎপাটন করা যায়। ভেবে দেখলুম ও হচ্ছে সেই শ্রেণীর গাছ যার শিকড়ে কুড়ুল মারলে কুড়ুল ভেঙে যায়। ক্যালিফর্নিয়ার সেই বিরাট বনস্পতি আর কী।"

মিসেস উইলস চোখে হেসে বললেন, "হাল ছেড়ে দিলে?"

"মোটেই না। গাছের গোড়ায় উই পোকার চাষ করব। ভিতর থেকে মাটি আল্‌গা হয়ে গেলে বনস্পতি চিৎপাত। শুনুনই না

উপায়টা।”—বাদল আর গোপন করতে পারছিল না। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলবার মতো ধৈর্য ছিল না তার। এক একজন ছাত্র থাকে মাস্টার মহাশয় ক্লাসের অন্য কোন ছাত্রকে প্রশ্ন করলে অনাহূতভাবে দাঁড়িয়ে বলে, “আমি বলব, মাস্টারমশাই?” অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রশ্নের উত্তরটি বলে দেয়।

বাদল সোল্লাসে বলল, “Electrification!”—উত্তরটা ঠিক হল কি না জানবার জন্যে কান পেতে রইল।

মিসেস উইলস তাঁর সেলাই থেকে মুখ না তুলে বললেন, “Electrical engineering পড়তে যাচ্ছ নাকি?”

“ঠাট্টা করছেন? কিন্তু সবটা শুনুন আগে। ইণ্ডিয়াতে যথেষ্ট কয়লা নেই বলে যথেষ্ট রেলওয়ে নেই, যথেষ্ট ফ্যাক্টরী নেই। ইংলণ্ড কিংবা জার্মানীর মতো তাড়াতাড়ি ইণ্ড্রাস্ট্রিয়ালইজড্ হতে পারছে না। শুধু কয়লার অভাবে একটা দেশ জগতে পারিয়া হয়ে রয়েছে। অথচ জল থেকে তড়িৎ সংগ্রহ করবার সুযোগ ও-দেশে অপরিশেষ।”

“তা হলে ও-দেশে আর অন্ধকার থাকল না দেখছি!”

“কী করে থাকবে? গ্রামে গ্রামে ফ্যাক্টরী। এখন মাত্র ৩৭ হাজার মাইল রেল লাইন। ভবিষ্যতে ৩৭ লক্ষ মাইল। যে পারিপার্শ্বিক জাতি-প্রথাকে লালন করেছিল সে মরে যাবে, কাজেই জাতিপ্রথাও।”

এইবার একটু গম্ভীর হয়ে মিসেস উইলস বললেন, “মা মরে গেলেও ছেলে বেঁচে থাকে, বার্ট্। এখনো এদেশে শ্রেণীপ্রথা আছে।”

বাদল বলে ডাকতে অস্বস্তি বোধ হয় বলে বাদলকে এঁরা বার্ট্ বলে ডাকতেন। এই ইংরেজী নামকরণ বাদলের সম্পূর্ণ মনঃপুত হয়েছিল। ‘সেন’-টাকে কোনমতে ‘স্মিথ’ করা যায় না বলে তার আক্ষেপ ছিল।

এক একটা আইডিয়া বাদলকে নেশা পাইয়ে দেয়। লোকে পাগল

বলে ক্ষেপাবে, নতুবা সে ট্রেনে আসবার সময় উপনিষদের মতো ঘোষণা করতে করতে আসত, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ…! মগজের চায়ের কেটলিতে আইডিয়ার বাষ্প গর্জন করছে, সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে ভব্যতার ঢাকনা দিয়ে কতক্ষণ সায়েস্তা রাখা যায়? স্টেশন হতে বাস্, বাস্ হতে বাসা—বাদল অতি কষ্টে পা দুটোকে সংযত করে মিসেস উইলসের work-roomএ পৌছল।

এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই তার অবাধ প্রবেশাধিকার। বাদলের বয়সের তুলনায় তাকে ছোট দেখায়, তার মুখে বড় বড় কথা শুনতে এই নিঃসন্তান দম্পতির কৌতুক বোধ হয়। সে চোখ বুজে ঠিক সময়ে বিল মেটায়, অনুরোধ করবামাত্র কৃতার্থ হয়ে ফরমাস খাটে, মিসেস উইলসের সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে বাজার বয়ে আনে, মিসেস উইলসের ছুঁচে সূতো পরিয়ে দেয়। এমন মানুষকে ঘরের মানুষের অধিকার দিতে বিলম্ব হয় না।

আরো আশ্চর্যের কথা, বাদল মিসেস উইলসের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে তাঁর চিঠিপত্র লিখে দিত—সেই বাদল, যে নিজের পিতাকে ও নিজের স্ত্রীকে চিঠি লেখার সময় করে উঠতে পারত না। মিসেস উইলসের ফোন ধরতে ধরতে কত লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেছে। চিঠি লিখতে লিখতেও। একজন হবু ইংরেজের পক্ষে এ কি সামান্য লাভ?

বাদল দিবা-স্বপ্ন দেখত। দশ বৎসর কেটে গেছে, বাদল প্রাক্‌টিস জমিয়ে তুলছে, এতদিন অমুক K. C'র জুনিয়ার ছিল, এবার স্বতন্ত্র হয়েছে। এখন Temple অঞ্চলে তার আফিস, পিকাডিলী কিংবা সেণ্টজেমস অঞ্চলে তার ক্লাব—সেইখানে সে সোমবার থেকে শনিবার অবধি বাস করে। তার বাসার ঠিকানা জানতে চাও তো Who's

Who খুলে দেখ। ক্লাবের নাম পাবে। রবিবারটা সে Countryতে কাটায়, Dorsetshireএ তার কুটির আছে—"far from the madding crowd." সেখানে সে আইন আদালত ভুলে বই লেখে, গল্‌ফ খেলে। ততদিনে Moth Aeroplane সস্তা হয়েছে—বাদল তার নিজের এরোপ্লেনে চড়ে গ্রামে যায় ও শহরে আসে।

বিরহিণী

১

বাদলকে বিদায় দিয়ে এসে উজ্জয়িনী চিন্তা করবার সময় পেল প্রথম।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলো যেন আপনা থেকে ঘটে যায় মানুষকে সাক্ষী করে। পরম মুহূর্তগুলির উপর মানুষের কর্তৃত্ব যেন কথার কথা। কোথায় ছিল উজ্জয়িনী, কোথায় ছিল বাদল। কেমন করে একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সে কি সহজ কথা! একটি দিনে জীবনের এত বড় পরিবর্তন কি আর আছে! বাইরের লোক ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাজি পুড়িয়ে ভালোমন্দ খেয়ে ও খাইয়ে অন্তরের এই গভীর সত্যটাকে রূপক আকারে ব্যক্ত করতে চায়।

তবু উজ্জয়িনীর কেমন যেন মনে হতে লাগল বিয়ে তার হল না। অতলস্পর্শী পরিবর্তনের ভাব তার অন্তরে কই? সে তো সেই উজ্জয়িনীই আছে, মোটের উপর। উৎসবের ক্রটি হয়নি, রাশি রাশি উপহার এসেছে, শাড়ি ও বই এত এসেছে যে পরে ও পড়ে শেষ করতে দুটি বছর লাগবে। গহনা যা এসেছে তা নিয়ে গহনার দোকান খোলা যায়।

যে মুহূর্তে সে তার স্বামীকে দেখল প্রথম, সে মুহূর্ত তার স্মৃতির আকাশে ঊষারাগের মতো কখন মিলিয়ে গেছে, কেননা তারপরে ফুটেছে দিনের পর দিন বাদলের সঙ্গে পরিচয়ের দিবাদীপ্তি। উজ্জয়িনী স্বভাবত গম্ভীর, বাদল স্বভাবত লাজুক অথচ বাচাল। বাদলকে একবার যদি কোনো উপায়ে কথা কওয়ানো যায় তবে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ

করে একটানা ও একতরফা বাক্যালাপ চলায়। কেবল ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড। কতদিনে সেখানে পৌছবে, আধুনিক যুগের কোন কোন চিন্তানায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কোন অঞ্চলে চাষাদের ফার্মে থাকবে, কোন কোন ফ্যাক্টরীতে শখের য়্যাপ্রেন্টিস হবে, পায়ে হেঁটে ল্যাণ্ডস এণ্ড থেকে জন্‌-ও-গ্রোট্‌স যাবে—এমনি হাজারো জল্পনা। বাদলের উচ্চাভিলাষ যেমন সংখ্যাতীত তেমনি তুলনাতীত। একদিন বলছিল, "গায়ে যদি আর একটু জোর থাকত তা হলে ইংলিশ চ্যানেলটা পার হবার জন্যে জাহাজের সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করতুম।" উজ্জয়িনী যখন চেপে ধরল, তখন বাদল চট্‌ করে উত্তর করল, "সাঁতার কেটে পার হব এমন কথা আমি বলিনি। খুব সম্ভব এরোপ্লেন চালিয়ে পার হতুম।"

বাদলের সঙ্গে এক ঘরে ও এক বিছানায় রাত কাটাতে উজ্জয়িনীর ভারি আশ্চর্য লেগেছিল। আশ্চর্যের ভাব পুরাতন হবার আগেই বাদল দেশ ছাড়ল। বাদলের দেশ ছাড়াতে উজ্জয়িনীর যে স্বাভাবিক বিষাদ, সেই বিষাদের দ্বারা চাপা পড়লেও মাঝে মাঝে আশ্চর্যের ভাব উজ্জয়িনীকে অভিভূত করে। সে নিজেকে বারম্বার প্রশ্ন করে, "সত্যি? সত্যি? সত্যি? সত্যি? সত্যি?..."

একটুখানি সান্নিধ্য। তবু কী অপরূপ আবেশ এনে দেয়। দিদিদের সঙ্গে এক বিছানায় কতবার শুয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত বোধ হয়নি। তার কারণ বুঝি এই যে, বাদল অপরিচিত আর দিদিরা চিরপরিচিত? কিংবা এই যে, বাদল তার স্বামী?

স্বামী কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতে উজ্জয়িনী সরমে শিহরিত হয়। বন্ধু পাবে, সেই আশায় সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ের পরে বন্ধুর কথা গেল ভুলে। মনে রইল যার কথা সে তার স্বামী।

উজ্জয়িনীর মনে হ'ল এই ক'দিনে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেল। যেন তাকে আর বোকা মেয়ে বলা চলে না, খুকী নাম বেমানান হয়। তার স্বামীর সান্নিধ্য তাকে কোন মন্ত্রশক্তির দ্বারা বিজ্ঞ করে দিয়ে গেছে। এখন সে অনেক কিছুর অর্থ বোঝে। এই অতি-পরিচিত অতি-অবজ্ঞাত পৃথিবী যেন এই প্রথম তার চোখে পড়ছে। রাত্রের আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয়, কী একটা ভাষায় কী যেন লেখা রয়েছে, নেহাৎ হিজিবিজি নয়। তারাগুলো এক একটা হরফ।

কিন্তু কোনো এক বিষয়ে মন বসে না। তারার কথায় মনে পড়ে বাদলও জাহাজে বসে এই তারাই দেখছে। কিন্তু বাদল কি উজ্জয়িনীর কথা ভুলেও ভাবছে? তার লক্ষ্যের দিকে সে যত দ্রুত গতিতে ছুটেছে উজ্জয়িনীকে পিছনে রাখতে রাখতে যাচ্ছে তত বেশী। বাদলের জীবনে কি বিয়ে ব্যাপারটা কিছুমাত্র দাগ কেটেছে? উজ্জয়িনী যেমন তাকে স্বামী বলতে রোমাঞ্চিত হয় সেও কি উজ্জয়িনীকে স্ত্রী বলতে পুলক পায়? প্রেম শব্দটা উজ্জয়িনী বইতে পড়েছে, তার যে কী অর্থ কেমন প্রকৃতি সে কথা উজ্জয়িনীর বোধগম্য হত না, এখন যেন কতকটা হয়—অন্তত তার একটা লক্ষণ হচ্ছে সঙ্গকামনা। বাদলের প্রাণে অমন কামনা কখনো জাগে না কি? নিশ্চয়ই জাগে না, জাগলে কি বাদল সারাক্ষণ ইংলণ্ডের ধ্যান করত?

বাদল যে উজ্জয়িনীকে স্ত্রী ভাবে না, ওকথা সে প্রকারান্তরে জানিয়ে গেছে বইয়ের গায়ে উজ্জয়িনী গুপ্তের নামাঙ্কন করে। কোনো দিন মিস গুপ্ত ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকেনি। একদিন তো বাদল খোলাখুলি বলেওছিল, "বিয়ে না করলে বিলেত যেতে পাব না বলেই বিয়ে করছি। আর বিলেত না যেতে পেলে আমার জিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। এতদিন যে এদেশে আছি এই এক ট্র্যাজেডী।"

অন্য কোনো মেয়ে হলে অভিমান করত অথবা অপমানে কেঁদে ফেলত, কিন্তু উজ্জয়িনীর বাদলের প্রতি অনুকম্পাই হল। আহা, বেচারা বিয়ে না করে করেই বা কি! এত বড় প্রতিভাশালী যুবকের প্রতিভা যে বিলেত না গেলে খুলবে না। রবি ঠাকুর, জগদীশ বসু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু—ভারতবর্ষের প্রত্যেক মহাপুরুষের যৌবন বিলেতের বাতাস লেগে মঞ্জরিত হয়েছে।

বিয়েটা যেন উজ্জয়িনী একা করল, বাদল নামমাত্র বর হল। উজ্জয়িনীর সিঁথেয় সিঁদুর উঠল ও হাতে নোয়া। তবু অন্তরে সে কুমারীই থেকে গেল। কেবল অন্তরে কেন, দেহেও।

২

বাদল চিঠি লিখবে মাঝে মাঝে, এমন প্রত্যাশা উজ্জয়িনীর ছিল। তাদের সম্বন্ধটা দাম্পত্যের না হোক, বন্ধুত্বের না হোক, ভদ্রতার তো বটে।

উজ্জয়িনী বম্বে থেকে চিঠি না পেয়ে বিচলিত হল না। মনকে বোঝাল, সময়ের অভাব। বিদেশ যাত্রার উত্তেজনা। ট্রেন থেকে নেমে জাহাজ ধরা তো হেলে দুলে কোঁচা সামলে ধীরে সুস্থে হবার নয়। বাদলের সঙ্গে উজ্জয়িনীরও বম্বে অবধি যাওয়া উচিত ছিল, অন্তত উজ্জয়িনীর বাবার কিংবা শ্বশুরের। তাঁরা যে যেতে চাননি তা নয়, বাদলই তাঁদেরকে নিরস্ত করেছে, বলেছে ইংরেজের ছেলেরা যখন ঐ বয়সে সিবিলিয়ানী করতে কিংবা ওর থেকে কম বয়সে ব্যবসা করতে ভারতবর্ষে আসে তখন ওদেরকে এগিয়ে দেবার জন্যে কেউ মার্সেলস অবধি আসে না। কলকাতা থেকে বম্বে এক দৌড়ের মামলা, সঙ্গে একটা চাকর যাচ্ছে সেই যথেষ্ট বাড়াবাড়ি, অন্য কেউ যদি যান তবে বাদলের পৌরুষ লজ্জা পায়।

বাদল বম্বে পৌঁছে দুই গুরুজনকে দুখানা টেলিগ্রাম করল, কিন্তু উজ্জয়িনীকে না। অভিমান করা উজ্জয়িনীর স্বভাবের অঙ্গ নয়। উজ্জয়িনী হাসতেও জানে না, কাঁদতেও জানে না, মনের দুঃখ নীরবে পরিপাক করে। তার মুখ দেখে বোঝা যায় না সে কী ভাবছে, কিসে ভুগছে। সেইজন্যে তো তার সমবয়সিনীরা তাকে সন্দেহ করে। তারা সাধারণ মানুষ—হাসে, হাসায়, কাঁদে, কাঁদায়, গল্প করে, দুষ্টুমি করে, ঝগড়া যেমন করেও তেমনি ভোলেও। উজ্জয়িনীর মনের নাগাল পায় না বলে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, উজ্জয়িনীটা কেবল যে বোকা তাই নয়, তার পেটে পেটে অনেক বিদ্যে।

উজ্জয়িনীর মনের গড়ন জানতেন একমাত্র তার বাবা। তাঁরই কাছে উজ্জয়িনীর গভীরতম ভাবনা-বেদনা-আবেগ-অভিলাষ স্টেথোস্কোপের মুখে বুকের স্পন্দনের মতো ধরা পড়ে যেত। উজ্জয়িনীর মনের য়্যানাটমি তাঁরই একার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে উজ্জয়িনীর মনের আড়ালে যে-সব কামনা ও যে-সব খেদ জমতে লাগল সে সকলের ডায়গ্নসিস যোগানন্দের সাধ্যাতীত। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই হাতুড়ে।

তা ছাড়া উজ্জয়িনীও তাঁর কাছে তেমন প্রাণ খুলে কথা কয় না, লজ্জা বোধ করে। অথচ লজ্জা না ঢাকা দিয়েও পারে না, সে যে আরো লজ্জার কথা। বাবার কাছে তার কিছুই গোপন ছিল না, এখন থেকে একটি বিষয়ে মিথ্যাচরণ হল। বাদল সম্বন্ধে তার উৎকণ্ঠা নেই অনুমান করে যোগানন্দ ভাবলেন, আহা, নেহাৎ ছেলেমানুষ। স্বামী কী জিনিস বোঝে না বলেই কাঁদে না।

বলেন, "বাদল বোধ হয় এতদিনে এডেন পৌঁছে গেছে রে, বেবী।"

উজ্জয়িনী অসংকোচে বলে, "সে কী করে সম্ভব? এই তো সেদিন গেলেন।"

যোগানন্দ ভাবেন, তাই তো। আমাদের বয়সে আমরা একটা দিনকে একটা যুগ মনে করতুম। শনিবার চিঠি আসার বার, বৃহস্পতিবার থেকে পোস্টম্যানের পায়ের শব্দ শুনতুম। রবিবারটা ছিল আমাদের সত্যিকারের Sabbath ; সেদিন মেঘদূত ছাড়া অন্য পিছু পড়তুম না, খবরের কাগজ পর্যন্ত না। বিলেত যখন যাই তখন তো কতবার কত ছলে cable করতুম ও করাতুম। হায় রে! কত দুঃখই না পেয়েছি !

যোগানন্দের স্মৃতি বিশ বছর পেছিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর স্মৃতি গেল মাত্র সাতদিন পেছিয়ে। আজ বৃহস্পতিবার। গত বৃহস্পতিবার বাদল ছিল। এখন যে সে কত দূরে, দশ হাজার মাইল দূরে কি দশ মাইল দূরে—তার হিসাব হয় না।

কাছে থাকা ও কাছে না থাকা, এই দুয়ের মাঝখানে যে ব্যবধান সে ব্যবধান এতই অসীম যে পরিমাপের দ্বারা তাকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রমাণ করলে তজ্জনিত দুঃখ কমেও না বাড়েও না।

উজ্জয়িনী দেয়ালের দিকে চেয়ে টিকটিকির শিকারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করছে, না ক্যালেণ্ডারের প্রতি চোরা চাউনি ক্ষেপণ করছে যোগানন্দ টের পাচ্ছেন না। তিনি ভাবছেন অল্প বয়সে বিয়ে করা দেহের পক্ষে অহিতকর হলেও মনের পক্ষে তপস্যার কাজ করে। সেইজন্যে বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিরহের ব্যবস্থা দিতে হয়। আমাদের সমাজে এই ব্যবস্থাই এক কালে প্রচলিত ছিল, তখন এক বাড়ীতে থেকেও স্ত্রী-পুরুষের কতখানি দূরত্ব ছিল আজকালকার স্বামী-স্ত্রীরা শুনলে বিশ্বাস করবে না। সেই দূরত্বকে যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হত তবে তো বাল্যবিবাহনিরোধের প্রয়োজন থাকত না।

৩

বিয়ের পূর্বাহ্ণ থেকে উজ্জয়িনীর জানা ছিল যে, বাদল বিদেশ-যাত্রী, উজ্জয়িনী তার যাত্রাপথের একটা মাইলস্টোন মাত্র। সহযাত্রিণী নয়, অতিক্রমণীয়া। সেইজন্যে বিদায়কে সে যথাসম্ভব সহজ করে এনেছিল।

তবু তার বিশ্বাস ছিল না যে, বাদলকে বিদায় দিয়ে সে বিবাহপূর্বের যুগে ফিরে যেতে পারবে। কলকাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে যাওয়া তো বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। উজ্জয়িনী দশ দিনে দশ বছর বেড়েছে, স্মৃতির থেকে মুছে গেলেও এই দশটি দিন বনাম বছর মনের অন্তরালে অক্ষয়।

বাদল চলে যাবার পর উজ্জয়িনী নিজের অনুভূতির খবর নিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে মূর্ছাও যায়নি, মরেও যায়নি, প্রিয়বিরহকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। তার জীবনে বাদলের থাকাটার স্থান পূরণ করেছে বাদলের না থাকাটা। সে এক হিসাবে ফিরেই গেছে বইয়ের রাজ্যে, তারার দেশে, পশুপাখীর সংসারে।

থেকে থেকে যখনি বাদলের সান্নিধ্যের স্মৃতি জাগে তখনি উজ্জয়িনী উতলা হয়। তারপরে যথাপূর্বং। শুধু চিঠির বার এলে মিথ্যা আশায় ভোরের আগে ওঠে। ছল ছল চোখে সপ্তর্ষির দিকে চেয়ে থাকে। হয়তো চিঠি আসবে না। পুনরায় আশাভঙ্গ। দিনের আলোয় সকলের সামনে যে কান্না কাঁদতে পারবে না শেষরাত্রের আকাশতলে বসে সেই কান্না সাঙ্গ করে রাখে।

কত সপ্তাহ কেটে গেল, চিঠি এল না। যোগানন্দের নামে cable এল দুই তিনবার, কিন্তু উজ্জয়িনীর নামে কিছুই না। কেবল শ্বশুরের চিঠিতে এল বাদল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। মহিম লিখলেন, "মা গো, বাদলের সবিশেষ জানিয়ে আমাকে সুখী কোরো। তারের খবরে প্রাণ ভরে না।"

যোগানন্দও বিস্মিত হন। বাদল কি তাঁর কন্যাকে ভালোবাসে না? ভালোবাসলে তো এত মোটা চিঠি লিখ্‌ত যে চিঠিখানা নির্ঘাত বেয়ারিং হত। এবং বেয়ারিং চিঠি কখনো পথে হারায় না।

যোগানন্দ বাদলকে চিঠি লিখলেন ভালোবাসা জানিয়ে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার ছল খুঁজলেন, কিন্তু উজ্জয়িনী তাঁকে সে অবসর দিল না। বলল, "তোমার এত উৎকণ্ঠা কেন বল তো বাবা? ভালো আছেন সে খবর তো পেলে। মামুলি চিঠি তাঁর কাছে তোমার আশা করাই অন্যায়। যখন প্রেরণা পাবেন তখন তিনি চিঠি লিখবেন দেখো।"

বাদলের প্রেরণার অপেক্ষায় যোগানন্দ অধৈর্য হয়ে উঠলেন, মহিম প্রমাদ গণলেন, পরস্পরের মধ্যে যে পত্রবিনিময় চলল তার ধুয়া এই যে, ছেলেটা হয়তো বকেই গেল। এমন সময় তাঁরা পেলেন সুধীর চিঠি। আশ্বস্ত হলেন। যোগানন্দ ভাবলেন, হাঁ, সাইলেণ্ট ওয়ার্কার বটে, চিঠিপত্র লিখে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করতে চায় না। মহিম ভাবলেন, কার ছেলে সেটা মনে রাখতে হবে তো। বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু কর্তব্য অবহেলা করে বৌকে প্রেমপত্র লেখে না।

সুধীর লেখার মধ্যে সুধীর পরিচয় পেয়ে যোগানন্দের তাকে সহজেই মনে ধরল। মহিম তো সুধীর কতকালের কাকামশাই—সুধী তাঁর ছেলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কাজেই তাঁর কাছে ছেলের দোসর। সুধী যে পরামর্শ দেয় তাই সুপরামর্শ, সুধী যে কথা বলে তাই সত্য কথা।

যোগানন্দ ও মহিম বাদলের চিঠি সুধীকেই লিখলেন, সুধীর চিঠিতে বাদলের চিঠির স্বাদ মেটালেন। বাকী থাকল উজ্জয়িনী। বাদল যে সুধীকে দিয়ে তাকেও চিঠি লেখাবে এমন কথা তার মনে উঠল না। বাদল যদি তাকে ভুলেই গিয়ে থাকে তবু সে বাদলকে দোষ দেবে না,

বাদলের যদি কোনো দিন তাকে মনে পড়ে সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করবে, তার প্রতি বাদলের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

হঠাৎ একদিন উজ্জয়িনীর নামে চিঠি এল। বাদলের হাতের লেখা উজ্জয়িনী চিনত। বাদলের হাতের লেখা নয়। সুধীর হাতের লেখাও উজ্জয়িনী দেখেছে। সুধীরই হাতের লেখা বটে।

উজ্জয়িনী চিঠিখানি খুলবে কি না চিন্তা করল। সে তো বাদল সংক্রান্ত সংবাদের প্রার্থী নয়। তবে কেন সুধীর চিঠি খুলবে? সুধীর সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই। কোন অধিকারেই বা সুধীর চিঠিকে স্বীকার করে নেবে?

কিন্তু জীবনে প্রতিদিন নতুন মানুষের আগমনী বাজে না। সুধীর হাতের লেখাই তো সুধীর পরিচয়-পত্র। গোটা গোটা অক্ষর, একটু ডান দিকে টান, কোনোটাতে কালির পরিমাণ বেশী-কম হয়নি, সমস্তটিতে আত্মসমাহিত প্রসন্ন অন্তঃকরণের ছাপ। উজ্জয়িনী এমনি হস্তাক্ষর আরো দেখবে এই আকাঙ্ক্ষায় চিঠিখানি অবশেষে খুলল।

৪

উজ্জয়িনী যদি স্বভাবত অভিমানিনী হত, তবে বাদলের উপর রাগ করে সুধীর চিঠি ছিঁড়ে ফেলত, ছুঁড়ে ফেলত, মন থেকে ঝেড়ে ফেলত। পৃথিবীর অন্য সবাইকে সেক্রেটারী দিয়ে চিঠি লেখান যায়, কিন্তু—মরি মরি কী রুচি!—স্ত্রীকেও!

কিন্তু উজ্জয়িনীর মান-অপমান-বোধ তেমন তীব্র ছিল না। বাদলের উপর তার কিসেরই বা অধিকার! বিয়েটা বাদলের পক্ষে বিলেত যাওয়ার সামাজিক পাসপোর্ট; না হলে চলে না বলেই সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিলেতে নিরাপদে পৌছবার পর বাদল কি তার

পাসপোর্টখানা কোন বাক্সে তুলে রেখেছে তা মনে করে রেখেছে? বিশেষত বাদলের যে ভোলা মন! অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে বাদলের এ দিকটা উজ্জয়িনীকে মাঝে মাঝে হাসিয়েছে—অবশ্য মনে মনে হাসিয়েছে। একথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার আর একবার হাসি পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে কত কথা মনে পড়ে গেল।

যতই মনে পড়ে যায় ততই কান্না পায়। বাদলকে সে ভালোবেসেছিল। অন্তত বাদলকে তার ভালো লেগেছিল। ('ভালো বেসেছিল'—একথা মনে মনে স্বীকার করতেও তার কী লজ্জা!) বাদল যখন তার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব লোকে অবতরণ করেছিল, তখনকার সেই দিনগুলি কত ছোট ছোট ঘটনা, কথোপকথন ও ভদ্র ব্যবহার দিয়ে এক একটি বছরের মতো সুদীর্ঘ ও সুপূর্ণ বোধ হয়েছিল। বাদল হয়তো পাথর, কিন্তু উজ্জয়িনী কুমারী মেয়ে। বাদলের সান্নিধ্য তাকে কখনো ভাবাবেশময়ী, কখনো সচকিতা, কখনো স্নেহমমতায় পরিপূর্ণা করে তুলত। সমস্তই বাদলের অজ্ঞাতসারে। বাদলের পক্ষে যা মামুলী কথা উজ্জয়িনীর কানে তাই কেমন সুধাবর্ষণ করত। উজ্জয়িনী মনে মনে সেই সকল এলোমেলো কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত, বিস্মৃতির মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যেতে দিত না।

কিন্তু বাদল যেদিন চলে গেল সেদিন থেকে উজ্জয়িনীকে বিরহ-বেদনায় উদাস করল। বাদলের সঙ্গে তার সেই মধুর অতীত তার যতবার মনে পড়ে যায়, ততই মন টন টন করে—তাজা ক্ষতের উপর আঙুল লাগলে যেমন করে। প্রকৃতিগত আত্মরক্ষণেচ্ছা উজ্জয়িনীকে শেখাল বিস্মরণের কৌশল। উজ্জয়িনী অতীতকে চাপা দিতে লাগল ভবিষ্যতের দোতলা তেতলা চারতলার তলায়। বাদল

কাল এডেনে পৌঁছবে, পৌঁছেই চিঠিখানা ডাকে দেবে, চিঠিখানা চলে আসবে সেই দিনের বোম্বাই-মুখী জাহাজে। তা হলে একদিন দুদিন তিনদিন চারদিন···সাতদিনের দিন চিঠিখানা উজ্জয়িনীর হাতে এসে পড়বে। আগ্রহাতিশয্যে উজ্জয়িনী দিনগণনায় গোঁজমিল দেয়। শনিবারের পর সোমবার, বুধবারের পর শুক্রবার, এই তার গণনার রীতি।

বার বার আশাভঙ্গের পর সে আশা করতে ছাড়ল না বটে, কিন্তু নিরাশার সঙ্গে আপোস করে নিতে শিখল। বাদলের চিঠি আসে তো ভালোই, না আসে তো মন্দ কী! এমন তো একদিন ছিল যখন বাদল তার জীবনে ছিল না। এখন বাদল তার জীবন থেকে চলে গেছে ভাবতে তার প্রাণে সয় না বটে, কিন্তু চলে যাবার অধিকার যে বাদলের আছে সে তো অস্বীকার করা যায় না।

বাদল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহূর্তে আছে এবং বেশ সুস্থই আছে। সুধীর চিঠি থেকে এটুকু জানতে পাওয়া তার যথালাভ। এইজন্যে চিঠিখানা খুলে সে অন্যায় করেনি। নইলে পরপুরুষের চিঠি খুলতে তার সংস্কারে পীড়া লাগত। হোক না কেন বাদলের অদ্বিতীয় বন্ধু।

সুধীকে সে মনে মনে সাধুবাদ দিল। কিন্তু উত্তর দেবে কি না স্থির করতে তার বহু দিন ও বহু রাত্রি, বহু চিন্তা ও বহু অনিদ্রা লাগল। বাদলকে সে একরকম চেনে বলে চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রবাবু না জানি কত বড় বিদ্বান ও কত বেশী বয়স্ক। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্ভ্রম দেখানো কি সহজ কথা! উজ্জয়িনীর চিঠিগুলি যে তিনি পড়েছেন এই ভাবতে উজ্জয়িনী ঘেমে ওঠে। পড়ে নিশ্চয়ই দুষ্ট হাসি হেসেছেন, ভেবেছেন কী ছেলে-

মানুষ! কী নির্বোধ! তাঁর অপরাধ কী! উজ্জয়িনী নিজেও তো তার একমাস আগের আমি'র সঙ্গে আজকের আমি'র তুলনা করতে কুণ্ঠিত হয়। এই ছু'এক মাসে সে কি কম বদলেছে, কম বেড়েছে! চেহারায় তার তেমন পরিবর্তন হয়নি; তবে সিঁথিতে সিঁদুর ওঠা মেয়েদের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। তাতে কেবল কপালকে রাঙায় না, কপোলকেও রাঙায়। মুখাবয়বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি অনির্দেশ্য শ্রী গড়িয়ে পড়তে থাকে, পারদের মতো চঞ্চল। এই চোখে তো এইমাত্র চিবুকে, এইমাত্র ভুরূতে তো এইমাত্র অধরে।

সুধীর প্রথম পত্রের উত্তর দেবার আগে তার দ্বিতীয় পত্র এসে পড়ল। তাই নিয়ে উজ্জয়িনী হল আরো বিব্রত। বাদল যেন পণ করেছে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখবে না। না লেখে নাই লিখুক, কিন্তু সুধীকে দিয়ে লেখানোর আবশ্যকটা কী ছিল! উজ্জয়িনী চেয়েছিল চিঠির ভিতর দিয়ে বাদলের সঙ্গ। বড় বড় সমস্যার মীমাংসা তো চায়নি, যদি বা চেয়ে থাকে তবে সে চাওয়াটা কেবল বাদলকে চিঠি লেখার একটা অবলম্বন জোগাতে; পাছে বিষয়ের অভাবে বাদল চিঠি লিখতে গা না করে। বড় বড় সমস্যার সমাধান তো এল, কিন্তু কই তার মধ্যে বাদলের গলার স্বর, বলার ভঙ্গী, ডান হাতের মধ্যম আঙুলটি দিয়ে মাথার চুলগুলোকে টেনে চোখের উপর নামানো ইত্যাদি মুদ্রাদোষ? সুধীর পাকা হাতের পরিষ্কার লেখা, শান্ত সমাহিত মনের পরশ, বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর প্রতি প্রচ্ছন্ন গভীর স্নেহ উজ্জয়িনীর স্মৃতিকে সক্রিয় করল না। কে যে সুধী আর কী যে তার বক্তব্য—যেন চিঠি পড়ছে না, একখানা ভালো লেখকের লেখা বই পড়ছে ও বোঝবার চেষ্টা করছে। যেন এ চিঠি লাইব্রেরীতে বসে বাবার সাহায্যে পড়বার, শোবার ঘরে খিল দিয়ে বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দকে বালিশের উপর পিষতে পিষতে কখনো হাসতে

হাসতে ও কখনো চোখের জলে ভাসতে ভাসতে পড়বার নয়। এ চিঠির ক দেখে কৃষ্ণকে মনে পড়ে না, হৃদয়াবেগকে নাড়া দিয়ে মন-কেমন করায় না এ চিঠি।

তবু কর্তব্যের খাতিরে এর জবাব লিখতে হবে। না লিখলে যেটুকু বাদলের খবর পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুও পাওয়া যাবে না।

উজ্জয়িনী সুধীকে চিঠি লিখতে বসল।

লিখল :—

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার দুখানি পত্রই পেয়েছি। আপনার মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে আমার এ বহুমূল্য প্রাপ্তি। এই সৌভাগ্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি কি?

আপনার বন্ধু কেমন আছেন? অবশ্য সেকথা আপনি প্রতি সপ্তাহে বাবাকে লিখছেন। সেই একই কথা প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকেও লিখুন এমন অনুরোধ করলে ছেলেমানুষী হবে। একে তো আমার ছেলেমানুষী আপনাকে নিশ্চয়ই কৌতুক দিয়েছে। আমার সম্বন্ধে আপনি কী যে ভেবেছেন, ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। ছি ছি! ডাক-টিকিট সংগ্রহ করার কথা কেন যে লিখেছিলুম! সত্যি আমার ওসব 'হবি' আজকাল নেই।

পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা কত কথাই না শুনি। কোনোটাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার জানাশুনার মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা এত বেশী আমাদের মতো যে তাঁরা কী পরেন ও কী খান সেই প্রমাণের উপর তাঁদের উপর সরাসরি রায় দেওয়া যায় না। বিচার করবই বা কেন? পারি তো ভালোবাসব। না পারি তো ছায়া মাড়াব না। আমার বাবারও এই মত। মিস্টার সেন কী বলেন জানতে

ইচ্ছা করে। একটা মজার কথা দেখুন, জানি বলেই জানতে ইচ্ছা করে। মিস্টার সেন গোঁড়া ইংরেজ বলে জানি। তাই জানতে ইচ্ছা করে তিনি কি তাঁর স্বজাতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-বশত আমাদের মতো বিজাতীয়দের প্রতি বিমুখ? তাঁর বান্ধবীদেরকে আমার প্রণাম জানাবেন কি?

আচ্ছা, বিলেত গিয়ে আপনারা ফোটো তোলেননি? আমার ফোটো দেখবার মতো হলে নিশ্চয়ই পাঠাতুম। কিন্তু আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করুন না? আমি নিতান্তই কালা আদমী। এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে ইস্কুলের সিক্‌স্থ্‌ ক্লাস। আমার বাবার পাঠাগারে আমার বয়সের মেয়ের পড়বার মতো বই অল্প কিছু আছে, তাই পড়েছি। কিন্তু সেই যৌতুক নিয়ে কি আপনার বন্ধুর যোগ্য হওয়া যায়?

আচ্ছা, আপনি কী করেন? কী পড়েন? আপনি মাসিক পত্রে লেখেন না কেন? লিখলে আপনার মূল্যবান চিন্তা দেশের কত পিপাসুর পিপাসা মেটায়। না, আপনার বন্ধুর মতো আপনিও এদেশের নন? যে কেউ বড় হলেন তিনিই যদি বিদেশী হলেন তবে এ দুর্ভাগা দেশ কাকে নিয়ে বড় হবে? সত্যি বলছি, ইংরেজের প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই, তবু ইংরেজ আমি কিছুতেই হব না। আমার দেশের মহান্ অতীত ও মহত্তর ভবিষ্যৎ তার বর্তমানকালের গ্লানি ও লজ্জার থেকে বড়। সেই বড়ত্বের লোভে আমি ভারতীয়া। আমার বাবাও এই কথা বলেন।

আমার প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি।

বিনীতা

শ্রীউজ্জয়িনী দেবী

চিঠিখানা অনেক কাটাকুটি করে অনেক রয়ে বসে লেখা। তবু যতবার পড়ে দেখে ততবার নিজের নিবুর্দ্ধিতার নতুন নমুনা আবিষ্কার

করে। ভালো কাগজে নকল করতে করতে বিলিতী ডাকের বার অতিক্রান্ত হল বলে। তখন উজ্জয়িনী মরীয়া হয়ে ডাকঘরে চিঠি পাঠায়। এবং যতক্ষণ না ডাক চলে যায় ততক্ষণ পোস্ট মাস্টারকে লিখে চিঠিখানা ফিরিয়ে আনবে কি না ভাবে।

চিঠি পায় না সে এক দুঃখ। চিঠি লিখতে জানে না সে আরেক। সুধীন্দ্রবাবু ও চিঠি একা পড়বেন না, বাদলকে পড়াবেন নিশ্চয়। দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্বান লোক তার অন্তঃকরণকে হাতের মুঠার ভিতর পেয়ে হাস্য পরিহাসের হাতল করবেন। উজ্জয়িনী কল্পচক্ষুতে দুই বন্ধুর লণ্ডনস্থ বৈঠকখানার দৃশ্য দেখতে পারছে। বাদল সেই গৌরবর্ণ কৃশকায় চিরচিন্তিত অস্থির-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাক্‌পটু বালকটি। তার বয়স যোল পেরিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। আর সুধীন্দ্রবাবুর বোধ করি চুলে পাক ধরেছে ; বয়সের গাছ পাথর নেই। তাঁর সংযম ও গাম্ভীর্য সেকালের মুনিদের মতো। তাঁর প্রতি অনায়াসে শ্রদ্ধা জন্মায়। আহা, পিতৃকল্প মানুষ যে!

উজ্জয়িনী মনে মনে হাসে। হাসি পেলে মনে মনে হাসাটাই নিরাপদ। ধর সুধীন্দ্রবাবুর সামনে যদি হাসি পায় তবে কি তার হাসতে সাহস হবে? অথচ অদৃষ্ট তাকে এইসব মানুষের দলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একদিন হয়তো বিলেত যাবে তার শ্বশুরের সঙ্গে, ও এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবে। বিষম সমস্যা মানুষের সঙ্গে মেশা। বই পত্রের সঙ্গে মেশা কেমন নির্ঝঞ্ঝাট। ঐ করতে করতে তো সে বুড়ো হয়ে গেল। বুড়ো নয় তো কী। সামনের ফাল্গুনে সে সতেরয় পড়বে। এরি মধ্যে সে তার শৈশবকে ভুলেছে। অতীতের কথা বসে বসে স্মরণ করতে ভালোও লাগে না। সেই সময়টা বাদলের চিন্তায় বিভোর থাকতে প্রাণ চায়।

উজ্জয়িনীর দেহে এই প্রথম রং ধরছে। এত দিন সে নিজের দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। দেহ আছে কি না সে কথা লোকের মনে পড়ে প্রথমত যখন অন্নাভাব ঘটে, দ্বিতীয়ত যখন প্রেম জাগে। উজ্জয়িনীরা পুরুষানুক্রমে বড়লোক। এক্স গুপ্ত তাঁর তিন পুত্রকে নগদ তিন লাখ টাকার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ মুর্শিদাবাদের সিবিল সার্জন, কেউ রেলের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেউ বা রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার। সুতরাং উজ্জয়িনীরা অন্নাভাবের কথা খবরের কাগজের থেকে যেটুকু জানে সেইটুকু জানে। সেকথা শুনে মোটারকম চাঁদাও পাঠায়; দেশের অন্নকষ্টের সুযোগ নিয়ে গীতাভিনয় কিংবা নৃত্যাভিনয়ও করে। কিন্তু কিছুতেই দেহসচেতন হয় না, যতদিন না প্রেম জাগে।

প্রেম জাগে অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাবার পরে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। এদিক দিয়ে উজ্জয়িনীরা গোঁড়া স্বদেশী। তাদের সেট্-এর কেউ যে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে এমন সংবাদ কদাচ শোনা যায়। তারা বিয়ে না করে, অন্তত বাগ্দত্ত না হয়ে, প্রেমের নাম মুখে আনে না। মেয়ে কার সঙ্গে মিশতে পারে এবং কার সঙ্গে মিশতে পারে না এ সম্বন্ধে মেয়ের মা'রা তাঁদের অলিখিত মনুসংহিতা মেনে চলেন। উক্ত গ্রন্থের বারো আনা অংশ জুড়েছে পদ ও উপার্জন শীর্ষক প্রথম দুই অধ্যায়।

এক কথায় দেহসচেতন হবার সুযোগ উজ্জয়িনীদের জীবনে বিশ একুশ বছর বয়সের আগে আসে না। উজ্জয়িনীর জীবনে তার আগেই এল। উজ্জয়িনী তার মা'র ঘরের বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে তার মা তখন কলকাতায়। নিজেকে দেখে উজ্জয়িনীর বড় আশ্চর্য লাগে। সে তো সেই উজ্জয়িনী নয়।

সে তো কোনোদিন এত স্থদর্শনা ছিল না। এমন কি তার রংও যেন কিছু ফরসা হয়েছে। শীতকাল বলে কি? তার গাল দুটিতে মাংস লাগছে ভাবতে তার গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠল। তার চোখের পাতায় অকারণে জল চুইয়ে পড়ছে ভাবতে তার খেয়াল হল বালিশে মুখ গুঁজে ঘণ্টা খানেক খুব কাঁদে।

৫

একদিন সকালবেলা ডাক খুলে যোগানন্দ বললেন, "এ তো ভারি মুশকিল হল!"

উজ্জয়িনী মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না, কিন্তু চোখের চাউনিতে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কী হয়েছে, বাবা?

যোগানন্দ চিঠিখানা আরো একবার পড়লেন, পড়ে উজ্জয়িনীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উজ্জয়িনী হাতের লেখা দেখে বুঝল তার শ্বশুরের চিঠি। পড়ে দেখল তিনি উজ্জয়িনীকে নিতে আসছেন; যোগানন্দ এবারও যেন আপত্তি না করেন; যোগানন্দের আরো দুই সন্তান এই দেশেই আছে, যোগানন্দ অনায়াসেই তাদের আনাতে পারেন; কিন্তু মহিমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান বিদেশে; উজ্জয়িনীকে কাছে না পেলে তাঁর জীবন দুর্বহ; বিশেষত তাঁর উপরিওয়ালারা তাঁর প্রতি যেমন দুর্ব্যবহার করছে তাতে তাঁর সময় সময় ইচ্ছা করছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাশীবাস করেন। "আর এ পথে স্থখ নেই রে ভাই" (ইংরেজীতে লেখা); "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। আর ক'টা দিন বৈ তো নয়। এতদিন ইহকালের কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টায় না করলুম কী! তবু তো কালকের নিউইয়ার্স উপাধি তালিকায় আমাকে উপেক্ষা করে জুনিয়ার অফিসারকে

O. B E করা হল। এইরূপ অবিচারের উপর ব্রিটিশ এম্পায়ার টিঁকবে ?"

দীর্ঘকাল একস্থানে থাকতে কারই বা ভালো লাগে ? নতুন জায়গা দেখবার শখ, নতুন মানুষের সঙ্গে মেশবার সাধ, বিশেষ করে যে বাড়ীতে বাদল ছিল সেই বাড়ীতে থাকবার সৌভাগ্য উজ্জয়িনীকে পাটনার দিকে টানল। তবু তার চিরকালের সাথীকে, তার বাবাকে, ছাড়তে পারা যায় না। পিতা ও কন্যার মধ্যে আকর্ষণ সাধারণত নিবিড় হয়েই থাকে। যোগানন্দ ও উজ্জয়িনীর বেলা নিবিড়তর। শুধু নাড়ীর টান নয়, মনের মিল, মতের মিল। ওরা যেন দুটি সতীর্থ, দুটি সহাধ্যায়ী। লেখাপড়ায় যে ওদের মন বসে সেটা লেখাপড়ার খাতিরে ততটা নয় পরস্পরের খাতিরে যতটা। ছেলেরা ইস্কুলে যায় ছেলেদের সঙ্গ পাবার জন্যে।

যোগানন্দ হাসির ভান করে বললেন, "মহিমকে O. B. E. না করে গবর্নমেণ্ট আমার প্রতি অত্যাচার করলেন।"

উজ্জয়িনী কিছু বলবার মতো কথা পেল না। চিঠিখানাকে আর একবার পড়তে বসল। যোগানন্দ তাঁর খবরের কাগজে মন দিলেন, অর্থাৎ মন দেবার ভান করলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারেন না, মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, "মহিমের ওখানে একেবারে অন্য চাল···জবরদস্ত হাকিম···আইনের বই ছাড়া অন্য বই রাখে না··ওর বাড়ীতে তোর সময় কাটবে কী করে ?···খরচ করে পার্টি দেয় বিস্তর···এও একটা চাল, বুঝলি ? পার্টি জমবে ভালো যদি তুই থাকিস···হয়তো সম্রাটের জন্মদিনের উপাধিতালিকার উপরে নজর···সেইজন্যে তোকে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো।"

উজ্জয়িনী কোনোদিন পিতার মুখে পরনিন্দা শোনেনি। শুধু পরনিন্দা নয়, বাদলের পিতার নিন্দা। পিতা যে কতখানি বিচলিত

হয়েছেন অনুমান করতে পারল। কিন্তু কেমন করে তাঁর সঙ্গে শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে কিছু বলে? বিয়ে করলে মেয়েরা পর হয়ে যায় এ জাতীয় একটা অমূলক জনশ্রুতি তো তার অশ্রুত নয়।

তবু বলল, "বাবা, শোন, ওঁর ছেলের জন্যে ওঁর মন-কেমন-করাটা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। ওঁর স্ত্রী নেই বলে ওটা আরো দুঃসহ। তুমি একবার নিজের অমন অবস্থা কল্পনা কর না?"

যোগানন্দ বিরক্তি চেপে বললেন, "মেয়ে হয়েছিস, মেয়ের বাপ তো হসনি! কল্পনা করে দেখিস।" এই বলে তিনি উঠে গেলেন স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করতে।

রাত্রের গাড়ীতে উজ্জয়িনীর মা এলেন। ব্যাপার শুনে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "যাবে বৈ কি। যাবে না? পাটনা isn't a bad place; একটা প্রভিন্সের ক্যাপিটাল। যদিও রায়বাহাদুর, তবু নেহাৎ কেউ কেটা নয়, য়্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ওঁকে সমাজে তুলতে হবে, ওঁর পুত্রবধূরই কর্তব্য। ওঁর বাড়ী নিশ্চয়ই মিসম্যানেজ্‌ড্‌। ওসব কি আর পুরুষ মানুষের কাজ! তবে বেবীকে যেমন অমানুষ করে তৈরি করেছ আর যা ওর বয়স তাতে একলা ওকে নিয়ে বেয়াই সুবিধা করতে পারবেন না।"

যোগানন্দ বক্তৃতার শেষে টিপ্পনি করলেন, "তার মানে তুমিও যেতে চাও।"

মিসেস বললেন, "ভালো দেখায় না। জামাইএর সংসার হলে কথা ছিল না, কিন্তু—। যাক, বেবীর সঙ্গে একটি হাউস কিপার পাঠাতে হবে, পাই কোথায়? মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে পেলে দুই কাজ হয়, মেয়েটাকে কায়দা দুরস্ত রাখতে পারবেন। আহা, বেচারির এখন বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে। তবু পরের বাড়ি চাকরি করতে রাজি হলে হয়!"

যোগানন্দ বললেন, "না হয় রাজি হলেন। কিন্তু মহিম ঠিক আমাদের স্টাইলে থাকেন না। শুনতে পাই তাঁর বাড়ী ঠাকুর-দেবতাও আছেন। কলেজে পড়বার সময় মহিমের যে কত বড় এক লম্বা টিকি ছিল গো! ঐ টিকি কেটে আমি কেমন বিপদে পড়েছিলুম তোমাকে বলিনি?"

উজ্জয়িনীর মা'র স্মৃতি পঁচিশ বছর পেছিয়ে গেল যখন তিনি উজ্জয়িনীর বয়সী। কিন্তু দেখতে উজ্জয়িনীর চেয়ে বহুগুণ সুন্দর—সেকালের নাম-করা সুন্দরী। মহিমচন্দ্রের টিকি-কাটার গল্প মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি বয়সোচিত গাম্ভীর্য ত্যাগ করে সেই সেকালের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলেন কন্যার সাক্ষাতেই। বললেন, "রোসো, বেয়াই আসুন।"

বেয়াই যেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে নামলেন সেদিন টিকি-কাটার গল্প কারুর মনে ছিল না। তাঁর মাথা জোড়া টাক দেখে তাঁর টিকির কথা কারুর মনেই উঠল না। যোগানন্দ ভাবছিলেন তাঁর আসন্ন কন্যাবিরহের কথা; মহিম যতই হাসেন যোগানন্দ ততই কাঁপেন। এক জনের যে কারণে এত উল্লাস অপর জনের সেই একই কারণে এত বিষাদ। যোগানন্দ-জায়া ভাবছিলেন মিসেস স্যামুয়েল্‌সের কথা কোন সুযোগে তোলা যায়। আর উজ্জয়িনী? উজ্জয়িনী অকৃতজ্ঞ কন্যা। সে বাদলের বাবার মুখে বাদলের আদল খুঁজছিল।

৬

কদমকুঁয়ায় রায়বাহাদুরের মস্ত বাড়ী। পুত্র পৌত্রাদি সহ হিন্দু ও মুসলমান ভৃত্যেরা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তাদের গৃহিণীরা উজ্জয়িনীকে দেখবার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিল—বাদল বাবুয়া না জানি কেমন

মেমসাব সাদী করে গেছেন। তারা বোধ করি কিছু হতাশ হল উজ্জয়িনীর রং ও পোশাক দেখে। কিছু খুশিও হল। আহা, বড় ছেলেমানুষ। বাদল বাবুয়ার সঙ্গে একটুও বেমানান হয়নি।

ঘরে তারা ভিড় করে রয়েছে, নড়তে চায় না। উজ্জয়িনীর বাঙালী ঝি-টি বহু অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, "তোমরা এখন যাও, বাছা। খুকী বাবা একটু বিশ্রাম করবেন।" কিন্তু ঝি-র ভাষা শুনে ওরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। উজ্জয়িনী গোটা কয়েক হিন্দী ধমক জানে; কিন্তু ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক; অগত্যা এই ময়লা কাপড় পরা হাস্যমুখরা কৌতূহলী নারীব্যূহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে বাড়ীর সমস্তটা পরিদর্শন করতে বের হল।

অনেকগুলো ঘর। দেশী ও বিলাতী আসবাবের গুদামের মতো দেখতে। স্থান অস্থান নেই, যেখানে সিন্দুক সেখানে সোফা। কার্পেটের উপর স্টোভ পড়ে রয়েছে। নববর্ষের ক্যালেণ্ডারগুলো দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান, রাধাকৃষ্ণের পট, বিলাতী রূপসীদের ছবি, রায়বাহাদুরকে কারা বিদায় সম্বর্ধনা করেছিল তার ফোটো ও সেই উপলক্ষে রচিত ইংরেজী কবিতা—উজ্জয়িনী যেন একটা আর্ট গ্যালারীতে পদার্পণ করেছে! এই সকলের মাঝখানে কোন এক কোণে বালক বাদল পুরস্কারের বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে উজ্জয়িনীর চক্ষু জলে ভরে উঠল।

আপাতত এই তার কাজ, এই সমস্ত ঘরকে ঝেড়ে পুঁছে নতুন করে সাজানো গোছানো। তারপর দাসদাসীর দলকে যখন তখন যে ঘরে খুশি ঢুকতে না দেওয়া। সম্ভব হলে ওদের সবাইকে 'লিভারি' (livery) কিনে পরানো। ওদের বাচ্চাগুলোকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যনীতি।

এই সব চিন্তা করতে করতে উজ্জয়িনী একটি ছোট ঘরে তালা বন্ধ দেখতে পেল।

বেহারা বলল, "এটা বাবুয়াজীকী কামরা আছে।"

উজ্জয়িনী বলল, "খোল, দেখব।"

বাদলের পড়ার ঘর। আলমারিতে রাশি রাশি ইংরেজী-বাংলা বই। টেবিলের উপর এখনো কালি ব্লটিং পেপার পড়ে আছে। তার কোথাও কি উজ্জয়িনীর নাম উল্টো করে ছাপা নেই? টেবিলের উপর একটি মহিলার ফোটোগ্রাফ হেলানো অবস্থায় রয়েছে। ও হরি, ও যে আনা পাভ্‌লোভা। বাদলকে তিনি স্বাক্ষরিত ফোটো পাঠিয়েছিলেন বুঝি?

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে উজ্জয়িনী বাদলের ড্রয়ার খুলতে বসে গেল। তাড়া তাড়া চিঠি। পৃথিবীর কত দেশের কত প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ নামের স্বাক্ষর। সাধে কি বাদলের এমন আত্মবিশ্বাস! সে যে বাদলের যোগ্য নয় এজন্যে তার ক্ষোভ নেই। কোন মেয়েই বা যোগ্য?

বাদলের পড়ার ঘরের চাবি উজ্জয়িনী নিজের হাতব্যাগে পূরল। বাদলের শোবার ঘরে নিজের বিছানা পাতল। ও ঘরে একখানা বড় সাইজের ফোটোগ্রাফে সুধী বসেছে, বাদল দাঁড়িয়েছে। উজ্জয়িনী ওখানাকে এমন স্থানে রাখল যেখানে ঘুমবার আগে ও ঘুম থেকে উঠে আপনি চোখ যায়। ভাবছিল ফোটোগ্রাফকে রোজ মালা গেঁথে পরাবে, কিন্তু তা হলে যে সে মালা সুধীকেও পরানো হয়। উজ্জয়িনী জিভ্‌ কাটল। সুধীকে যেমন কল্পনা করেছিল তেমন নয়। বেশ যুবা পুরুষ, মাথার চুল কালোই। বরঞ্চ বাদলেরই কপাল ঘেঁসে টাক পড়বার লক্ষণ। বাদলের তুলনায় সুধী কালো, কিন্তু ঢের বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। বাদলের প্রতিভা বাদলের চোখের তারার দীপ্তিতে। সুধীর প্রতিভা সুধীর আভাময় ললাটে। উভয়কেই উজ্জয়িনী নমস্কার করল।

দুদিন পরে শ্বশুর মহাশয় যখন মিসেস স্যামুয়েল্‌সের প্রসঙ্গ পাড়লেন উজ্জয়িনী বলল, "কাজ নেই বাবা, তাঁকে এ বাড়িতে বেখাপ হবে। আমাদের অনেক পোষ্য, অনেক অতিথি, এদের নিয়ে আমি বেশ আছি, আমার আর সমাজের জন্যে তৈরী হয়ে কাজ নেই।"

মহিম বললেন, "আঃ হাঃ হাঃ হাঃ, বুঝেছি মা বুঝেছি। এই সরল সত্যটা না জানা থাকলে হাকিমী করতে পারতুম? মেয়েরা তাদের কর্তৃত্বের ভাগ কখনো কাউকে দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মা, তুমি যার স্ত্রী তার জন্যে তৈরি হতে হবে তোমাকে। সে আই-সি-এস হয়ে বছর দুই পরে যখন ফিরবে তখন তার চোখে যেন তোমাকে আসল বিলিতী মেমের মতো দেখায়।"

উজ্জয়িনী বলল, "আমি খাঁটি বাঙালী হতে চাই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এক্স গুপ্তর নাতনী বলে খাঁটি বাঙালী হতে চাই। ওরে মেয়ে, তোদের তিন পুরুষ বিলেত ফেরৎ। তুইও একদিন হবি।"

"কিন্তু বাবা, এক্স গুপ্ত যে কত বড় স্বদেশপ্রাণ পুরুষ ছিলেন সে কি আপনি জানেন না? বিলেত গেছলেন সেই চোগা-চাপকান পরে।"

রায়বাহাদুর গম্ভীর হয়ে বললেন, "তবু আই-সি-এস অফিসারের স্ত্রী, আই-এম-এস অফিসারের মেয়ে, সমাজে তোমার অবস্থার মেয়েরা যেমন, তুমিও তেমনি না হলে মানাবে কেন? গান্ধীর স্ত্রী খদ্দর পরেন গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে।"

উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করছিল বলে, সঙ্গতির কথা যদি বলেন তবে এ বাড়ীর খোল ও নল্‌চে দুই বদলাতে হয়, মায় আপনাকে পর্যন্ত আপনার সুটের সঙ্গে আপনার টাই বেমানান, আপনার ঐ পাগড়িটি ইংরেজী পোশাকের সঙ্গে যায় না, আপনি স্নানের নাম করে স্নানের ঘরের লাগাও ঠাকুর ঘরে বসে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করেন, বিজাতীয় খাবার

নামমাত্র মুখে দিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ তরকারী খান, আপনি এডগার ওয়ালেসও রাখেন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও রাখেন, সিগারেটও ফোঁকেন আলবোলাও গুড় গুড় করেন। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ এ বাড়িতে এসে কেবলি হাসি চাপতে থাকবেন সে আমি হতে দেব না।"

উজ্জয়িনী এতদিন পরে নিজের সংসার পেয়েছে, নিজের মনের মতো করে সাজাবে। ও বাড়ীতে মা'র আধিপত্য, জোর করে কিছু চালাতে পারত না; তার প্রস্তাবগুলো তার বাবার বেনামীতে মা'র দরবারে হাজির করত, তাতেও ফল হত না। এতদিনে সে স্বরাজ পেয়েছে, তার শুভবুদ্ধি যা বলে সে তাই করবে, ফ্যাশান কিংবা প্রথার শাসন মানবে না। এক্স গুপ্তের নাতনী সে এক্স গুপ্তের মতোই সংস্কারক। যোগানন্দের কন্যা সে, যোগানন্দের মতোই বৈজ্ঞানিক। বাদলের স্ত্রী সে, বাদলের মতোই উচ্চমনা।

৭

উজ্জয়িনীদের বাড়ীর একটি বিশেষ ঘর থেকে পাশের বাড়ীর একাংশ চোখে পড়ে। একদিন উজ্জয়িনী দেখল একটি আঠারো উনিশ বয়সের তরুণী বধূ তার আপিস-প্রত্যাগত স্বামীর জুতো খুলে নিয়ে ভিজে গামছায় পা মুছে দিচ্ছে। দৃশ্যটি উজ্জয়িনীর পক্ষে এমন অপূর্ব যে উজ্জয়িনী চুরি করে দেখতে দ্বিধা বোধ করল না।

স্বামীটিরও বয়স বেশী নয়, সে ভারি লজ্জিত ভারি কুণ্ঠিত হয়ে স্ত্রীর সেবা নিচ্ছে, মুখ ফুটে আপত্তি জানাচ্ছে না, জানে যে আপত্তি নিষ্ফল।

স্বামীকে খাবার দিয়ে স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে বসল। পাখার দরকার ছিল না। শীতকাল। তবু স্বামীটি আপত্তি করতে পারে না, পাখার

হাওয়া খেতে খেতে মৃদু মৃদু হাসে। সে যে আপিস থেকে অনেক খেটে অনেক কষ্ট পেয়ে ফিরেছে, স্ত্রীর মতো বাড়ীতে বসে বসে আরাম করেনি তো। মুখ ফুটে না বললেও স্ত্রীর মনোভাবটা যেন এই।

উজ্জয়িনীর অন্যত্র কাজ ছিল বলে সে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। আবার যখন এল তখন দেখল স্ত্রীটি স্বামীকে বাবু-বেশে সাজিয়ে বলছে, "বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে না গেলে ওঁরা যে কুণো বলে ঠাট্টা করবেন, বলবেন বৌ-পাগলা, স্ত্রৈণ।"

স্বামী এর উত্তরে কী একটা বলবার জন্যে ঠোঁট নাড়ল। স্ত্রী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "চুপ।" কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "মা শুনতে পাবেন যে। ছিঃ!"

একদিন উজ্জয়িনী মা-টিকেও দেখল। স্বামীর মা শাশুড়ী। মেয়েটি তার শাশুড়ীকে পাগল হরনাথের তত্ত্বকথা পড়ে শোনাচ্ছে। উজ্জয়িনী কান পেতে যতটুকু শুনল ততটুকু তার বিশেষ ভালো লাগল। তাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় আধ্যাত্মিকতা নেই। তার বাবা ভগবান সম্বন্ধে সংশয়বাদী, তার মা ও দিদিরা বিপদে পড়লে ভগবানের নাম করে বটে, কিন্তু তাদের একটা নির্দিষ্ট ধর্মমত নেই। তাদের সমাজের লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন মানের উপাসক। যদিও নামে তারা কেউ হিন্দু, কেউ ব্রাহ্ম, কেউ কেউ বা খ্রীস্টান।

উজ্জয়িনীর মনের খোরাক থেকে যেন একটা উপাদান বাদ পড়ে আসছিল, তাই তার মনের পুষ্টি তার মনের মতো হচ্ছিল না। এইবার যেন সে ভিটামিনের সন্ধান পেল। শ্বশুরের লাইব্রেরী ঘাঁটাঘাঁটি করে হরনাথের বই পেল না, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ যা-কিছু পেল সমস্ত চুরি করল। রামায়ণ মহাভারত তার পড়া ছিল, ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নয়, প্রাচীন ভারত সভ্যতার বিশ্বকোষ বলে। কিন্তু "চৈতন্যচরিতামৃত," "ভক্তমাল গ্রন্থ," "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" ইত্যাদি তাকে অনাস্বাদিত রস দিল।

সেই মেয়েটির জীবন উজ্জয়িনীর লোভনীয় লাগে। আহা, উজ্জয়িনীরও যদি একটি শাশুড়ী থাকত! আর উজ্জয়িনীর স্বামীটি যদি থাকত কাছে! কেমন অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ সংসার। তাদের তো ঝি-চাকর অগুন্‌তি নয়, একটি মাত্র ঠিকে-ঝি। মেয়েটি রান্না করে নিজের হাতে। উজ্জয়িনী লুকিয়ে তার কাজ দেখে। উজ্জয়িনী যদি লেখা পড়া এত না শিখে রান্না করতে শিখত! ফ্যান্সী সেলাইয়ের কাজ না শিখে যদি ফাটা বালিশ রিফু করতে শিখত। পিয়ানো বাজাতে শেখার দুরন্ত দুশ্চেষ্টায় বহু সময় নষ্ট করেছে, সেই সময়টাতে বাজার হিসাবের খাতা লিখলে কাজ দিত।

মহিম দিনে আপিস করেন, রাত্রে সমপদস্থ দেশীয় চাকুরেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ও তাস খেলতে যান। তাঁর ইচ্ছা আছে পদমর্যাদা আর একটুখানি বাড়লে ইউরোপীয় ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে দেহপাত করবেন।

উজ্জয়িনী আহারের সময় ছাড়া শ্বশুরের সঙ্গ পায় না। সেজন্যে ওর আফসোস নেই। রবিবারে তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করেন অমুক সাহেবের বাড়ী সঙ্গে নিয়ে যেতে। সে বলে, আজ নয়, আর একদিন। কারুর সঙ্গে তার আলাপ করবার সাধ নেই, আছে শুধু ঐ প্রতিবেশিনী মেয়েটির সঙ্গে। কিন্তু ওদের বাড়ী যে নিজের থেকে যাওয়া যায় না। ওরা তো বড়-চাকুরে নয়। কলেজের লেকচারার। একটা পুরো বাড়ীর এক-চতুর্থাংশ ভাড়া নিয়েছে। ওদের বাইরের ঘরে দারোয়ান নেই। স্বামীর কোনো বন্ধু এলে হাঁক দেন, "কমল বাড়ী আছ হে?" কেরোসিন তেলওয়ালা এলে ডাক দেয়, "মাইজী!"

উজ্জয়িনীর ভারি হিংসা হয়। তাকে কেউ "মাইজী" বলে না? এত কাল ছিল "খুকী বাবা"। এখন "ছোটা মেম সাব"। তা নইলে

স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গতি হয় না। মহিমকে সাহেব না বলে বাবু বললে তিনি কেবল মনে মনে নয় মুখেও বড় চটেন। একদিন কাকে যেন বলছিলেন, "রায়বাহাদুর উপাধিটা, মশাই, উপাধি তো নয় উপদ্রব বিশেষ। ওর চেয়ে, মশাই, রায়সাহেব উপাধি ভালো। তবু তো সাহেব।"

ও বাড়ীর মেয়েটিও এ বাড়ীতে পা দেবার কথা ভুলেই থাকে। ওর কিসের অভাব? ওর স্বামী যতক্ষণ থাকেন না ততক্ষণ শাশুড়ী থাকেন। কোনো কোনোদিন শাশুড়ীকে নিয়ে সে তাদেরই সমান অবস্থার কোন উকীলবাবু বা ডাক্তারবাবুর বাড়ী গল্প করতে যায়। তাঁরা এলে তাদের বসবার জন্যে মেজেতে সতরঞ্চি পেতে দেয়, পান সেজে আনে। বেশীর ভাগ কথা ওঠে স্বামী সংক্রান্ত—কার স্বামী কত ভালো, কার স্বামীর আপিসের কাজ কত বেশী সময়সাপেক্ষ, উপর-ওয়ালাদের কেন মরণ নেই, কোথায় বদলি হলে দুধ-ঘির সুবিধে। বাজার খরচের কথা ওঠে। ঝি-চাকরগুলোকে বিশ্বাস করবার জো নেই, দোকানদারগুলো ভেজাল দেয়, পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ থেকে আসে দেশের প্রসঙ্গ। গান্ধী মহারাজ কী করছেন, সি-আর-দাশ মারা যাবার পর থেকে আন্দোলনটাও মরে রয়েছে, সাহেবরা কি কিছুতেই রাজত্ব ছাড়বে, কেই বা নিজের জমিদারিখানি বিলিয়ে দিতে চায় বল?

থেকে থেকে বেশ একটু অশ্লীল আলোচনাও হয়। অমুকবাবুর স্ত্রীর ক'মাস চলছে, অমুকবাবুর স্ত্রী আর পারে না, প্রত্যেক বছর একটি। ভগবানের দান। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝে, ছার মনুষ্যের এমন সাধ্য নেই। "আচ্ছা, সকলের হয়, আমাদের বীণার কেন হয় না?"

উজ্জয়িনী সেই থেকে জানল মেয়েটির নাম বীণা। মেয়েটির চোখ ছলছল করে উঠল, মেয়েটি মুখ নিচু করে বলল, "যাও!"

৮

বীণা মেয়েটির নাম। বেশ নামটি তো। উজ্জয়িনী একটা জবড়জং নাম, ও নাম ধরে কেউ কাউকে ডেকে সুখ পাবে না। কেমন আদরের নাম বীণা। বীণা, বীণু, বীণি!

উজ্জয়িনী মনে মনে বীণার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে লাগল। তার বয়সে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই কিছু স্বজাতিবৎসল হয়ে থাকে। বিয়ে করলেও এর ব্যতিক্রম হওয়া শক্ত। বীণাকে দেখে উজ্জয়িনী প্রথম অনুভব করল যে তার একটি সখী চাই। যেই অনুভব করল অমনি আশ্চর্য হল ভেবে যে এত বড় অভাবটা আগে কেন অনুভব করেনি। ছোট ছেলেরা যেমন থাকে থাকে হঠাৎ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে অনর্থ বাধায়, উজ্জয়িনীও তেমনি বীণার সঙ্গে সখ্য পাতাবার জন্যে একাগ্র হয়ে উঠল। রোজ তার বীণাকে দর্শন করা চাইই। সেকালের বাদশারা বাতায়নে দাঁড়ালে ভক্তরা দর্শন পেয়ে দিন সার্থক করতেন। আমাদের উজ্জয়িনীর কিন্তু উল্টো ব্যাপার। সে বাতায়নে দাঁড়িয়ে দর্শন দেয় না, দর্শন করে।

চুরি করে দর্শন করতে করতে একদিন উজ্জয়িনী ধরা পড়ে গেল। বীণার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই বীণা মাথার কাপড়টা তুলে দিল। তার সময় ছিল না যে দাঁড়ায়। স্বামীর কলেজের বেলা হল। তিনি প্রাইভেট টিউশনি করতে গেছেন, এখনি এসে আরাম কেদারায় গড়িয়ে পড়বেন। ভাবটা এই যে আজ নাই বা গেলেম কলেজে। একখানা ছুটির দরখাস্ত করে দিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে দুটো কথা কই। স্বামীটি জানে প্রিন্সিপাল যদি বা সে দরখাস্ত মঞ্জুর করবে স্ত্রী সে দরখাস্ত লিখতে দেবে না। অতএব অন্যান্য দিনের মতো আজকে রাশি রাশি কথা কইতে হবে, দিস্তা খানেক নোট লেখাতে হবে। এই ভাবতে ভাবতে তার আরাম কেদারায় বসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।

বীণা রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসল। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে কী মনে করছিল কে জানে! উজ্জয়িনী সটান দৌড় দিল তার পড়ার ঘরে অর্থাৎ বাদলের স্টাডিতে। তার যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি কান্নাও পাচ্ছিল। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। তাও বীণার কাছে। পরে যখন বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে তখন এই নিয়ে বীণা রঙ্গ করবে। এত বড় উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে উজ্জয়িনী, সেও গুপ্তচরবৃত্তি করে, বীণা হয়তো এজন্যে তাকে অশ্রদ্ধাও করতে পারে।

বাদলের স্টাডির দেয়ালে কোনোরকম ছবি টাঙানো ছিল না, তাতে বিদ্যার্থীর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। ছিল একটি মটো। "Repentance is a sin." উজ্জয়িনী তার মানে বোঝবার চেষ্টা করল। পৃথিবীতে এত কথা থাকতে বাদলের ঐ একটি কথা মনে ধরল কোন গুণে? সবাই তো ওর উল্টাটাই বলে। অনুতাপ করলে পাপক্ষয় হয় বলেও তার জানা ছিল, বাদলের মতে অনুতাপ করলে পাপ হয়। এসম্বন্ধে সুধীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখলে মন্দ হয় না। ভালো কথা সুধীন্দ্রবাবুর একখানা চিঠি এসেছে কাল, একবারের বেশী পড়া হয়নি, অথচ বহুবার না পড়লে ঠিক ঠিক অর্থবোধ হয় না। উজ্জয়িনী সুধীর চিঠি বের করে পড়তে বসল।

সুধী লিখেছে :—

প্রীতিভাজনাসু,

বাদলের সংবাদ জানবার জন্যে আপনার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকবে বলেও বটে, আবার দেশভাষায় কথা কয়ে আমিও কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করব, এই বিবেচনার ফলে এই পত্রক্ষেপ। ভাবছি আমার এ পত্রখানি যখন ক্ষুধার্ত দুর্বাসার মতো প্রোষিতভর্তৃকার পুরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠ হবে তখনো কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ হবে না, তিনি উত্তর দিতে একান্ত বিলম্ব করবেন?

দেশে থাকতে আমরা থার্ডক্লাস গাড়ীর যুগল পক্ষিরাজ ছিলুম। দেশের গতির ছন্দে মিল দিয়ে আমরা দুই বন্ধুও ধীরে সুস্থে হাঁটতুম ও আস্তাবলের বাহিরে বন্ধু খুঁজতুম না। তবে ঠিক অসামাজিকও ছিলুম না। বিলেত দেশটা মাটির হলেও মাটির গুণে ফসলের বাড় বেশী বা কম। দেখছি বিলেতে এসে বিলেতের গতিচ্ছন্দ আয়ত্ত না করলে মরণং ধ্রুবম্। বাদল বুদ্ধিমানের মতো গাড়ীটানা ঘোড়ার কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বনছে। আমিও মোটর গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে খোঁড়া হয়ে মরি কেন, পিঁজরাপোলে আশ্রয় নিয়েছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এদেশের অনেকসংখ্যক না-মঞ্জুর ঘোড়ার সঙ্গে আমিও জাবর কাটছি।

এদানীং খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর মোলাকাৎ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রতি বুধবার। বাদলকে আপনার হয়ে বহু অনুরোধ উপরোধ করি, সে কি কথা শোনে? সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক। গভীর আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মতো প্রশ্ন করে, "য়্যাঁ, কী বলছিলে?" আপনার কথা পাড়লে বলে, "ওঁকে কিছু নতুন প্রকাশিত বই পাঠিয়ে দিতে রোজই ভুলে যাই, ভদ্র মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।"

বাদল অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। ইংরেজের ছেলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে বিশ বৎসর বয়সে যা হয়ে ওঠে বাদল বিশ সপ্তাহে তা হতে চায়। অথচ বিশ বৎসরেও তা হবার উপায় নেই, কারণ ততদিনে ইংরেজসন্তান চল্লিশ বৎসর বেঁচেছে আর ইংলণ্ডবাসী বাদল বেঁচেছে বিশ বৎসর। অন্য কথায়, ইংলণ্ডে জন্মিয়ে বাদলের সমবয়সীরা বিশ বৎসর স্টার্ট পেয়ে গেছে এবং সে স্টার্ট কোনো মতে হ্রস্ব হবার নয়। তথাচ বাদল উঠে পড়ে দৌড়াচ্ছে। ইংলণ্ডের বিগত বিশ বৎসরের দৈনন্দিন ইতিহাস সে সংবাদপত্র হতে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত স্মৃতিসাৎ

করছে। ইংলণ্ডের তৎকালীন ভাবস্রোতে বাদল উজান বেয়ে চলেছে। ইংরেজশিশু জন্মলাভ করে দেখে ওর জন্যে একটি মাতা ও একটি পিতা অপেক্ষা করে আছেন। ভ্রাতা ও ভগিনী, সঙ্গী ও সতীর্থ, প্রতিবেশী ও দৃষ্টিপথারূঢ় বহুবিধ ব্যক্তি ওকে নানা সূত্রে শিক্ষায় সংস্কারে ভাষায় ব্যবহারে স্বভাবে ও স্মৃতিতে ইংরেজ করে তুলছে। কিছুটা সে কানে শুনে শেখে, কিছুটা আবার চোখে দেখে ও অবস্থায় পড়ে। একটি শিশুর মানসিক জীবনের উপর ওর দেশ ও জাতির রূপ গুণ কেমন ধীরে অথচ অমোঘভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকে আপনি নিশ্চয়ই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। টাকাকে গলিয়ে নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কাগজের উপরিস্থিত লেখাকে মুছে আরেক দফা লেখাও সম্ভব, সুদক্ষ স্থপতি একটা বাড়ীকে বেমালুমভাবে আরেকটা বাড়ীতে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু পুনর্জন্মের পূর্বে বাঙালী কখনো ইংরেজ কিংবা ইংরেজ কখনো বাঙালী হতে পারে না। বেশভূষায় আদবকায়দায় সহানুভূতিতে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে বা বহুদিন হতে একত্র থেকে আইন অনুসারে এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষ হতে পারে সত্য। কিন্তু বাদল যে স্মৃতিতে ও প্রকৃতিতে ইংরেজ হতে চাইছে। সে যদি ইঙ্গবঙ্গদের মতো আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইত তবে দুঃখিত হলেও বিস্মিত হতুম না, কিন্তু কোনো দিন সে বলে বসবে, "তুমি আমার ভারতবর্ষীয় বন্ধু, যখন ভারত-প্রবাসী ছিলুম তখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়।"

থাক্ ও কথা। বাদলের বদলে বরফের বর্ণনা করি, অবধান করুন। শুভ্র আকাশ হতে রাশি রাশি শেফালী অতীব ধীর মন্থর ভাবে ঝরছে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে মুঠার মধ্যে পাই। কিন্তু হাত কন কন করে না। অথচ ইংলণ্ডের বর্ষা বর্শার ফলার মতো বেঁধে। বৃষ্টির ফোঁটা যে কী ভয়ানক ঠাণ্ডা হতে পারে অনুভব করেননি।

কিন্তু বরফের থোপা বড় মোলায়েম ও ঈষৎ শীতল-স্পর্শ। যে বরফ খান্ সে বরফের কুচি জমাট ও কঠিন। এ বরফের পাউডার ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

এ বাড়ীতে একটি শিষ্ট বালিকা থাকে, তার নাম মার্সেল। বোধ করি তার পরিচয় দিয়েছি। লক্ষ্মীকে স্বচক্ষে দেখতে চান তো মার্সেলকে দেখে যান। আজ রবিবার, আজ আমাকে বাইরে যেতে দেবে না, আমাকে তার ঘোড়া সাজাবে। থার্ডক্লাস ঘোড়াকে সহজেই চেনা যায়, মেয়েদের স্বাভাবিক ইন্‌টুইশন বশত মার্সেল আরো সহজে চিনেছে। চিঠিখানাকে আর একটু দীর্ঘ করে সেই অশ্বারূঢ়া ঝাঁসীর রাণীর মসীচিত্র এঁকে দেখাব ভেবেছিলুম। কিন্তু লাগামে টান লাগছে। অগত্যা উঠতে হল। নমস্কার জানাই। ইতি। বিনীত

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ

৯

মার্সেলের কাণ্ড পড়ে উজ্জয়িনীর কৌতুক বোধ হচ্ছিল। ইংলণ্ডের মেয়েগুলোও কম বাঁদর নয়। সুধীবাবুর মতো একজন দার্শনিক মানুষকে হামাগুড়ি দেওয়ায়। দেয় সপাং করে এক চাবুক। সুধী না হয়ে বাদল হলে কেমন জব্দ হত! (মার্সেল নয়, বাদল জব্দ হত!)

কিন্তু বাদল থাকে দূরে, বীণা থাকে অদূরে। বীণার টানই প্রবল। উজ্জয়িনী সুধীবাবুকে কী লিখবে ভেবে তাঁর চিঠিখানা খুলেছিল ভুলে গেল। একবার বীণাকে দেখে এলে হয় না? এবার কিন্তু খুব সন্তর্পণে, বীণা যাতে টের না পায়। শুধু বীণা নয়। বীণার স্বামীও এতক্ষণে ফিরেছেন, তিনিও টের পাবেন আর মুচকি হাসবেন। ভারি লাজুক ভদ্রলোকটি। সুন্দর চেহারা, ঋজু ও তনু গড়ন, সুকুমার স্বভাব।

বীণার স্বামী না হয়ে বীণার স্ত্রী হলেন না কেন ? অসাধারণ ফর্‌সা, তবু প্রসাধনের পারিপাট্য নেই, নম্রতার অবতার। মৌনভাবেরও। কলেজে বেশী বকতে হয় বলে বাড়ীতে শক্তি সঞ্চয় করেন।

উজ্জয়িনীকে বীণার আকর্ষণ কি কমলের আকর্ষণ কোনটাতে টানল বলা যায় না। উজ্জয়িনী এবার সযত্নে নিজেকে গোপন করল। দেখল স্বামীটি খাচ্ছে আর স্ত্রীটি এমন ভাবে তার থালার দিকে হাতের দিকে মুখের দিকে অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাকাচ্ছে যেন একটি সূর্যমুখী ফুল ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। যেন স্বামীর আহারলীলা নিরীক্ষণ করার মধ্যে স্ত্রীর নিজের আহারক্রিয়া উহ্য রয়েছে। বাদল উজ্জয়িনীকে কোনো দিন এমন সুযোগ দেবে কি ? যদি দেশে ফেরে তবে দুর্ধর্ষ জনবুল হয়ে ফিরবে, স্ত্রীর সেন্টিমেণ্টের মর্যাদা বুঝবে কি ? এমনি করে দিনের তুচ্ছ কাজগুলির ভিতর দিয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রী আত্মনিবেদন করবার ছল খুঁজবে, কিন্তু পাবে না। উজ্জয়িনী না হয়ে বীণা হয়ে জন্মালেও বীণার ভাগ্য পেলে বুঝি উজ্জয়িনীর ক্ষোভ থাকত না।

বীণার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে উজ্জয়িনী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল, কিন্তু সে কেমন করে সম্ভব ? উজ্জয়িনীদের সমাজের রীতি এই যে দুপক্ষেরই কোনো একজন বন্ধু বা আত্মীয় বা পরিচিত লোকে দুজনকে আলাপ করিয়ে দেবেন। গায়ে পড়ে আলাপ করা অসিদ্ধ এবং আকস্মিক আলাপ পরে অস্বীকার্য। উজ্জয়িনী মহিমচন্দ্রকে একদিন জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, ওবাড়ীর কেউ আমাদের এখানে আসেন না কেন ?"

মহিম বললেন, "কমলবাবুদের কথা বলছ ? কই কোনো দিন তো আসেন না। ছোকরা কিসের যেন লেকচারার শুনেছি, কিন্তু

স্বভাবটি তাঁর মুখচোরার।”—এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল।

কিন্তু তাতে উজ্জয়িনীর কার্য সিদ্ধ হল না। তার সঙ্গে মহিমচন্দ্র পাড়ার দুপাঁচজন ডেপুটি মুন্সেফ ও উকীলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং ওঁরাও ওঁদের “ওঁদেরকে” একদিন পাঠিয়ে দেবেন বলে আপনা থেকেই প্রস্তাব করেছেন। সাহেব-কন্যাকে নিমন্ত্রণ করে দুঃসাহসের কাজ করেননি। উজ্জয়িনীর একমাত্র আশা যদি ওঁদের কারুর “ওঁরা” একদিন আসেন ও দৈবাৎ বীণার সঙ্গে পরিচিতা থাকেন।

সেদিনের প্রত্যাশায় উজ্জয়িনী ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে বীণার সঙ্গে ঘটতে থাকল বারম্বার দৃষ্টি-বিনিময়। বারম্বার যা ঘটে তার মধ্যে আকস্মিক কতখানি, কতখানিই বা চিন্তিতপূর্ব? দৃষ্টিবিনিময় মাত্রে যে হাস্যবিনিময়টুকু হয় সেটাও কি আকস্মিক?

সংকোচ কেটে যেতে লাগল। উজ্জয়িনী জানালার থেকে সরে যায় না, বীণা স্রস্ত কেশের উপর কাপড় তুলে দেয় না। আহা, উভয়ের বয়স যদি আরো কম হত! তখন হয়তো দুজনে একই ইস্কুলে যেত, একই জায়গায় খেলা করত। ইস্কুলের কথা মনে পড়ায় উজ্জয়িনীর আফসোস হতে লাগল, কেন অবুঝের মতো অকালে ইস্কুল ছাড়ল! তখন কি ভয়ানক লাজুক ও অসামাজিক ছিল সে, কোনো মেয়ের সঙ্গে তার বনত না, ওরা তাকে মারত কিংবা ক্ষ্যাপাত অথচ সে কারো গায়ে হাতটি তুলত না কিংবা মুখ ফুটে প্রতিবাদ করত না। একদিন বাবাকে বলল, “আর ইস্কুলে যাব না।” বাবাও বাধ্য করলেন না, নিজে কন্যার ইস্কুল-মাস্টারি করতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে উজ্জয়িনী অল্প বয়সে অনেক শিখেছে। কিন্তু সমবয়সিনীদের সঙ্গ হারিয়ে

তাদের জগতে প্রবেশের পথ পাচ্ছে না। তাদের সঙ্গে পড়লে পড়াশুনা হত না, কিন্তু পড়াশুনার চাইতে যা ঢের বেশী লোভনীয় তাই হত—হত সখ্য, হত অন্তরঙ্গতা।

উজ্জয়িনীর মনে হল বাদলকে যে সে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারল না এর প্রধান কারণ তার বিদ্যার স্বল্পতা নয়—একটা বড় কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। বীণা বিদুষী কি না জানে না, কিন্তু উজ্জয়িনী জোর করে বলতে পারে বীণা বাদলকে এমন করে আপনার করে নিত যে বাদল তাকে চিঠি না লিখে পারত না। বীণার সে নিপুণ হাত যাদু জানে। বীণার স্বভাবে যে মাধুর্য আছে উজ্জয়িনীতে তা কই? বীণাকে পেলে বোধ করি বাদল এত একাগ্র ভাবে ইংরেজ হবার তপস্যা করত না। তার তপশ্চর্যায় বীণার মুখখানি হত ইন্দ্রপ্রেরিত বিঘ্ন। হয়তো তার জীবনের ব্রত হত বীণাকে সুখী করা, বীণাই হত তার ধন ও মান, যশ ও কীর্তি।

কিন্তু বেচারা কমলের তা হলে কি দশা হত! সে যে বড় বেচারা মানুষ। খুব সম্ভব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, একান্ত স্নেহলালিত পোষা প্রাণীটি, এখন মার হাত থেকে স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়েছেন। নাঃ, বীণা বলেই পারে, উজ্জয়িনী কিছুতেই সইতে পারত না। বাদল যদি কমল হয়ে থাকত তবে উজ্জয়িনীর ক্ষোভ দূর হত না, এক ক্ষোভের স্থান অপর ক্ষোভ নিত। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার থেকে বড় কথা স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারা। উজ্জয়িনী বীণার তুলনায় ভাগ্যবতী।

কিন্তু বীণার সঙ্গে প্রাণ খুলে এ সব কথা না কইলে কাকে কইবে, কেমন করে প্রাণের নিঃসঙ্গতা লাঘব করবে? বাবাকে যখন চিঠি লেখে তখন এসব কথার ধার মাড়ায় না। বাবা তার মনের সাথী, প্রাণের

নয়। একটি সাথী তার চাই-ই চাই। এ যে অভাব, এর মতো অভাব বুঝি আর নেই।

উজ্জয়িনীর সংস্কার বিদ্রোহী হলেও সে ঠিক করল বীণার সঙ্গে যেচে আলাপ করবে। বীণা যদি তার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে তা হলে যে সে কী ভয়ঙ্কর লজ্জা পাবে সে কথা ভাবতে তার মাথা ঘোরে, সে কথাকে সে বলপূর্বক চাপা দিল। না, না, মরে যাবে না, মরার কথাই ওঠে না। কিন্তু আর কখনো এই জানালা খুলবে না এবং আর কখনো কারুর সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতাবে না। জানবে যে তাকে পৃথিবীতে কেউ ভালোবাসে না, এক তার বাবা ছাড়া। পৃথিবীর কারুর কাছে কোনো প্রত্যাশা না রেখে সে মীরাবাইয়ের মতো ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করবে এবং হিমালয়ের কোনো গুহায় আত্মগোপন করবার জন্যে সংসার ত্যাগ করবে। তার বাবা ছাড়া অন্য সকলে ক্রমশ ভুলে যাবে যে উজ্জয়িনী বলে কেউ ছিল।

১০

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সৌভাগ্য এল। বীণা নয়, মলিনা মেয়েটির নাম। একদিন মা'র সঙ্গে মহিমচন্দ্রের বৌমাকে দেখতে এসে বলে গেল, "আমি আবার তো আসবই, এলে আপনাদের লাইব্রেরী থেকে নড়ব না দেখবেন।"

পরিচয়ের ইতিবৃত্ত দেওয়া যাক্।

মহিমচন্দ্রের উকীলবন্ধু সুবল একদিন দুপুরবেলা তাঁর স্ত্রীকে ও কন্যাদ্বয়কে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপ করে আসবার অনুমতি দিলেন। গিন্নীটি বড় ভালো মানুষ। এসেই বললেন, "মা, রোজ আসি আসি

করে আসা হয়ে ওঠে না, জানোই তো বৃহৎ পরিবারের অসুবিধে। নইলে তোমার এখানে মা নেই, বোন নেই, শাশুড়ী নেই শুনে অবধি প্রাণে যে উন্মাদনা বোধ করছি, মা, সে আর কী বলব? তুমি আমার মেয়ের মতো, তুমি তো সব বোঝ।” এক নিঃশ্বাসে এই পরিমাণ কথা বলে ধুঁকতে লাগলেন। উজ্জয়িনী চট করে একখানা পাখা ও এক গ্লাস জল আনিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিম্ন স্বরে বললেন, “বাবা সিবিল সার্জন?”

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে হাঁ জানাল।

“ভাই বোন ক’টি?”

“ভাই নেই, বোন দুটি।”

“আহা, ভাই নেই! একেবারেই নেই!”—ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর থেকে মনে হল তিনি পরম উন্মাদনা বোধ করছেন। উজ্জয়িনীও যেন এই প্রথম একটি ভাইয়ের অভাব বোধ করল। তার চোখ ছল ছল করল।

মলিনা ও মিনতি মার কথাবার্তার সেকেলে ধরনে মনে মনে চটে গেছল। মাকে থামাতেও পারে না। অত্যন্ত অসহায় অথচ অপ্রসন্নভাবে তারা শুনতে লাগল মা বলছেন, “বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, রাজার মেয়ে। দেখে প্রাণ প্রফুল্লিত হল। আর আমার মেয়ে দুটোর ছিরি ছাখ। এখনো বি-এ পাস করতে পারল না। হাঁ মা, তুমি তো এম-এ পড়া মেয়ে—”

উজ্জয়িনী বাধা দিয়ে বলল, “আজ্ঞে না, আমি ম্যাট্রিকও পড়িনি। সত্যি কথা বলতে কী, আমার বিদ্যার দৌড় সিক্স্‌থ্‌ ক্লাস পর্যন্ত।”

মলিনাদের মা টিপ্পনি কাটলেন, “ছাখ্‌ তোরা, দেখে শেখ্‌, বিনয় কাকে বলে। কত জ্ঞান আহরণ করলে তবে বলতে পারা যায় আমার

বিদ্যার দৌড় লাস্ট ক্লাস্ পর্যন্ত। কে যেন ইংরেজ কবি বলে গেছেন, আমি বেলা-ভূমিতে বালুকাখণ্ড সংগ্রহ করেছি ?"—

মিনতি মা'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "কবি নয় মা, scientist। স্যর আইজাক নিউটন, যিনি Laws of Gravitation আবিষ্কার করেন।"

মলিনা উজ্জয়িনীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বলল, "আবিষ্কার করে কী result হল ; আজ তো আইনস্টাইন এসে সব explode করে দিলেন ?"

উজ্জয়িনী সবিনয়ে বলল, "না, ঠিক উল্টে দেননি। দেখুন, এ সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও এত কম বোঝেন যে আমাদের এপক্ষে বা ওপক্ষে কোনো রায় দেওয়া সাজে না।"—বলেই উজ্জয়িনী রেগে উঠল।

মলিনার মা বললেন, "ঠিক বলেছ মা। দুপাতা ইংরেজী পড়ে আমাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। ঐ যে বলে, 'হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল,' ওই হয়েছে আমাদের দশা।"

মা কিংবা মেয়ে কারুকেই উজ্জয়িনীর মনে ধরছিল না। সে টের পেয়েছিল যে মাতে মেয়েতে বিদ্যা সংক্রান্ত ঈর্ষা ও অভিমান থেকে তাদের সম্বন্ধের স্বাভাবিক মধুরতাকে পরের পক্ষে অনুপভোগ্য করছে, যেমন চিনির মধ্যে কাঁকর। মেয়েরা উজ্জয়িনীকে মা'র চেয়েও আপন মনে করছে—কিন্তু কেন ? সমবয়সীদের মধ্যে একটা দলগত চক্রান্ত আছে অসমবয়সীদের বিরুদ্ধে—তাই কি ? প্রাচীন ও নবীন, একের গর্ভে অপরের জন্ম, তবু উভয়ে উভয়ের শত্রু। কথাটা সে কোন বইয়ে পড়েছিল স্মরণ করতে চেষ্টা করল।

উজ্জয়িনী তাঁদের কিছু জলযোগ করিয়ে বাড়ীর নানা অংশ দেখিয়ে বিদায় দিল। তাঁরা বাদলকে ভালো করেই চিনতেন, সুধীকেও।

সুধী ও বাদল কেমন আছে, কী পড়ছে, কবে ফিরবে ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করছিল বীণা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু না, প্রথম দিনে অতটা ভালো দেখায় না।

মলিনা ও মিনতি দুই বোনেরই প্রধান দোষ তারা উজ্জয়িনীর উপর নিজেদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে উৎসুক। তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার বিবরণী দিল। মলিনা বি-এ দিচ্ছে আগামী বৎসর, মিনতি এইবার আই-এ দেবে। দুজনেই বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়ে। পাটনায় মেয়েদের কলেজ নেই। মলিনার মধ্যে কিছু গভীরতা আছে। সে উজ্জয়িনীর লাইব্রেরী দেখে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার রুচি খাপ খাবে। আমিও বিজ্ঞান ভালোবাসি, কিন্তু শেখায় কে? সস্তায় মাস্টার পাওয়া যায় বলে দুজনেই হিস্ট্রী ও সংস্কৃত পড়ি।"

মিনতি বলল, "আচ্ছা, আপনার কাছে এল্ মুখার্জীর ইংলিশ হিস্ট্রীর নোট আছে? নেই? আহা, ভুলে গেছলুম আপনি কলেজে পড়েননি। আমি কিন্তু এইবার কল্‌কাতা গিয়ে ডাইওসিসানে ভর্তি হব।"

এমনি করে সুবলবাবুর দুই কন্যার সঙ্গে উজ্জয়িনীর আলাপ পরিচয় হল। এবং মলিনা আশা দিয়ে গেল যে সে শীঘ্রই একদিন আসছে। মিনতির ভাব দেখে বোধ হল সে উজ্জয়িনীকে দেখে নিরাশ হয়ে ফিরল। বিলেত-ফেরতের মেয়ে, অন্তত ইংরেজীটা বলতে পারা তার পক্ষে মাতৃভাষার মতো হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মিনতিরা যতবার চার ফেলে মাছটি কোনোবার ধরা দেয় না। উজ্জয়িনী একটিও ইংরেজী কথা ব্যবহার না করে শুদ্ধ বাংলায় বাক্যালাপ করল। মিনতি বোধ হয় ভাবছিল যে বাদলটা যাকে তাকে বিয়ে করে ঠকে গেছে, বিশেষ যখন এক পাড়াতেই মিনতির মতো মেয়ে রয়েছিল। কেন, উজ্জয়িনীর চাইতে সে কিসে কম যায়? উজ্জয়িনীকে সে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে

তার বাবা হাইকোর্টের ভকিল ও ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিক্। মেয়েকে তিনি বিলেত পাঠাতেও পারেন। তবে মাকে রাজি করানো শক্ত। মিনতি যতক্ষণ বক বক করছিল মলিনা ততক্ষণ তন্ময় হয়ে যোগানন্দ-প্রেরিত "Jesting Pilate"এর পাতা ওল্টাচ্ছিল ও মুখ টিপে টিপে হাসছিল। উজ্জয়িনী যে এ জাতীয় বই পড়ে বুঝতে পারে এ বিষয়ে তার হয়তো সন্দেহ ছিল, তবুও স্থানে স্থানে সমঝদারের মতো লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন দেখে সে উজ্জয়িনীর বিদ্যার প্রতি মোটের উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল। অন্তত তার ভাব থেকে উজ্জয়িনীর তেমন অনুমানের কারণ ছিল।

ওরা চলে গেলে উজ্জয়িনী কতকটা আশ্বস্ত হল। মলিনা বীণা নয়, বীণা বলতে যত কিছু বোঝায় মলিনার মধ্যে তার অল্পই আছে, তবু মন্দের ভালো। বীণা যদি উজ্জয়িনীকে প্রত্যাখ্যান করে তবে মলিনা তার অবলম্বন। আর কিছু না হোক্ মলিনার সঙ্গে বিদ্যাচর্চা তো করা যেতে পারে। যদিও উজ্জয়িনীর মনটা সম্প্রতি জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গের প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল হতে অভিলাষ ছিল সিস্টার নিবেদিতার মতো কোনোরূপ লোকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করবে। হঠাৎ ভ্রান্তের মতো বিয়ে করে বসল। বিয়ের স্বরূপ তো এই। উজ্জয়িনী তপস্বিনী হবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এত শীঘ্র নয় অবশ্য। বছর তিন চার স্বামীর প্রতীক্ষা করবে। তার পর একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, যদি স্বামী না ফেরে কিংবা ডাক না দেয়।

যদি ফেরে কিংবা ডাক দেয় তবে?—ভাবতে উজ্জয়িনী লজ্জায় থর থর করে কাঁপে। না, সে সুখের তুলনা নেই। উজ্জয়িনী ধন্য হয়ে যাবে। বীণার মতো চব্বিশ ঘণ্টা পাগলামি করবে। বাদল যা ভাবে ভাবুক।

কিন্তু দূর হোক্ এ সব বাজে চিন্তা। বাদল হয়তো এতদিনে কোনো 'স্বদেশিনীর' প্রেমে পড়েছে।

১১

মেল্-ডের একদিন আগে মহিমচন্দ্র বললেন, "বাদলকে কিছু লিখবে, মা? অবশ্য জবাব পাবে স্থধীর।"

উজ্জয়িনী বলল, "থাক্, বাবা। তাঁর ধ্যানভঙ্গ করব না। সোজা স্থধীবাবুকেই কিছু লেখবার আছে তাঁর পত্রের উত্তরে।"

মহিম খুশি হলেন। বাদলের এটা ব্রহ্মচর্যের বয়স, গার্হস্থ্যের দেরি আছে। তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসবান। যদিও নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেননি তবু গৃহিণীর অভাবে তাঁর গার্হস্থ্যও তো অসিদ্ধ। তাঁর চিত্তে ভোগৈশ্বর্যের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি নেই। পুত্রের শিক্ষার কাঞ্চনমূল্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে কলির অধ্যাপকরা নিষ্ক্রয় দাবী করছে বলে। নতুবা কামিনী কিংবা কাঞ্চন কোনটাই বা তাঁর প্রেয়?

উজ্জয়িনী বাদলের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে চায় না, এজন্যে যোগানন্দের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জাত হল। কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা তো বহু পিতা দিয়ে থাকেন, এমন চরিত্রশিক্ষা এ যুগে বিরল।

উজ্জয়িনী স্থধীকে লিখল :—

"আমি পাটনা এসেছি, খবর রাখেন? যে সে শহর নয়, পাটলীপুত্র তিনটি হাজার বছর এর বয়স। তার থেকে একটি হাজার বছর এ নগরী বিশাল ভারতের রাজচক্রবর্তীদের রাজধানী ছিল। আপনাদের লণ্ডনের এত দীর্ঘকাল এরূপ সৌভাগ্য হয়নি

এর মাটি মাড়িয়ে চিরকালের জন্যে পবিত্র করে দিয়ে গেছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, আর রাজর্ষি অশোক। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত ইত্যাদি কত পরাক্রান্ত পুরুষ, কত দার্শনিক, কত কবি, কত জ্যোতির্বিদ এবং হিউয়েন্‌ৎ সাং ফাহিয়েনের মতো কত তীর্থযাত্রী। কল্পনাও পরাস্ত হয়, ইতিহাস তো স্মৃতির কঙ্কাল মাত্র। আমি অবসর সময়ে যতবার এই নগরীর অতীতচিহ্নহীন সিন্দূরকঙ্কণহীন বিধবা মাটির দিকে তাকাই ততবার আমার সমগ্র সত্তা এর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। এর গায়ে পা ঠেকেছে, সেই কি কম অপরাধ? অথচ এমন কুৎসিত শহর আমি অল্পই দেখেছি। যারা একে কুৎসিত করে রেখেছে তারাই কুৎসিত। এই সব বালখিল্যের কল্পনা অল্প একটুখানি বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যৎ অবধি মোরগের মতো ওড়বার ভান করে। হয়তো এই পুণ্যভূমির কোনো অদৃশ্য স্থানে কোনো শাক্যসিংহ তপস্যা করছেন। কিন্তু বাইরে থেকে আমরা যাঁদের হাঁক ডাক শুনি তাঁরা ক্ষণজন্মা নন, ক্ষণজীবী। আমার শ্বশুরের সঙ্গে যাঁরা গল্প করতে আসেন তাঁদের হয়তো অন্য সমস্ত গুণ আছে, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আশা ও কল্পনা তাঁদের পূর্বপুরুষদের সমতুল নয়।

এত অল্প দেখে এত বড় বিষয়ে মত জাহির করতে আমার সাহস হয় না, তবু আমার যা সত্য ধারণা তাই আপনাকে জানালুম। ক্ষমা করবেন তো? দয়া করে দোষ ধরবেন না।

আপনার বন্ধুর অসাধ্যসাধন তাঁর প্রতি আমাকে সশ্রদ্ধ করেছে। কিন্তু কিসে যেন আমাকে পীড়া দিচ্ছে। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের হাত-খরচের টাকা, তার উপর অন্যের হাত খাটানো অন্যায়। বিবাহসূত্রেও একজনের হাত-খরচের টাকা অন্য জনের হয় না, হওয়া

অনুচিত। কাজেই তিনি তাঁর জীবনের যেমন খুশি বিলি ব্যবস্থা করলে আমার একটি কথা বলবার অধিকার নেই।

আমার বিয়ে আমার জীবনের সমস্ত ওলট পালট করে দিয়েছে। আগে আমি ঠিক করে রেখেছিলুম লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করব, যেমন সিস্টার নিবেদিতা করেছিলেন। সে আদর্শ কোথায় উবে গেছে। আমাকে টানছে নামপরিচয়হীন ভগবদ্‌ভক্তের জীবন। কিন্তু আপনার বন্ধুর প্রতি কী একটা কর্তব্য আমার আছে—এ আমার সংস্কার থেকে বলছে। যুক্তি এক্ষেত্রে খাটছে না। একটি প্রতিবেশিনী মেয়েকে রোজ দেখি, আপনি হয়তো তার স্বামীকে চেনেন। থাক্, নাম করব না। তার স্বামীই তার ভগবান। শাস্ত্রে লিখছে শুধু তার কেন, সব মেয়ের পক্ষে তাই। এত বড় একটা কথা কি কখনো মিথ্যা হতে পারে? আমার সাহস হয় না ভাবতে।

পড়েছি দোটানায়। যদি স্বামীর জন্যেই প্রস্তুত হই—যা আমার পিতা মাতা, আমার শ্বশুর, আমাদের সমাজ আশা করেন—তা হলে একদিন নিরাশ হব। স্বামী হয়তো ফিরবেন না এবং তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে দেখব তিনি আমাকে চেনেন না ও চান না। পক্ষান্তরে যদি নিজের আদর্শ অনুসরণ করে পারমার্থিক জীবনে মনোনিবেশ করি তা হলেও একদিন বিপন্ন হব। স্বামী ফিরবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন কেন আমি তাঁর জন্যে লৌকিক আদর্শ অনুযায়ী প্রস্তুত থাকিনি।

এই সব ভাবি কিন্তু কাউকে বলতে পারিনে। আপনাকে বলে মনটা হালকা হলও বটে, আবার এই সম্ভাবনাও থাকল যে আপনি প্রসঙ্গটা আপনার বন্ধুর কানে তুলবেন। বাবাকে লিখেছিলুম কেন এতদিন তিনি আমাকে ভগবান ও ভাগবত উপলব্ধির কথা বলেননি।

তিনি তার উত্তরে একখানি চটুল ও চাতুর্যপূর্ণ বই পাঠিয়েছেন—"Jesting Pilate" এবং লিখেছেন, তোর শ্বশুরের বয়সে যা স্বাভাবিক তোর বয়সে তা morbid. ভূত ছাড়ানোর জন্যে যেমন রোজার দরকার হয় ভগবানকে ছাড়াবার জন্যে হয় বৈজ্ঞানিকের। এই লেখকটি বৈজ্ঞানিকের পৌত্র ও নিজেও বৈজ্ঞানিকমনা। ইনি যদি বিফল হন তবে আমাকে stethoscope নিয়ে পাটনা রওনা হতে হবে। তোর শ্বশুর নানা জাতীয় সাত্ত্বিক আহার্যের সঙ্গে তোর মস্তিষ্কটিতেও দন্ত-প্রয়োগ করছেন নাকি? এই তো সেদিন এখান থেকে গেলি। এরি মধ্যে ভগবানে পেয়েছে! চলে আয়, চলে আয়।

যা কোনো দিন আশঙ্কা করি নি তাই ঘটতে যাচ্ছে। পিতাপুত্রীর মতভেদ। আমার বাবা যে আমার কী ছিলেন কেমন করে তা বোঝাব? আমি শুধু তাঁর দেহের সৃষ্টি নই মনের সৃষ্টিও। তবু দেখছি তাঁর কাছে আমাকে বিদ্রোহী হতে হবে।"

কুশল প্রার্থনা করে ও মার্সেল সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে পরিশেষে উজ্জয়িনী লিখল, "চিঠিখানা বড়ই গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল এবং আমার বয়স স্মরণ করে আপনি এতে পাকামির গন্ধ পাবেন। কিন্তু জানেন, অল্প বয়স থেকে আমি সঙ্গীমাত্রহীনভাবে একা থেকেছি, তাই আমোদপ্রমোদে ও হাস্যপরিহাসে সময়ক্ষেপ না করে কেবল পড়েছি ও ভেবেছি। অন্যান্য অবয়বের তুলনায় মস্তিষ্ক যদি কিছু বেশী পরিণতি পেয়ে থাকে তবে সেটা হয়তো আপনার চোখে বিসদৃশ ঠেকতেও পারে। তা বলে ভাববেন না যে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র শীর্ণ শুষ্ক খর্ব ক্ষীণ। মা গো, দিনকের দিন এমন মোটা হতে লেগেছি যে আপনার বন্ধু দেখলে হয়তো এই এক দোষে চিনতে দ্বিধাবোধ করবেন।"

তাড়াতাড়ি ডাকে না দিলে সে সপ্তাহে যেত না। ডাকে দেবার পর একে একে কত ত্রুটি উজ্জয়িনী স্মৃতিসমুদ্রে নেমে ডুবুরির মতো উপরে তুলল। তাই নিয়ে তার অনুশোচনার অবধি রইল না। নিজের লেখার নিজেই যত কদর্থ করল সবগুলি যে সুধীবাবুও করবেন তার আর সন্দেহ কী!

এই সময় বাদলের মটো তার চোখের ভিতরে দিয়ে মর্মে প্রবেশ করল। "Repentance is a sin." বটে? উজ্জয়িনী তা হলে পাপ করছে? শাস্ত্রেও বলেছে গতস্য শোচনা নাস্তি। তবু এ দোষ উজ্জয়িনীর স্বভাব থেকে যায় না কেন?

বাদলের দেওয়া বীজমন্ত্রটিকে সে এখন থেকে জীবনের মূলধন স্বরূপ খাটাবে। বাদল তার দীক্ষাগুরু। সে পশ্চাতে ভ্রূক্ষেপ না করে দ্বিধাহীনভাবে এগোতে থাকবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত। কে কী মনে করবে সে কথা মনে করাই তো অনুশোচনার গোড়ার কথা। আচ্ছা, যে যা মনে করে করুক। উজ্জয়িনী যদি ভুলও করে ফেলে তবু অনুশোচনা করবে না, শুধু ভুলটার সংশোধন যদি সম্ভব হয় তবে করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে অমন ভুল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবে।

১২

উজ্জয়িনী শ্বশুরকে বলল, "বাবা, আমি এখন থেকে নিরামিষ খাব।"

মহিমচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। এ মেয়ের মুখে এমন কথা! দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! এর রক্তমাংস খুঁড়লে কত রকম অখাদ্য বংশানুক্রমিকভাবে স্তর-কে স্তর উদ্ধার করা যায়। এ কিনা বলে নিরামিষ খাব।

মহিম বলেন, "হা হা হা হা! কে তোমাকে ও মতি দিল, মা?

তোমার বয়সে আমরা কী খেতে বাকী রেখেছি? যে বয়সের যেটা। ও সব পাগলামি আরো তিরিশ বছর তুলে রাখ, মা।"

উজ্জয়িনী তার জেদ ছাড়ল না। সে জীবহিংসা করতে পারবে না, তাতে অশোকের স্মৃতির প্রতি অপমান হয়, বুদ্ধদেবের মহাবোধি-লাভের মর্যাদা থাকে না।

মহিমচন্দ্র প্রমাদ গণলেন। সাহেবসুবোকে বাড়িতে ডাকার সৌভাগ্য ঘটে উঠবে না। স্বয়ং হোস্টেস হলেন ভেজিটেরিয়ান। এ মেয়েকে কেউ খেতেও ডাকবে না। সবাই টিটকারী দেবে। বলবে, আই-সি-এসের এমন বৌ? যোগানন্দই বা কী ভাববেন! ভাববেন, মহিমের কুশিক্ষা। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বাঘ যদি হঠাৎ নিরামিষাশী হয় তবে কি তার শরীর থাকে?

তবু তিনি মনে মনে খুশিও হলেন। এখন থেকে তাঁকে আর লুকিয়ে সাত্ত্বিক আহার সারতে হবে না।

বললেন, "আচ্ছা খাবে খাও, কিন্তু গোঁড়ামি কোরো না। কাউকে খেতে ডাকলে তার সঙ্গে আমিষ খেতে হবে।"

উজ্জয়িনী কথা দিতে না পেরে চুপ করে থাকল। মহিম ভাবলেন ওটা সম্মতির লক্ষণ।

নিরামিষ আরম্ভ করে উজ্জয়িনীর খাওয়া কমে গেল। মুখরোচক হয় না। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে দুধ বা মিষ্টান্নও খায় না। সেই সময়টা ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল, উজ্জয়িনীরও হল।

সর্বাঙ্গে বেদনা। মাথা ব্যথা। অকারণ শীতে গা কাঁপা। উজ্জয়িনী বিছানায় পড়ে না পারে কিছু পড়তে না পারে গুছিয়ে ভাবতে। ডাক্তার দেখে যায়। মহিম বলেন, "নিরামিষ খাওয়া তোমার বয়সে নিরাপদ নয়। এখন থেকে আমি একাই খাব।"

উজ্জয়িনী চোখ বুজে যাতনায় ছটফট করছিল। বারম্বার পাশ ফিরছিল, গায়ের লেপ পা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল ও হাত দিয়ে টেনে তুলছিল। ঝি-রা পা টিপে দিতে আসে, উজ্জয়িনী তাদের ফিরিয়ে দেয়। পরের সেবা নিতে তার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মীয়ের সেবা তবু সহ্য হয়।

কে এসে তার শিয়রে বসল ও তার কপালে হাত রেখে উত্তাপের পরিমাপ করল। উজ্জয়িনী চমকে উঠে বলল, "কে?" কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় চোখ মেলতে পারল না।

"কে?"

"আমি।" সলজ্জ কণ্ঠস্বর।

"কে আপনি? মাপ করবেন, চিনতে পারছিনে। মলিনা?"

"বীণা।"

উত্তেজনার আতিশয্যে উজ্জয়িনী এক উদ্যমে উঠে বসল। কিন্তু এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ছিন্নমূল তরুর মতো ভেঙে পড়ল। সেই সুযোগে বীণা তার মাথাটি নিজের কোলের উপর অতি ধীরে তুলে নিল। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করল। এবং আবেশে তার শরীর অসাড় হয়ে এল। তার চুলগুলিকে একত্র করতে করতে বীণা তার মনের কথা নিজের আঙুলের ডগা দিয়ে শুনতে পাচ্ছিল এবং সেই সূত্রে নিজের মনের কথা শুনিয়ে দিচ্ছিল। কোনোপক্ষে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল। স্বামীর বাড়ি ফেরার সময় হলে বীণা উজ্জয়িনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে তেমনি সলজ্জ স্বরে বলল, "কাল আসব।"

উজ্জয়িনীর প্রাণ চাইছিল বীণাকে চিরকালের মতো আটকে রাখতে। বীণার জন্যেই তো তার এই দশা। এ কথা এখনো বীণাকে শোনানো

হয়নি। কাল? কাল-এর কত দেরি! সন্ধ্যা হবে, রাত পোহাবে, ভোর হবে, স্বামী শ্বশুরকে খাইয়ে তার পরে বীণা আসবে। অসহ্য। তবু উজ্জয়িনী নির্বিবাদে মাথা সরিয়ে নিল। বলল, "বহু ধন্যবাদ।"

বীণা এই হৃদয়হীন ভদ্রতাটুকুর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এর উত্তরে যে কী বলতে হয় তাও তার জানা ছিল না। তার শিক্ষা দীক্ষা স্বল্প। কখনো উজ্জয়িনীদের সমাজে মেশেনি। সে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। অবশেষে উজ্জয়িনীর মাথার বালিশটা ও গায়ের লেপটা সাজিয়ে দিয়ে মুদিত-নয়নার কাছে করুণনয়নে বিদায় নিল।

পরদিন উজ্জয়িনীর অসুখ অনেকটা সেরে যাওয়ায় উজ্জয়িনী বিছানা ছেড়ে শোবার ঘরেই পায়চারি করছিল। হঠাৎ ঘরের কপাট ঠেলে বীণার প্রবেশ। কপাটে টোকা দিয়ে "আসতে পারে কি?" বলতে হয় এ কথা বীণার জানা ছিল না। উজ্জয়িনীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় সে বিষম অপদস্থ হয়ে চোখ নামাল।

উজ্জয়িনী বলল, "বসুন।"

বীণা সংকুচিত হয়ে কোথায় বসবে ঠিক বুঝতে না পেরে উজ্জয়িনীর বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ল। বসে একখানা ধর্মগ্রন্থের পাতা ওল্টাতে লাগল। দুএকটা জায়গা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়েও ফেলল। কিন্তু একটিও কথা বলতে পারল না। "আপনি আজ কেমন বোধ করছেন?" পর্যন্ত না।

উজ্জয়িনীও কী বলবে ভেবে পেল না। অতিথি এসেছেন। কিছু খেতে বলবে কি? বসবার ঘরে নিয়ে যাবে? কাল এই অপরিচিতার কাছে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে সেবা নিয়েছিল, ভালো করে ধন্যবাদ জানাবে কি? অভাবনীয় ভাবে পরিচয়। কার কাছে খবর পেলেন যে

আমার অসুখ করেছে?—কিংবা এমনি কিছু প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না। উজ্জয়িনী ঘেমে উঠল।

অবশেষে বীণাই কথা পাড়ল। বলল, "আপনি বাংলা বই পড়েন?"

উজ্জয়িনী বলল, "কেন ও কথা জিজ্ঞাসা করলেন?"

বীণা অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে মৌন রইল।

উজ্জয়িনী বলল, "বাংলা আমারও মাতৃভাষা।"

তবু বীণা কথা বলল না। উজ্জয়িনী দেখল বীণা আঘাত পেয়েছে। লজ্জিত হয়ে বলল, "আপনি বুঝি মনে করেছিলেন আমরা খুব সাহেবীভাবাপন্ন?"

বীণা বলল, "লোকে তো তাই বলে।"

"এবার যখন বলবে তখন বিশ্বাস করবেন না। কেমন?"

"বললে, আমি বলব, উনি 'যোগ ও সাধন রহস্য' পড়েন।"

"না, না, ছি, ছি। ও কথা ফাঁস করে দেবেন না। আমি বড় লজ্জিত হব।"

"কেন, লজ্জা কিসের? আমিও তো এই রকম বই পড়তে ভালোবাসি। কতকগুলো বাজে নাটক নভেল পড়ে লাভ কী!"

"তবে সব নাটক নভেল বাজে নয়। আপনি কি ডিকেন্সের কোনো বই পড়েছেন?"

"আমি ইংরেজী তেমন বুঝতে পারিনে, তাই। থার্ড ক্লাশ অবধি পড়েছিলুম।"

"তবে তো আমার চেয়ে বেশীই পড়েছেন—আমি সিক্স্‌থ্‌ ক্লাশ অবাধ।"—উজ্জয়িনী ভাবল এইবার বীণা তাকে সমান ভেবে আত্মীয়তা করবে।

বীণা বলল, "তা হলেও ইংরাজী আপনাদের পরিবারে কুকুর বেড়ালেও ভালো জানে। উনি জানেন কিনা আপনার বাবাকে।"

"সত্যি? বাবাকে লিখব আমি এ কথা।"

এর পরে দু'জনাতে অনেকক্ষণ ধরে কত যে কথাবার্তা। একজনের মুখে 'ভাই' সম্বোধনটি শুনতে উজ্জয়িনীর কী যে ভালো লাগছিল।

দুই মার্গ

১

এদিকে উজ্জয়িনীর যেমন বীণা ওদিকে বাদলেরও তেমনি এক বন্ধু হয়েছে। ফ্রেড্ কলিন্স্।

ফ্রেড্ কলিন্স্ কখন এসে বাদলের পাশে দাঁড়িয়েছে বাদল লক্ষ করেনি। বাদল একখানা নতুন বইয়ের ব্যর্থ সন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছিল। পার্শ্ববর্তী যুবকটি বলল, "কোন বইখানি খুঁজছেন জানতে পারি কি?"

বাদল বলল, "নিশ্চয়। Molnar's Plays."

যুবকটি উচ্চ হাস্য পূর্বক বলল, "লাইব্রেরীর এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি ঢুঁড়লেও ও-বই পাবেন না। অত নতুন বই এরা রাখবে কেন?" একটু থেমে বলল, "কিন্তু আমি আপনাকে সংগ্রহ করে দিতে পারি। কবে চান?"

"সম্ভব হলে কাল। অজস্র ধন্যবাদ।"

সেই রাত্রেই যুবকটি বাদলকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে আরো একজন কে থাকে। দুজনে থাকায় ভাড়া কম লাগে। যে অংশে যুবকটির অধিকার বাদল সেখানে বসে বইপত্র নাড়া চাড়া করল। কিন্তু বই দেখে টের পেল না যুবকটি কিসের ছাত্র। বেশীর ভাগ বই Art সংক্রান্ত, কিছু rare books, কিছু মনোবিজ্ঞানের বই।

বাদল জিজ্ঞাসা করল, "যদি কিছু মনে না করেন জানতে পারি কি আপনি কিসের ছাত্র?"

যুবকটি স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্য সহকারে বলল, "আপনিই আন্দাজ করুন।"

"আমি তো ভেবেই পাইনে।"

"আমি ছাত্রই নই। আমি বুক সেলার। এতদিন অন্যের দোকানে কাজ শিখছিলুম, সবে নিজের দোকান খুলেছি।"

বাদল বলল, "হাউ ইণ্টারেষ্টিং!" বাদলের কল্পনা দপ করে জ্বলে উঠল। আহা, তারও যদি একটি বইয়ের দোকান থাকত। দুনিয়ার বাছা বাছা বই সেখানে বিক্রী হত, বই বিক্রীর অবসরে সে নিজে সেই সব বই পড়ে শেষ করত।

কলিন্স্ তাকে দোকানে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল। বলল, "যদি কোনোদিন নষ্ট করবার মতো সময় আপনার হাতে থাকে তবে আসবেন আমার দোকানে। যত খুশি বই ঘাঁটবেন। তর্ক করবেন। আরো অনেকে আসেন।"

সিটি অঞ্চলে দোকান। একটা ছোট গলির একপ্রান্তে basement-এর ভিতর। বাদল একদিন বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হল। দেখল কলিন্স্ একা বসে কাজ করছে একটি কোণে। দুখানা ঘরে নূতন ও পুরাতন বই সযত্নে সাজানো। কতক শেল্ফের উপর, কতক টেব্লের উপর। এ ছাড়া শো-উইণ্ডোতে কিছু টাটকা বই পথিককে হাতছানি দিচ্ছে।

এক সঙ্গে অনেক বই দেখলে বাদল শোকার্ত হয়। জীবন ব্যর্থ গেল, পৃথিবীর জ্ঞান সঞ্চয় প্রায় অনাস্বাদিত রইল। প্রতিদিন মানুষের জ্ঞাতব্য স্তূপাকার হয়ে চলেছে, কিন্তু দিনের পরিমাণ সেই চব্বিশ ঘণ্টা।

বাদলকে দেখে কলিন্স্ ছুটে এল। তার হাতে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে তার কব্জির হাড়গুলোকে মটকায় আর কি রাহুর প্রেম। ছ ফুট

লম্বা ষণ্ডা ছেলে, অট্টহাসিতে ছাত ফাটায়, কথা বলে যেন গাঁক গাঁক করে। বাদলেরই সমবয়সী কিন্তু ইয়া মোটা তার হাড়, ইয়া শক্ত তার মাংসপেশী, ইয়া চওড়া তার বুক। বাদলের কান্না পেতে লাগল তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে।

কলিন্স্ বলল, "আমার সহকারীটি গেছে তার লাঞ্চ খেতে। তাই একা। আপনার খাওয়া হয়েছে ?"

বাদল বলল, "না।"

কলিন্স্ বলল, "তবে এক সঙ্গেই খেতে যাওয়া যাবে। সহকারীটি ফিরলে তার উপর দোকানের ভার দিয়ে যাব।"

কলিন্স্ বাদলকে বই পেড়ে পেড়ে দেখায়। বইয়ের ভিতরটার চেয়ে বাইরেটারই সমালোচনা করে বেশী। কারা ছেপেছে, কারা প্রকাশ করেছে, বইয়ের বাজার কেমন,—এই সব বলে। কলিন্সের অভিলাষ শুধু পুস্তক-বিক্রেতা নয় পুস্তক-প্রকাশকও হবে, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা। বাদলের দেশে—কলকাতায়—শাখা স্থাপন করতেও পারে। সবই ক্রমে ক্রমে হবে। সকলেই সামান্য থেকে আরম্ভ করে। এই দেখ না কেন, Ernest Benn এককালে কী ছিলেন, আর আজ কী হয়েছেন!

কলিন্সের বাহুতে যেমন বল, প্রাণে তেমনি অভিলাষ। নিজের হাতের জোরে সে একটা জিনিস তৈরি করে তুলছে, তার ভাগ্যের বিধাতা সে নিজে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বিকাশ পাচ্ছে। কোনো একটা বড় দোকানের বড় চাকুরে হলে এমনটি হত না।

খেতে খেতে এই নিয়ে কলিন্সের সঙ্গে বাদলের আলোচনা। কলিন্স্ বলল, "আমার ব্যবসাকে কোনোদিন আমি লিমিটেড কোম্পানী হতে দেব না। লিমিটেড কোম্পানী হওয়াটা ব্যবসায়ের

পক্ষে চরম অবস্থা। তার পরে সে হয় টিঁকবে, নয় ভাঙ্‌বে, কিন্তু বৃদ্ধি তার ঐ পর্যন্ত। টাকা? টাকা চাই বটে, কিন্তু তার চেয়েও যা চাই তা হচ্ছে কর্তৃত্ব। বৃদ্ধি চাই বলেই সর্বময় কর্তৃত্ব চাই।"

বাদল বলল, "আপনি তা হলে ডেমক্রেসীতে আস্থাবান নন, মিস্টার কলিন্স্?"

রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস্‌দের প্রতি সম্মানবশত কলিন্স্ তার স্বভাবসিদ্ধ উদ্দাম হাসিকে অতিকষ্টে চাপল। বলল, "ডেমক্রেসীর নমুনা দেখাতে পারেন?"

বাদল বলল, "কেন, ইংলণ্ড?"

কলিন্স্ আবার হাসি চাপল। চাপাহাসি মুখের এক স্থানে বাধা পেয়ে মুখের সর্বত্র চারিয়ে গেল। বলল, "ওটা আগে ছিল ছদ্মবেশী অলিগার্কী, এখন ছদ্মবেশী ব্যুরোক্রেসী। কন্‌সারভেটিভ বলুন, লিবারল বলুন, লেবার বলুন, যেই রাজত্ব করুক না কেন ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র যেমন চলছে তেমনি চলতে থাকবে। আমার মতো উচ্চাভিলাষী লোক পলিটিক্সে গিয়ে বড় জোর ঠুঁটো প্রাইম মিনিস্টার হত। তাতে আমোদ নেই, মিস্টার সেন। আমোদ আছে সার্ আলফ্রেড মণ্ড্ হওয়ায়। ব্যবসায় জগতের মুসোলিনী হওয়ায়।"

বাদল চিন্তা করতে লাগল।

কলিন্স্ বলল, "এদেশের পলিটিক্স এদেশের সর্বনাশ করছে। এর মঙ্গল এর পলিটিক্সে নেই। জনকতক বড় ইকনমিস্ট, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বিজ্‌নেস্ আইডিয়ালিস্ট—যেমন মণ্ড্—এরাই একজোট হয়ে এ দেশকে বাঁচাতে পারে। নান্য পন্থাঃ।"

বাদল বলল, "কেন অমন কথা বললেন ওর কৈফিয়ৎ দিন্, মিস্টার কলিন্স্।"

কলিন্স্ তার প্রিয় খাদ্য রোস্ট বীফ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। উত্তর করল না। কিন্তু বোঝা গেল কী একটা বলতে তার মন আঁকু-পাঁকু করছে।

বাদল সেই সুযোগে আরো একটি প্রশ্ন করল। বলল, "অমন করে একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তিকে ক' বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়; ইটালীর কথা আলাদা, ইটালী একটা বাজে নেশন, তাকে না করে কেউ ভয় না করে কেউ ভক্তি।"

কলিন্স্ এতক্ষণে মুক্তকণ্ঠ হয়েছিল। বলল, "কিন্তু ইটালীর শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা যে অসীম। বড় ইকনমিস্ট বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বড় আদর্শবাদী বণিক যদি ইটালীর জোটে তবে কোনো ব্যুরোক্রেসী তাদের পদে পদে হোঁচট্ খাওয়াবে না। যদি আমাদের ভাগ্যে জোটে—জুটেছে আমাদের ভাগ্যে—তবে আমাদের শাসনযন্ত্র হবে তাদের প্রতিকূল। আর এদেশে যে-সব রাজনৈতিক দল আছে তারা যেমন নির্বোধ তেমনি কল্পনাকুণ্ঠ এবং মেয়েমানুষের মতো হিংসুটে।" এই বলে সে হাস্যবিদীর্ণ হতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে থেমে গেল।

নারীনিন্দা শুনে বাদল বিরক্ত হয়ে চুপ করল।

২

কলিন্স্ মোটা গলায় গাঁক গাঁক করে গান করতে করতে কাজ করে। বাদল তার পাশের চেয়ারে বসে বই পড়ে। ইচ্ছা করে কলিন্সের মতো কাজের লোক হয়, কিন্তু দু একদিন শখের শিক্ষানবিশী করে দেখল দোকানদারীতে মন লাগছে না, বই পড়ার নেশা দুর্বার হচ্ছে। ময়রার দোকানে কাজ শিখতে গেলে বাদল বোধ হয় চুরি করে মিষ্টান্ন ধ্বংস করত। কোনো সত্যিকারের ময়রা তা করে না।

বাদল বই পড়ে আর থেকে থেকে তর্ক করে। কলিন্স্ চতুর ব্যবসাদার, তার দোকানের আগন্তুকদের সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। তাঁরা বই কিনুন বা না কিনুন পড়ে দেখুন। পড়ে তর্ক করুন, গল্প করুন, চা খান। কলিন্স্ সবাইকে এ কথা বলে রেখেছে। নষ্ট করবার মতো সময় যাঁর হাতে থাকে তিনিই একবার কলিন্সের দোকান হয়ে যান। তাঁদের কেউ বা প্রোফেসার, কেউ বা ব্যাঙ্কের কেরানী, কেউ ছাত্র। কলিন্সের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে ধাপ্পা দেবার কথা মনে আনেন না। কারণ একবার ধাপ্পা দিলে দ্বিতীয়বার মুখ দেখাতে পারবেন না, তাতে নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়।

কলিন্সের দোকান যেন জনকয়েক বন্ধুর যৌথ দোকান। এঁরা মূলধন খাটাননি, লভ্যাংশও পান না। কিন্তু এঁরা বই কেনার উপলক্ষে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন সেটার বহু গুণ ফিরে পান বিনা মূল্যে আরো অনেক বই পড়তে পাওয়ায় এবং দশজনে মিলে চিন্তা-বিনিময় করায়। কলিন্স্ সবাইকে খুলে বলে রেখেছে, "আপনারা এখানে যে টাকাটা খরচ করেন সেটার থেকে দোকানের খরচা ও দোকানদারের মজুরি বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে আমি আরো বই কিনি, বইগুলিকে আরো বেশী জায়গা দিই এবং আপনাদের আরামের জন্যে আরো ভালো বন্দোবস্ত করি। দোকানটি বাড়তে থাকুক এই আমার কামনা; সেই সঙ্গে আমিও যেন নেহাৎ অনাহারে না মরি।"

কাজেই দোকানটির প্রতি সকলেরই বিশেষ মমতা। একবার এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যান না বড় একটা। অন্তত একখানা বই কি পত্রিকা কেনেন। কতকগুলি বাঁধা খরিদ্দার থাকায় কলিন্সের

দোকান এই অল্প দিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সে আরো মূলধন খাটাতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরের কাছ থেকে সংগ্রহ করলে পাছে পরের মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে হয় সেইজন্যে মনের মতো অংশীদারের প্রতীক্ষা করছে। সে চায় তারই মতো বিজ্‌নেস্‌ আইডিয়ালিস্ট, যে মানুষ নিজের স্বার্থের চেয়ে দোকানের স্বার্থকে বড় করবে।

বাদলের যদি টাকা থাকত তবে বাদল কলিন্সের অংশীদার হত। কিন্তু এখনো সে তার বাবার গলগ্রহ। এজন্যে তার মাঝে মাঝে গ্লানি বোধ হয়। তখন সে কী করবে ভেবে কাতর হয়, কিন্তু লজ্জার খাতিরে সুধীদাকে বলতে পারে না, পাছে সুধীদা বাবাকে জানায়। অনুশোচনায় খাওয়া বন্ধ করে, কিন্তু না খেয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। একবেলা কিছু না খেলে অন্যবেলা দুগুণ খায়। মনকে বোঝায়, ধার নিচ্ছি বৈ তো নয়। বাবার টাকার পাই পয়সা হিসাব করে বাবাকে ফিরিয়ে দেব, মায় সুদ। তিনি যদি না নেন তো তাঁর নামে একটা লাইব্রেরী করে দেব। এই ভেবে সে হিসাব করতে বসে অদ্যাবধি তার বাবা তার দরুণ কত খরচ করেছেন। জন্মদিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত মাসে গড়পড়তা পঞ্চাশ টাকা করে ধরা যাক। তা হলে দাঁড়ায় বিলেত আসার পূর্বাহ্ণ অবধি মোট বারো হাজার টাকা। মাঝখানে কয়েক বছর সে স্কলারশিপ পেয়েছে। সেটা না হয় বাদ দেওয়া গেল। তারপর আসার সময় ও আসার পর থেকে একুনে আঠারো হাজার টাকা। সর্বমোট ত্রিশ হাজার টাকা। Compound interest হিসাব করবার মতো ধৈর্য বাদলের ছিল না। আচ্ছা, দশ হাজার টাকাই না হয় সুদ স্বরূপ দেওয়া গেল। তা হলে দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার টাকা। এখনকার বিনিময়ের হারে তিন হাজার পাউণ্ড। ভবিষ্যতে যদি এই

বিনিময় হার টেঁকে তবে মাত্র তিন হাজার পাউণ্ড তার মতো ব্যারিস্টারের এক বছরের আয় থেকে শোধ করে দেওয়া সম্ভব।

আপাতত কলিন্সের ব্যবসায় মূলধন ঢালতে হলে বাবাকে বিরক্ত করতে হয়। একে তো ভারতবর্ষীয় মূলধন "লাজুক"। তা ছাড়া ভারতবর্ষ নিজেই এখন মূলধনের অল্পতায় কষ্ট পাচ্ছে, ঘরের মূলধন বাইরে পাঠালে নিজের প্রতি অন্যায় করবে। ভারতবর্ষের প্রতি বাদলের দরদ অকৃত্রিম। তবু দে সরকার বলে, "আপনি মশাই ভারতবর্ষের কেউ নন। ভারতবর্ষের electrification ইত্যাদির জন্যে মাথা ঘামান কেন? সেটা আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে বলে?"

বাদলকে ওরা ইচ্ছা করে ভুল বোঝে। ক্ষ্যাপায়। ব্যঙ্গ করে। বলে, "শাসিতের দল ছেড়ে শাসকের দলে ভর্তি হয়ে অনেক সুবিধা আছে, সেন সাহেব। কিন্তু তাতে নূতনত্ব নেই। বছর পঞ্চাশ আগে জন্মালে বাহবা পেতেন। কিন্তু এটা গান্ধী-যুগ। এ যুগে স্বয়ং শাদা চামড়ার অধিকারী অধিকারিণীরা ভারতীয় হতে পারলে ধন্য হয়।"

বাদল যত বলে, "আমি ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স থেকে ইংরেজ হচ্ছিনে, গভীরতম অভিরুচি থেকে হচ্ছি", ওরা ততই ক্ষ্যাপায়। বলে, "যদি বুল্‌গেরিয়ান হতেন, হাঙ্গেরিয়ান হতেন, চেক হতেন তবে প্রমাণ হত গভীরতম অভিরুচি বটে।"

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকা-ফেরৎ বাঙালী ছাত্র ছিল। সে বলে, "সেন সাহেব কিন্তু ঘোড়দৌড়ের দিনে ভুল ঘোড়ার উপর বাজী রাখছেন। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একে একে নিবিছে দেউটি। আর পঞ্চাশ বছর পরে ইংলণ্ড হবে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। সময় থাকতে আমেরিকান হন, মিস্টার সেন। তা যদি না পারেন, তবে রাশিয়ান।"

বাদল তাদের বিশ্বাস করাতে পারে না যে তার ইংলণ্ডপ্রীতির হেতু আর যাই হোক এটা নয় যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের মালিক কিংবা পৃথিবীর সেরা নেশন। ইংলণ্ড যদি কাল ভারতবর্ষের অধীন হয় তা হলেও সে ইংরেজ থাকবে। Lafcadio Hearn যে কারণে জাপানী সেও সেই কারণে ইংরেজ। সেই কারণটি হচ্ছে মনের পক্ষপাত।

কলিন্সের সঙ্গেও তার এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। কলিন্স্ বলে, "ইংলণ্ডে বহু বিদেশী বাসা বেঁধেছে—ইহুদী, আর্মিনিয়ান, গ্রীক, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান। গত শতাব্দীতে যতগুলো বিপ্লব হয়ে গেছে ইউরোপের নানা দেশে, তার প্রত্যেকটাতে কিছু না কিছু পলাতক ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে ও অবশেষে ইংরেজ হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে হল রাশিয়ায় বিপ্লব, ইংলণ্ডে আজ রাশিয়ান শরণাগত বহু সহস্র। ভারতবর্ষেও একটা বিপর্যয় অনিবার্য, ভারতবর্ষ থেকেও দলে দলে পলাতক আসবে এবং তাদের আশ্রয় দিতে আমরা ধর্মত বাধ্য।"

বাদল মর্মাহত হয়ে বলে, "কিন্তু আমি তো পলাতক নই, আশ্রয় চাইনে। আমি প্রেমিক, আমি চাই গৃহ। ভারতবর্ষে থেকে আমি কর্মী ও নেতা হতে পারতুম, এখনো ফিরে গিয়ে হতে পারি। কিন্তু ওতে আমার তৃপ্তি হবে না। আমি থাকব সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থলীতে। আমি বাসিন্দা হব সেইখানকার যেখান থেকে ও যেখানে এসে চিন্তা ও কর্মের বিশ্বব্যাপী প্রবাহ আরব্ধ ও অবসিত হচ্ছে। জীবনের প্রতি আমার মনোভাব ইংরেজের মনোভাবের সদৃশ। তাই আম ইংরেজ।"

কলিন্স্ রসিকতা করে বলে, "সাবাস্। কিন্তু আমাদের এই খেয়ালী ওয়েদারকে বরদাস্ত না করতে পেরে শেষকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোরো না, সেন।"

৩

দিবারাত্র একটা অনবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে বাস করতে করতে বাদল সুধীকে ভুলল। সাতদিনে একবারও দেখা হয় না। সুধী ফোন করলে অন্যে ফোন ধরে, বাদল বাড়ি থাকে না। বাদল ফোন করলে কেবল বলে নতুন কার সঙ্গে আলাপ হল ও তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে তর্ক হয়ে গেল। এতে সুধীর সন্তোষ হয় না। সে বাদলকে আরো গভীর ভাবে জানতে ও পেতে চায়।

আগের মতোই সে বন্ধুবৎসল আছে, দিনান্তে অন্তত একবার তার বাদলকে মনে পড়ে। বাদল আজ কী করল কী ভাবল কী ভাবে দিনটির ও নিজের পরিচয় পেল—বাদলকে শুধাতে চায়, পাটনার মতো। বেশীদিন আগের কথা তো নয় যখন তারা পরস্পরকে নিজ নিজ জীবনের নূতনতম উপলব্ধির অংশ দিত। তখনকার দিনে তাদের জীবনে ত্বরা ছিল না, দুবেলা নব নব অতিথির আকস্মিক আগমন ঘটত না, তাদের জগতের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দুই। বিলাতে এসে সুধী নিজের জগৎকে জনবহুল করেনি, তার পরিচিত ও আলাপীর সংখ্যা একাধিক হলেও তার বন্ধু যেটি ছিল সেটিও আর নেই। মনের কথা যেই পুঞ্জীকৃত হয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করে অমনি সে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখতে বসে। তবু বাদলের স্থান পূরণ হয় না।

বাদলকে একদিন সুধী বহুকষ্টে পাকড়াও করল। সুধী জানত বাদল রবিবার বেলা করে ওঠে। বাদলের বাড়ীর কাউকে খবর না দিয়ে সুধী এক রবিবারের সকালে সোজা গিয়ে বেল টিপল। উইল্‌স্‌রা ঐ দিনটা একটু বাদশাহী ধরনে ঘুমায়, ওদের ঘুম ভাঙল না। বেচারা বাদল তার ভাঙা ঘুম জোড়া লাগবে এই আশায় একটা পুরোনো স্বপ্নের উপসংহার রচনা করছিল, অগত্যা সেই অপ্রসন্ন মনে নিচে নেমে এল।

"তুমি!"

"চিনতে পেরেছিস এই যথেষ্ট।"

"কিন্তু বুঝতে পারছিনে।"

"তা হোক, আজ দিনটা পরিষ্কার। আয়, বাসের মাথায় চড়ে শহর বেড়াই।"

ওটা একটা নতুন আইডিয়া। বাদল উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল। কিন্তু মিসেস উইল্‌সের যখন ডাক পড়বে যখন অনুপস্থিত থাকলে যে মুশকিল। সুধীর পরামর্শ অনুসারে বাদল মিসেস উইল্‌স্‌কে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেল।

যে দিকে খুশি সে দিকে যাবে, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ বেড়াবে, ক্ষিদে পেলে কোথাও নেমে খাবে, জল এলে বাসের ভিতর ঢুকবে—এই হল তাদের সেদিনের প্রোগ্রাম।

বাদল বললে, "কতকাল তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয়নি, সুধীদা। আশ্চর্য, বাংলা এখনো অনায়াসে বলতে পারছি। এই কয়েক সপ্তাহে ভয়ানক ইংরেজ বনে গেছি।"

সুধী বলল, "ঐ নিয়ে তোর সঙ্গে আজ তর্ক করতে এসেছি, বাদল। তোকে মনে করিয়ে দিতে চাই বিলেত আসার আগে তুই ও আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারে বসে কী ব্রত গ্রহণ করেছিলুম।"

"অতীতকে মনে করে রাখতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, সুধীদা। অতীতকে মন থেকে না নড়াতে পারলে বর্তমানকে আসন দিতে পারিনে। আহূত অতিথির মতো সে দরজার বাইরে পায়চারি করতে করতে কখন এক সময় সরে পড়ে অপমানের গ্লানিতে।"

"তবে কি তুই বলতে চাস্‌ যে মানুষ তার অতীতের প্রতিশ্রুতি

ভুলবে, সংকল্প রক্ষা করবে না, ঋণ শোধ করবার সময় এলে বলবে 'কিসের ঋণ'? তোর ইংরেজরাও এই কথা বলেন নাকি?"

বাদল ইন্‌ডিগ্‌ন্যান্ট্‌ হয়ে বলল, "ইংরেজ কখনও কথার খেলাপ করে না। রাশিয়া যেমন ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ করল, তারপর ঋণটি করল অস্বীকার, ইংলণ্ড তেমন করে না, করতে পারে না।"

"অত উত্তেজিত হস্‌ কেন? আমি কি এমন আভাস দিয়েছি যে ইংলণ্ড আমেরিকার হাত পা ধরে ঋণের বহরটা লঘু করবার চেষ্টায় আছে এবং তার সেই কাকুতি মিনতির স্বপক্ষে রকমারি যুক্তি দেখাচ্ছে?"

বাদল রীতিমতো ক্ষেপে গেল। সুধী বলল, "এই চুপ, চুপ, চুপ, পাশের বেঞ্চির লোকগুলো ভাববে কালো মানুষগুলো বাঁদুরে ভাষায় বিষম বচসা করছে!"

বাদল বলল, "ভারি তোমার ভালো মানুষ আমেরিকা। শাইলকের অবতার। মানুষের বিপদে সাহায্য করে মহত্ত্বের ভড়ং করলেন। এখন চান মোটে একটি পাউণ্ড মাংস।"

দিনটি সত্যিই স্নিগ্ধরৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। ইংলণ্ডের শীতকালে এমনটি হয় না। সুধী ও বাদল উভয়েরই মনের উপর থেকে একটা পর্দা উঠে গেছল।

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দুজনে দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল। লণ্ডনের স্থলে স্থলে বহু পুরাতন পার্ক কিংবা বাগান থাকায় ঋজু দীর্ঘ বীচ বার্চ ওক্‌ প্রভৃতি বৃক্ষের সঙ্গে পঞ্চাশবার দেখা হয়ে যায়। মানুষের তুলনায় ওরাই সূর্যের আলোর বেশী সমঝদার। সুধী ওদের দিকে ও বাদল পথিকদের দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করল। একজনের পক্ষপাত প্রকৃতির প্রতি, অপরজনের পক্ষপাত মানুষের প্রতি। সুধী ভাবে, এই যে ওক্‌ ফার পাইন গাছগুলি এরা কোনো ইংরেজের চেয়ে কম নয়, দেশ এদেরও

দেশ, হয়তো এদেরই বেশী, কারণ দেশের মাটিকে এরা সাতপাকে জড়িয়েছে এবং দেশের আলো হাওয়া সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশী করে এদেরি অঙ্গে ঝঙ্কার তোলে। মানুষের সংসারে মানুষ নিজেকে অত্যন্ত বড় বলে বিশ্বাস করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু বিশ্বসংসারে মানুষ অসংখ্য জাতির মধ্যে একটি জাতি এবং এই কথা মনে রেখে তার বিনয়ী হওয়া ভালো। বাদল ভাবে, জয় মানুষের জয়। যা-কিছু দেখছি সব মানুষের হাতের ছোঁয়া ও মগজের ছাপ নিয়ে মূল্যবান হয়েছে, নইলে ঝুটা দলিলের মতো তারা থেকেও থাকত না। এই দেশের মাটি জল আকাশ এ দেশের মানুষের স্বাক্ষর বহন করে যা-কিছু বিশেষত্ব পেয়েছে, নইলে আমি ইংলণ্ডে জন্মাতুমও না, আসতুমও না।

রবিবারের সকাল। দিনটিও উজ্জ্বল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ পার্কের অভিমুখে চলেছে। যারা পেরেছে তারা কাল সমুদ্রকূলে গেছে; যারা পারে তারা আজও যাচ্ছে, যারা পারে না তাদের যাবার মতো জায়গা লণ্ডনের বৃহদায়তন বৃক্ষগহন অসমতল উপবনগুলি। হ্যাম্পস্টেড্ হীথ, কেনউড, রিজেণ্টস্ পার্ক, সাউথ কেনসিংটন, হাইড পার্ক। প্রত্যেকটাতে লোকারণ্য। তবু ঘাসের উপর ঝোপের ভিতর প্রণয়ী প্রণয়িনীরা অর্ধশয়ান রয়েছে এবং তাদেরই কাছ দিয়ে বয় স্কাউট্‌রা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

দলে দলে সৈনিক শোভাযাত্রায় চলেছে। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজছে। বাচ্চারা আগে ভাগে ও বুড়োবুড়ীরা পিছু পিছু চলেছে। ফুটপাথ দিয়ে ঠেলা গাড়িতে চড়ে যাচ্ছেন হাত-পা ভাঙা দ কিংবা নবজাত শিশু। সামরিক সংস্কার বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু থেকে শিশুতে সংক্রামিত হচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে গেল সৈনিকের মতো সার বেঁধে ও পা ফেলে কালো ইউনিফর্ম পরা বালিকার দল। ওরা গির্জায় যাচ্ছে। ফুটপাথের খোঁড়া ভিখারী

ও হাতকাটা ভিখারী এতক্ষণ হাত দিয়ে ও পা দিয়ে ছবি আঁকছিল, কার্টুন আঁকছিল। শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়েছে। তাদের ছবি দেখার ভান করে কোনো দয়ালু ভদ্রলোক তাদের চিৎ-করে-রাখা টুপিতে দুটি পেনী ফেলে দিয়ে গেছেন।

৪

সুধী বলল, "বাদল, জীবনের সঙ্গে flirt করার নাম বাঁচা নয়। এ তুই করছিস্ কী? জীবনের কাছে একদিন যে অঙ্গীকার করেছিস অন্যদিন তা মনেও আনবিনে?"

বাদল অবাক হয়ে বলল, "সুধীদা, তুমি কোন অঙ্গীকারের কথা বলছ?"

এরূপ প্রশ্নের জন্যে সে প্রস্তুত থাকেনি। Woolworth-এর মুড়ি ও মুড়কির মতো সব জিনিস এক দরে বিক্রী করবার দোকান দেখে চিন্তা করছিল, একই কোম্পানীর এক জাতীয় chain store আজ লণ্ডনের সর্বত্র। কাল পৃথিবীর সর্বত্র ছাইবে। এই সব chain store বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে দ্রুতগতিকে একটা economic unit করে তুলছে। পৃথিবীকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধবার এ এক অভিনব শিকল। নাইবা থাকল এর পিছনে আদর্শ। বিনা আদর্শবাদে যদি জগতের প্রগতি হয় তবে কী দরকার আদর্শবাদের?

ঐ শোভাযাত্রার কুফল ফলবার আগে এই সব chain store-এর সুফল ফলবে। যুদ্ধ করতে গিয়ে ব্যবসার ক্ষতি করতে কেউ রাজি হবে না। স্বার্থপরতা দিয়ে জগতের স্থায়ী মঙ্গল হবে, স্বার্থত্যাগ দিয়ে যা হয়েছে তা ক্ষণকালীন।

এমন সময় সুধীর খাপছাড়া প্রশ্ন শুনে বাদলের চিন্তার খেই গেল হারিয়ে।

সুধী বলল, "কথা ছিল আমরা দুই স্বতন্ত্র পথ দিয়ে একই সত্যের অভিসারী হব। তুই নিবি ইনটেলেক্‌টের মার্গ, আর আমি ইন্‌টুইশনের মার্গ। এবং দুজনেই রইব শেষ পর্যন্ত অনভিভূত অনুত্তেজিত ও মোহমুক্ত। তার বদলে এ কী দেখছি? দেখছি তুই পথভ্রষ্ট হয়ে চোরা গলিতে পা দিয়েছিস ও ইচ্ছাপূর্বক মাদক ব্যবহার করছিস।"

বাদল বলল, "থাম। চার্জগুলো একে একে শোনাও এবং বোঝাও।"

"এক নম্বর চার্জ এই, যে, ইংরেজ হবার জন্যে আদা নুন খাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই, ওটা অপথে চলা।"

"আমি নট-গিল্‌টী।"

"বেশ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

বাদল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার কাজের কারণ নিশ্চয় আছেই, কিন্তু কাজের পর কাজ জমে উঠে কারণটাকে কোন পাতালে চাপা দিয়ে fossilএ পরিণত করেছে। এখন স্তরের পর স্তর খুঁড়ে মৃত ও জীর্ণ কারণকে অবচেতনার "hades" থেকে চেতনার প্রাণলোকে উত্তীর্ণ করা যাক।

বাদল মনোরাজ্যের দিকে দিকে মোটর হাঁকিয়ে দিল। ফেরার কারণটাকে পাকড়াও করে আনা চাই-ই, নইলে মুণ্ড নেবে।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তারপর বসে পড়ে বলল, "তুমি ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে সত্যের পরিচয় নেবে, ঠিক করেছ। ওর বিপরীত হচ্ছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি। ইংরেজের চোখে জীবনকে কেমন দেখায় তাই জানবার জন্যে আমার ইংরেজ হওয়া। নইলে তুমি কি মনে কর,

স্থধীদা, যে ইংরেজী পোশাক ও ইংরেজী চালএর প্রতি vulgar অনুরাগবশত আমি বিলিতি বাঁদর সেজেছি ?”

স্থধী বাদলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “রাগ করিসনে, বাঁদর। কিন্তু পোশাকের বাঁদরামির চেয়ে আত্মার বাঁদরামি আরো শোচনীয়, আরো সাংঘাতিক। মনে কর্ হাতীর সাধ গেছে পাখীর জীবনের স্বরূপ দেখবে। সে কেমন মূর্খতা বল্ দেখি।”

বাদল স্থধীর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, “হাতীর অমন সাধ যায় না, যেহেতু সে অনিবার্যভাবে হাতী। তুমি কি জোর করে বলতে পার, স্থধীদা, যে তুমি ও আমি অনিবার্যভাবে ভারতীয় ?”

“অর্থাৎ ?”

“অর্থাৎ আমরা হিন্দু হয়ে জন্মিয়েছি বলে আমরণ আমরা হিন্দু থাকতে বাধ্য ? ভারতবর্ষে জন্মিয়েছি বলে অন্য দেশের সিটিজ্‌ন্ হতে পারিনে ? সমস্ত সভ্য দেশে naturalisationএর ব্যবস্থা আছে, এই ইংলণ্ডেই কত বিদেশীকে ইংরেজ হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এ জাতীয় ব্যাপার ভূরি ভূরি। সমস্ত সভ্যদেশে বিদেশিনীকে স্বামীর ন্যাশনালিটী দেওয়া হয়, এর পিছনে কি একটা সহজ সত্য নেই, স্থধীদা ?”

স্থধী হেসে বলল, “ওগুলো সম্পত্তির ও সন্তানের খাতিরে। আত্মার খাতিরে যে নয় তা জোর করে বলতে পারি, বাদল। তুই তেমন ইংরেজ হলে আমি আপত্তি করতুম না রে। তবে শ্রীমতী উজ্জয়িনীর দশা ভেবে বিচলিত হতুম। সে যে ক্রমেই ‘কট্টর’ স্বদেশী হয়ে উঠছে।”

বাদল কৌতূহল চেপে গম্ভীরভাবে বলল, “তাঁকে আমি নিষ্কৃতি দেব, স্থধীদা।” তারপরে কৌতূহলের উপর থেকে চাপ তুলে নিল। বলল, “তাঁর কাছ থেকে খুব চিঠি পাও বুঝি ?”

"পাই বৈ কি। তবে চিঠিগুলো আমাকে উপলক্ষ করে যাকে লেখা তার হাতে দিতে পারলে খুশি হই।"

"না, না, না।" বাদল সাতঙ্কে বলল। "ওসব মেয়েলি বাংলা চিঠি পড়বার সময় বা শখ নেই আমার। জবাব যখন লিখতে পারব না তখন শুধু পড়েই বা করব কী! একটা কথা তোমাকে বলি, স্থধীদা, আমি ওঁর পাতিব্রত্যকে প্রশ্রয় দিতে চাইনে। বরঞ্চ উনি আমার উপর রাগ করে আমাকে ত্যাগ করুন ও ভুলুন এই আমার মনোবাঞ্ছা।"

স্থধী বলল, "কিন্তু বাদল, ওর দিকে যা আছে তা পাতিব্রত্যের চেয়ে সরস।"

"না, না, না, স্থধীদা। তাকেও আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না। আমি ভালোবাসা টালোবাসা জানিনে, স্থধীদা। ওটা খুব সম্ভব একটা glandular action. কার শরীরের মধ্যে কোন ক্রিয়া চলছে সে খবর নিয়ে আমার কী লাভ? আমার ইন্‌সম্নিয়া কিছু কমবে?"

আহত হয়ে স্থধী বলল, "হ্যাঁ, ইংরেজ হয়েছিস বটে ঠিক। দোকানদারের মতো লাভ লোকসান ওজন করতে শিখেছিস দয়া মায়া স্নেহ প্রীতিরও।"

বাদল তখনও ভাবছিল বিশ্বব্যাপী chain storeএর দ্বারা মানব ঐক্যের কথা। বলল, "ব্যঙ্গ কর আর যাই কর এ এক মহৎ সত্য যে, দোকানদারদের দিয়ে পৃথিবী যতটা ঐক্য পাবার ততটা পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো পাবে। ইউরোপীয় দোকানদারেরা ঘা মেরে এশিয়ার ঘুম ভাঙিয়েছে, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছে ও আফ্রিকাকে মানুষ করেছে। এই আজ রেল জাহাজ এরোপ্লেন দেশে দেশে মানুষকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, এই যে স-তার ও বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে

আমাদের সংবাদপত্রগুলি সারা দুনিয়ার তাজা খবর দু বেলা আমাদের দিচ্ছে, এ সব তো দোকানদারেরই স্বার্থপরতার দ্বারা সম্ভব হল।"

সুধী তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "সাধু, সাধু। আর কিছুদিন এই ধরনের ট্রেনিং পেলে রদারমীয়ার কি বীভারব্রুক তোকে লুফে নেবে দেখিস। যেমন পাকা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠছিস ভয় হয় পাছে লাট হয়ে বাঁকীপুরেই যাস্।"

সুধীদাও তাকে ভুল বোঝে! অভিমানে বাদলের মুখ ফুটছিল না। সুধী তার মনোভাব আন্দাজ করে বলল, "তোর sense of humour নেই, তুই কিসের ইংরেজ? চল্, কোথাও খেতে যাই।"

ভোজনের পরে বাদলের মনে পড়ল সুধীদার তার নামে আরো একটা চার্জ আছে। বলল, "তোমার দু নম্বর চার্জ কোথায়, সুধীদা?"

সুধী বলল, "থাক্, থাক্, এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বেদনা দিয়েছি। একেই তো আমার ছায়া মাড়াস নে, এর পর হয়তো আমাকে দেখে চিনতে দ্বিধা বোধ করবি।"

বাদল জেদ ধরে বলল, "না, সুধীদা, একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। নইলে তোমার ঐ কথাগুলো আমার স্মরণে খচ্ খচ্ করবে যে জীবনের সঙ্গে আমি flirt করছি।"

সুধী বলল, "ক্ষমা প্রার্থনা করি, বাদল; কথাগুলো একটু কটু হয়ে গেছে।"

বাদল অধৈর্য হয়ে বলল, "যাক্ সে কথা। এখন আস্তিন থেকে বার কর তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ।"

সুধী দুষ্টুমি করে তার আস্তিন দুটো ঝাড়ল। তার ফলে বাদল আরো চটছে অনুমান করে সে গম্ভীর হয়ে বলল, "এক দেশ থেকে অন্য

দেশে আসা সহস্র জনের জীবনে ঘটছে। কেই বা তোর মতো নেচে বেড়াচ্ছে শুনি ?"

বাদল বলল, "ঐখানেই তো গলদ। ওরা আসে 'এক দেশ থেকে অন্য দেশে।' আমি আসছি আপনার মনোমত দেশে। উত্তেজনা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মোহ বলছিলে কাকে ?"

"কোন জিনিসকে বাড়িয়ে দেখার নাম মোহ।"

"নিজের জিনিসকে মানুষ একটু বাড়িয়ে দেখেই থাকে। তা ছাড়া আমার ইংলণ্ড তো একটা আইডিয়া। যেমন তোমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া। আপন মনের সৃষ্টির সম্বন্ধে সব মানুষের দুর্বলতা আছে।"

"কিন্তু আমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া নয়, বাদল। সেখানে আমার রক্তমাংসের প্রিয়জন আছে। ওদের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। সেই টানে ওরা আমাকে এই মুহূর্তেই টানছে। এদেশে কোনো ভারতীয়কে দেখলে আমার হৃদয় প্রীতিতে উদ্বেল হয়। কিন্তু কোনো ইংরেজকে দেখলে তোর যা হয় সেটা অজানাকে জানবার উত্তেজনা ও সুলভকে দুর্লভ কল্পনা করবার মোহ। যে দরের মানুষের সঙ্গে মিশে তুই রোমাঞ্চ বোধ করিস, বাদল, তুই নিজে তাদের থেকে ঢের উঁচু দরের।"

বাদল অনুধাবন করতে লাগল। বাস্তবিকই সুধীদার অন্তর্দৃষ্টি আছে। যা বলছে নেহাৎ ভ্রান্ত নয়। তবে কিনা, তবে কিনা— বাদলের উদ্দেশ্য ও উপায় আলাদা, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আলাদা, সে যা করছে তা অন্যের পক্ষে মিথ্যা হলেও তার নিজের পক্ষে সত্য। মোহ এবং উত্তেজনা যদি বিষ হয় তবে বাদল হচ্ছে নীলকণ্ঠ; অপরে যা আত্মসাৎ করে লাভবান হতে পারে না বাদল তা পারে। গর্বে বাদলের বুক ফুলে উঠল। তার সত্যের সন্ধান সর্বজনপরিত্যক্ত পথে। মধ্যযুগে জন্মালে সে বোধ করি তান্ত্রিক হত।

বাদল আবেগের সঙ্গে বলল, "আসবে, সে দিন আসবে। আমি আমার অপথে চলতে চলতে একদিন এমন পরশ পাথর পেয়ে যাব যে এই আপাত অর্থহীন flirt করা পরম অর্থপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে। যে আগুন আমার প্রাণে জ্বলছে, স্বধীদা, তুমি আমার নিকটতম বন্ধু আজও তার তেজের পরিমাপ পাওনি। আমার সব তুচ্ছতা, সব ভ্রান্তি, সব পাপ সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। অতএব মা ভৈঃ।"

স্বধী তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

৫

স্বধীদার অভিযোগ বাদলের আচরণে দাগ রেখে গেল না, কিন্তু মনের ভিতর বিঁধে রইল। রাত্রে যখন সামাজিকতার উৎসাহ ও মোহ মিইয়ে আসে তখন শুয়ে শুয়ে বাদল স্বধীদার কথাগুলোকে ভিতর থেকে উপরে তুলে রোমন্থন করে। দিনের বাদল ও রাত্রের বাদল যেন দুজন মানুষ। রাত্রে বাদল একলাটি বিছানায় পড়ে বেশ একটু ভূতের ভয় পায়, পুরু কম্বলের তলায় মুখ গুঁজে গরম জলের চামড়া-বোতলটাকে কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে ধরে, হাঁটু দুটোকে ক্রমে ক্রমে মাথার কাছে এনে কুকুর-কুণ্ডলী পাকায়।

রাত্রের বাদল ভারি অসহায়, বড় দুর্বল। থেকে থেকে তার পা কন্ কন্ করে, সর্দিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এ সবের প্রতিক্রিয়া তার মনের উপর হয়। সে হঠাৎ খুব অনুতাপপ্রবণ হয়ে ওঠে, দিনটা যে একেবারে নষ্ট গেছে এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না, জীবনটা মোটের উপর ব্যর্থ যাচ্ছে। এই রকম সময় স্বধীদার উক্তির দাম বেড়ে যায়। স্বধীদা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটে আয়ু ক্ষয়

করছে না, একটা লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে, হোক না কোন স্থিতিশীল লক্ষ্য। বাদলের লক্ষ্য দিন দিন বদলাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। এত ছুটাছুটি করেও তো বাদলের প্রত্যয় হচ্ছে না যে বাদল কিছুমাত্র এগুচ্ছে।

বাদলের বয়সের ইংরেজ যুবক ঐ কলিন্স্, কী নিখুঁত স্বাস্থ্য তার, কী উদ্দাম হাস্য, কী গম্ভীর অর্গ্যান-কণ্ঠস্বর। ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অথচ এতটুকুও অহংকার নেই তার মনে, এতটুকু হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা নেই তার স্বভাবে। বাদল যখন কলিন্সের বগলে হাত পুরে দিয়ে রাস্তায় চলে তখন তার এমন লজ্জা করে! সেই যে গল্পে আছে দৈত্যের সঙ্গে বামনের বন্ধুতা। কলিন্সের প্রাণোচ্ছলতার নিত্য নূতন নিদর্শন বাদলকে ঈর্ষান্বিত করে, কিন্তু অক্ষমের ঈর্ষা তার অক্ষমতাই বৃদ্ধি করে। পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে গল্‌ফ্ খেলতে গেছল। হাস্যাস্পদ হয়ে ফিরেছে, অবশ্য নিজের চোখে। কলিন্স্ তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছে, "হবে, হবে, অভ্যাসে কী না হয়?" এই বলে নিছক প্রাণোল্লাসে মুখ দিয়ে ভুর্‌র ভুর্‌র আওয়াজ করেছে। তারপর পেট ভরে খেয়েছে ও খেয়ে উঠে বিলিয়ার্ড খেলেছে। বাদলের খাওয়া দেখে চোখের কোণে দুষ্টু হাসি হেসেছে—একটা পাখীর খাওয়া।

এই যে ইংরেজ, এর মতো ইংরেজ হতে পারবে কি? এরই মতো প্রাণ প্রস্রবণ? এমনি প্রাণপূর্ণ, অথচ মৃত্যুভয়শূন্য? একদিন কলিন্স্ বলেছিল, "যুদ্ধ? আবার বাধুক না? ভয় কি? সেই সুযোগে এরোপ্লেন চালানো শিখে নেওয়া যাবে। দেশও দেখা হয়ে যাবে বিস্তর।" বাদল বলেছিল, "মরণ ঘটবে না?" কলিন্স্ ভীষণ হল্লা করেছিল। বলেছিল, "রাস্তায় চলতে চলতে মোটর চাপা পড়ে ও বাড়ীতে বসে হার্ট

ফেল হয়ে যত লোক মরে যুদ্ধে তার চাইতে এমন কী বেশী লোক মরে? যদি মরেই, তাতে কী? তুমি কী ভাবছ মরাতে কেবলি দুঃখ, মজা একেবারেই নেই?"

এর মতো ইংরেজ না হতে পারে যদি, তবে বৃথা এ সাধনা। সুধীদার সাধনায় সিদ্ধি হবে, আরো কত যুবকের সাধনায় সিদ্ধি হবে। সকলে এগিয়ে যাবে নিজ নিজ নির্বাচিত পথে, বাদলকে ধাক্কা দিয়ে কত টম্ ডিক্ হ্যারী এগিয়ে যাবে বাদলের নির্বাচিত পথে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে কলিন্স্ যে start পেয়ে গেছে সেটা কেবল তার মগজে নয়, তার স্বাস্থ্যে তার শৌর্যে তার জীবনীশক্তিতে। বাদলের মতো সে রাত ভোর করে দেয় না ভাবনায়। ভাবে সে অতি অল্প সময়। তবু তার ভাবনাটুকু পাকা, কারণ সে ভাবনা বাদলের ভাবনার মতো দুর্বল দেহ এবং ক্ষীণ জীবনীশক্তির ফল নয়, রুগ্ণা জননীর সন্তান নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। বিশুদ্ধ মননক্রিয়া ভারতবর্ষে নেই, মনের জমিতে চাষ করতে গেলে হাজার আগাছার সঙ্গে আপোস করতে হয়, সেখানে সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে সমাজের স্বার্থ ঢোকে, সৌন্দর্য-বিচারের ভিতর মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা। সুধীদা বিজ্ঞের মতো ইন্‌টুইশনের মার্গ অবলম্বন করেছে, সে-সম্বন্ধে ইউরোপে তাকে ওরা অথরিটি বলে স্বীকার ও সম্মান করবে। আর বাদলকে বলবে, হ্যাঁ, ইণ্টেলেক্চুয়ালদের সমাজে পাত্তা পাবার যোগ্য বটে, কিন্তু আপ-টু-ডেট থাকবার জন্যে প্রাণপাত করেছে, তাই জগৎকে দেবার মতো প্রাণ অবশিষ্ট নেই। পাল্লা দিয়ে সঙ্গ রাখবার জন্যে যৎপরোনাস্তি করেছে, তাই চিন্তানায়ক হবার ক্ষমতা খুইয়েছে।

হায়, হায়, সেও যদি start পেয়ে থাকত, সে যদি ইংরেজ হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকত, তবে তার সঙ্গে পেরে উঠত কোন ধৃষ্ট?

তাকে চেষ্টা করে ইংরেজী শিখতে হত না, বাংলার বদলে শিখত ফরাসী, সংস্কৃতের বদলে ল্যাটিন। পারিবারিক জীবনে পেত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, ইস্কুলেও বিজ্ঞানচর্চা করবার সুযোগ পেত। কলেজে ইউরোপের ভাবী ইণ্টেলেকচুয়ালদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জেনে রাখত কাদের সঙ্গে তার জীবনব্যাপী প্রতিযোগিতা; এবং তাদের শক্তিরও পরিমাপ করে রাখত। ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটাই বোকামি, ওদের দৌড় চাকরির ও বিয়ের বাজার অবধি। ওদের মধ্যে প্রথম হতে চাওয়াটা রীতিমতো misleading—তাতে করে শক্তির চালনা হয় ভুল দিকে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলো বাদলের প্রয়োজনের পক্ষে অবান্তর, সুতরাং বাদলের অপাঠ্য। হায়, হায়, কী মহামূল্য চারটি বৎসর সে কলেজে নষ্ট করেছে! ইস্কুলে যা নষ্ট করেছে তার জন্যে অনুতাপ করা মিথ্যা, কেননা তখন তার জ্ঞান ছিল না সে জীবনে কী চায়, কোনখানে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কলেজে ঢুকতে তার অন্তর সায় দেয় নি, নেহাৎ তার বাবা তাকে বিলেত পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন না বলে চারটি বছর একটা পিঁজরাপোলে অপব্যয় করতে হল। সুধীদা বুদ্ধিমান, ম্যাট্রিকের পর দু বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়িয়েছে, নন্‌কোঅপারেশনের কল্যাণে খদ্দরের ভেক ধারণ করে সুধীদা যেখানেই যায় সেখানকার কংগ্রেসওয়ালাদের দলে ভিড়ে যায়, 'স্বরাজ-আশ্রমে' খায়। তারপর একদিন বাদলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাদলের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না। কলেজে ভর্তি হয়ে বাদলের সঙ্গী হল বটে, কিন্তু পড়াশুনায় সেইটুকু মনোযোগ করল যেটুকু থার্ড ডিভিশনের পক্ষে আবশ্যক। দিনের পর দিন সুধীদা ক্লাস পালিয়ে গঙ্গার ধারে শুয়ে নৌকার গুণটানা নিরীক্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের আকাশে নানা আকারের নানা আকৃতির ও

নানা বর্ণের মেঘ অভিনয়ের আসর জমায়। তাদের প্রাত্যহিক আসরে সুধীদা কখনো অনুপস্থিত থাকেনি। প্রতিবেশীর রোগে শোকে তথা শুভকর্মে সুধীদাকে সমান ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। সুধীদা বুদ্ধিমান, বাদলের মতো দ্বিধায় আন্দোলিত উৎসাহে উদ্বেলিত অবসাদে অবনত হতে হতে জীবন-প্রবাহের অপচয় করে নি। তীরের মতো এক লক্ষ্যের অভিমুখীন হয়েছে।

৬

দিনের বাদল লাফ দিয়ে বিছানার থেকে উঠে এলার্ম দেওয়া টাইমপীস্‌টার ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়ে দেয়। ভাবে ঘুমিয়ে কোনো দিন তৃপ্তি আমার জীবনে আসবে না, তৃপ্তিকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখ হাত ধোয়া হয়ে যায়। পোশাক পরে নিতে হয় সারা দিনের মতো। এক রাশ নেকটাই-এর থেকে একটা বেছে নিতে হবে, প্রতিদিন ঐ একই সমস্যা, কোনটা ছেড়ে কোনটা নিই। সকাল বেলার এই যে পরীক্ষা, এই তো সারা দিনের পরীক্ষার অগ্রদূত। কোনটা ছেড়ে কোনটা ভাবি, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি, কোনটা ছেড়ে কোনটা করি। ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে ভাবে, সতেরোই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ জগতের ইতিহাসে মাত্র একটিবার এসেছে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, মাত্র একটি দিনের জন্যে। আজ রাত্রি বারোটার পর থেকে আর এর নাগাল পাওয়া যাবে না, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না। এই দিনটিকে কী-ভাবে-কাটানো ছেড়ে কী-ভাবে-কাটাতে হবে সেই হচ্ছে আজকের ধাঁধা।

ধাঁধার জবাব ধাঁ করে দেওয়া যায় না, কিন্তু ধাঁ করে একটা

টাই টেনে নিয়ে পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বেখাপ। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে আরেকটা নিয়ে কতক সন্তোষ পায়। এ ছাড়া উপায় নেই, এর নাম trial and error-এর মার্গ, এই মার্গ বাদলের। সুধীদার চলা বাঁধা রাস্তায়, তাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু বাদলের চলা একশোটা পথ থেকে বেছে একটাতে। সে যতই এগোয় ততই দেখে তার সামনে একশোটা পথ একশো দিকে চলে গেছে। একবার এটাতে একবার ওটাতে কিছুদূর চলে। মনঃপূত হয় না। ফিরে এসে তৃতীয় একটা পথ নেয়। এইটেতে কতক সন্তোষ পায়। কিন্তু বেশ খানিকটা গিয়ে দেখে যে এই পথেরও একশো শাখা। আবার সেই trial, সেই error এবং অবশেষে সেই আপাত সত্য। সুধীদার এই বালাই নেই। সুধীদার সামনে মাত্র একটি পাকা সড়ক, পাড়াগাঁয়ের সদর রাস্তা, ঐ রাস্তা ধরে একটা অন্ধও অক্লেশে আর একটা অন্ধকে চালিয়ে নিতে যেতে পারে। সুধীদা গেঁয়ো, বাদল শহুরে।

এ কথা মনে হতেই সুধীদার প্রতি বাদলের করুণা সঞ্চার হল। সে আর একবার চুলে ব্রাশ বুলিয়ে দিয়ে টাইটা-তে ছুই টান মেরে তর্ তর্ করে নিচে নেমে গেল। মিসেস্ উইল্‌স্ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ তার অপেক্ষায় আছেন। মিস্টার তো খুব সকাল সকাল খাওয়া শেষ করে বিদায় হন। ডেলি প্যাসেঞ্জার কিনা, যেতে হয় সেই কোন মুল্লুকে—ঈস্ট্ এণ্ডে।

বাদলকে দেখে মিসেস উইল্‌স্ বললেন, "আজ কে একজন তোমাকে ফোনে খুঁজছিল, বার্ট।"

বাদল খপ করে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "কে, কলিন্স্?"

মিসেস উইল্‌স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ঢঙে বললেন, "হবে। বলেছে আজ সন্ধ্যাবেলা ওর সঙ্গে খেয়ে থিয়েটারে যেতে। যাচ্ছ, কেমন?"

বাদল বলল, "যাওয়া তো উচিত। ওকে আগে থাকতে কথা দিয়ে রেখেছি যে যেদিন ওর সুবিধা হবে সেদিন এক সঙ্গে থিয়েটার যাওয়া যাবে।"

"বেশ, বেশ। মিস্টার উইল্‌স্‌কেও তুমি হার মানালে। তিনি তো সাতটায় ফেরেন, তুমি কিছুদিন থেকে ফিরছ বারোটায়।"

বাদল আফসোস জানিয়ে বলল, "কী করি, মিসেস উইল্‌স্‌। ওয়াই-এম্-সি-এতে হপ্তায় দিন দুয়েক না গেলে চলে না, একটু গান বাজনা হয়, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ। Rationalist Press Associationএর বুড়োদের সঙ্গেও একদিন ভাব করতে যাই। King's Collegeএ একটা লেকচার নিচ্ছি। এ ছাড়া বন্ধুদের প্রায়ই সোহো অঞ্চলে খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়।"

মিসেস উইল্‌স্‌ শ্লেষের সুরে বললেন, "তা হলে সোহোর কাছে বাসা করলে হয়। বারোটা রাত্রে গৃহস্থবাড়ীতে কে তোমার জন্যে জেগে থাকবে বল? গরম কোকো না খেলে তোমার ঘুম আসে না বলে কে অত রাত্রে উনুন ধরাবে রোজ রোজ?"

বাদল ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, "আমার জন্যে আপনাকে এতটা কষ্ট করতে হয় আমি জানতুম না, মিসেস উইল্‌স্‌, বিশ্বাস করুন।"

মিসেস উইল্‌স্‌ নরম হয়ে বললেন, "বার্ট, আমি তোমার দিদির মতো; সেই অধিকারে তোমাকে যদি কিছু বলি তুমি অনধিকার চর্চা মার্জনা করবে তো?"

"নিশ্চয় করব, কেট্‌।" মিসেস উইল্‌স্‌কে ভাইয়ের অধিকারে "কেট" বলে সম্বোধন করা এই প্রথমবার। বাদলের বুক নূতনত্বের হর্ষে অথচ পাছে মিসেস উইল্‌স্‌ কিছু মনে করেন সেই ভয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হল না। যেন নদীর উপর দিয়ে একটা স্টীমার চলে গেল।

মিসেস উইল্‌স্‌ কৌতুক-হাস্য চেপে বললেন, "তা হলে বলি। তোমার বয়সের ছেলেরা নিজের মা-বোনেরও মুরুব্বিয়ানা পছন্দ করে না আজকাল। তোমাকে অভয় দিচ্ছি যে মুরুব্বিয়ানার অভিপ্রায় নেই তোমার দিদির। তোমাকে বিবেচনা করতে বলি, এই যে তুমি রাত করে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছ এতে কি তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না? যে উদ্দেশ্যে তোমার মা বাবা তোমাকে এত দূরদেশে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য বিফল হবে না?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি সাধারণ ছাত্র নই, কেট্‌। আমি তোমাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি যে, আমি বাড়িতে বই না ছুঁয়েও অন্য সকলের চেয়ে ভালো করে পাস্‌ হতে পারি।"

কেট্‌ বললেন, "অন্য সকলে তো ভারতীয় নয় এ ক্ষেত্রে। এটা ইংলণ্ড।"—তাঁর স্বজাতি-সম্বন্ধীয় গর্ব আঘাত পেল। তিনি বললেন, "মানছি আমাদের ছাত্ররা বোকা-সোকা, তোমাদের মতো অবলীলাক্রমে একটা বিদেশী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, অমন সবজান্তাও নয়। তবু, বার্ট্‌, খাটুনিরও একটা পুরস্কার আছে, মেধা দিয়ে খাটুনির অভাব পূরণ করতে পারবে না।"

বাদলের আজ তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না। একটি দিদি পেয়ে সে গোপন পুলকে শিউরে শিউরে উঠছিল। বলল, "কেট্‌, আমার জীবন অন্য রকম, আদর্শ অন্য রকম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি পাস্‌ করা না করা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নই। মনটাকে রোজ কসরৎ করিয়ে fit রাখছি, মনের ক্ষুধাকে অখাদ্য না দিয়ে সুখাদ্য দিচ্ছি, মনের দিক থেকে ধীরে অথচ স্থির ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছি, এই আপাতত যথেষ্ট। তবে এইটুকুতে আমার সন্তোষ নেই, আমি পৃথিবীর সমস্ত বড় মানুষের সমস্কন্ধ হতে চাই—সাধনায়, বেদনায়, উপলব্ধিতে ও আবিষ্কারে। মনের মতো

উন্নতি হচ্ছে না, আয়ু নষ্ট হচ্ছে প্রচুর, মাঝে মাঝে নিরাশায় নুয়ে পড়ছি ও অনুশোচনায় ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখছি—না, অনুশোচনা জিনিসটা এমন খারাপ যে তাতে ক্ষতির পরিমাণ শুধু বাড়ন্ত দেখায় না, বেড়ে ওঠেও—তবু আমার মনে হয় আমি আর কিছু না হই বাদলচন্দ্র সেন তো হচ্ছি।”

কেট্ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “তোমার সমস্ত কথা বুঝতে পারলুম না, বার্ট্, কিন্তু তোমাকে আমার আন্তরিকতম শুভকামনা জানাই।”—হেসে বললেন, “তা বলে রাত করে বাড়ি ফেরার সমর্থন করতে পারিনে। কোন দিন কোন স্ত্রী-জানোয়ারের কবলে পড়বে, সোহো তো বড় সুবিধের জায়গা নয়; ছাত্রদের পক্ষে লণ্ডন যে ঘোর প্রলোভনসংকুল এ কথা কি তোমার মা বাবা জানতেন না? অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের নাম কি তাঁদের অজানা?”

বাদল জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, “হোপলেস। অক্সফোর্ড কেম্বিজের ছেলেরা জীবনের কী জানে, কী বোঝে? যেখানে প্রলোভন নেই সেখানে জীবন নেই। আমি জীবনের দ্বারে বিদ্যার্থী, লণ্ডন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজা।” এই বলে সে এক সেকেণ্ড থেমে বলল, “কেট্।” তার ভারি মিষ্টি লাগছিল ঐ সম্বোধনটি।

কেট্ বললেন, “কী?”

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “না, কিছু না। বাক্যটা সমাপ্ত করবার সময় সম্বোধন করতে এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। ওটা বাক্যের শেষাংশ, কেট্। যেমন এটা।”

বাদলের রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

৭

গাওয়ার স্ট্রীট রাসেল স্কোয়ার ইত্যাদি অঞ্চলে বাদল পা দেয় না, যেহেতু ওসব অঞ্চলে সর্বদাই দশ বিশ জন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ও দেখা হতে হতে আলাপ হয়ে যায়। ভারতীয়দের চিনতে পারা সহজ। কী পরস্পর সাদৃশ্যই যে তাদের মধ্যে আছে!—মারাঠা মাদ্রাজী বাঙালী কাশ্মীরী হিন্দু মুসলমান পার্শী সকলেই দেখতে একরকম। ভারতবর্ষের বাইরে এসে সবাই পরেছে ইংরেজী পোশাক, তাই দিয়ে তাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য চাপা পড়েছে, অথচ তাদের আকৃতিতে এমন কিছু আছে, যেটা কেবল ভারতবর্ষীয়ের বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যের জোরে তারা সহজেই চিহ্নিত।

বাদল তাদের এড়িয়ে চলে। তাদের কাছ থেকে তার শেখবার কিছু নেই। জীবনের বিশটি বছর তাদের দিয়েছে, তার বেশি দিতে পারে না, দিলে অন্যদের প্রতি অবিচার করা হয়। সামনের বিশ বছর ইংলণ্ডকে ও ইউরোপকে দিয়ে তার পরে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে, সর্বত্র বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার অধিকারী হবে। বাদলের দায়িত্ব কি বড় কম দায়িত্ব! এত বড় মানব জাতিটার ঐক্য, প্রগতি ও শান্তি যে ক'জন চিন্তাশীল মানুষকে উত্যক্ত করছে বাদলও, তাদের একজন। বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল্, বাদল সেন—এঁরা বয়সে ছোট বড় হলে কী হয়, এঁরাই সকলের হয়ে আগ বাড়িয়ে দেখছেন, এঁরাই মানব-সেনানীর স্কাউট দল, এভোল্যুশন-তরণীর এঁরাই পাইলট। শ, রাসেল, ক্রোচে, ডিউই (Dewey), ওয়েল্স্, রলাঁ,—এঁরা তো চিরকাল বাঁচবেন না, এঁদের স্থান পূরণ করবার জন্যে যাঁদের এগিয়ে যাবার কথা তাঁদের অনেকেই গত মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন, যাঁরা

অবশিষ্ট আছেন তাঁরা অর্থাৎ ডি-এইচ-লরেন্স, টি-এস-এলিয়ট, মিড্‌লটন মারী, জেমস্ জয়েস্, জঁা-রিশার ব্লশ, স্টেফান ৎসোয়াইগ্, টোমাস মান ইত্যাদিও একদিন মানবের দেশ থেকে বিদায় নেবেন। তখন বাদলের পালা।

বাদল তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উত্তর সীমানা মাড়ায় না। ভারতীয়দের মধ্যে এক সুধীদার সঙ্গেই তার যা কিছু সম্বন্ধ।

কিন্তু সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল, Mudie-র লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে বাস ধরতে যাচ্ছে এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকল, "মিস্টার সেন!" ফিরে দেখে একজন ভারতীয়! ভারতীয়টি বলছে, "চিনতে পারেন?" বাদল কিছুক্ষণ চিন্তা করে। ভারতীয়টি বলে, "সেই যে বম্বের জাহাজে মিথিলেশকুমারীকে তুলে দিতে এসে দেখা হয়েছিল—"

বাদলের মনে পড়ে যায়। বাদল খুশি হয়ে বলে, "আপনি কি মিস্টার নওলকিশোর?"—পাটনার লোক। পরিচিত। অমায়িক। ভারতীয়দের প্রতি দূর থেকে বাদলের যতটা বিতৃষ্ণা নিকট থেকে ততটা নয়, দেখা গেল। সে নওলকিশোরকে সঙ্গে নিয়ে ঘণ্টাখানেক পায়ে হেঁটে গল্প করে বেড়াল। পাটনার খবর জানতে তার দিব্যি ইচ্ছা করছিল। ভারতবর্ষের খবর কাগজে যা পায় তা অকিঞ্চিৎকর, পড়েও না। নওলকিশোরের মুখে শুনতে মন যাচ্ছিল গান্ধী কেমন আছেন, কী তাঁর ইদানীন্তন কর্মপন্থা, মডারেটরা সাইমনের উপর বিরূপ হয়ে থাকবে কদিন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধছে কি না। খুব আশ্চর্য লাগছিল এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। এত কথাও তার মনে আছে! পরিত্যক্ত দেশ সম্বন্ধে এতটা কৌতূহলই বা তার এল কোত্থেকে!

নওলকিশোর কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করছিল তার নিজের খবর বলতে। সে এক রকম পালিয়েই এসেছে, বাড়ী থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে না। দিন সাতেক একটা বোর্ডিং হাউসে আছে, শীঘ্রই মিথিলেশকুমারীর বাসায় জায়গা খালি হবে, বাদল যেন মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে ভোলে না। মিথিলেশকুমারীর ঠিকানাটা দিল। বলল, "তিনি ও আপনি ছাড়া এদেশে আর তো কেউ নেই আমার!"

মিথিলেশকুমারীর কথায় বাদলের মনে পড়ল কুবেরভাইয়ের কথা। আহা, তার সঙ্গে আবার দেখা হয় না? খাসা লোক কুবেরভাই, সে না থাকলে জাহাজের দিনগুলো মিথিলেশকুমারীর ভক্তের দলে যোগ দিয়ে আড্ডা দিতে দিতে ব্যর্থ যেত।

কিন্তু অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। নওলকিশোরের পাল্লায় পড়ে তার একটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। আর না। বাদল দমকা হাওয়ায় মতো বিদেশে সহায়বন্ধুহীন বেচারা নওলকিশোরকে হতভম্ব করে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, গুড বাই, মিস্টার প্রসাদ, আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। আশা করি ইংলণ্ড আপনার উপভোগ্য হবে। গুড বাই।—" এই বলে একটা চলন্ত বাসে লাফ দিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কলিন্স্‌ ও মিলফোর্ড বাদলকে দেখে একবাক্যে বললেন, "মর্নিং, সেন।" কলিন্স্‌ কাজ করবার ফাঁকে ও মিলফোর্ড বই ঘাঁটার ফাঁকে Prayer Book Measure সম্বন্ধে মত বিনিময় করছিলেন। কলিন্স্‌ বলল, "সেন, তুমি কী?"

বাদল বুঝতে না পেরে বলল, "হাউ ডু ইয়ু মীন্‌?"

কলিন্স্‌ বলল, "ওঃ! আই বেগ্‌ ইওর পার্ডন্‌। মিলফোর্ড হচ্ছেন হাই চার্চম্যান্‌, আমি মডার্নিস্ট। তুমি কী?"

বাদল বলল, "তাই তো!"—একটু চিন্তিত হল। ইংরেজ হতে যাচ্ছে, অথচ চার্চের সঙ্গে অল্পাধিক যুক্ত নয়, এ কেমন কথা? কলিন্সের মতো আধুনিকপন্থীও ওয়াই-এম্‌-সি-এ'তে থাকে, খ্রীস্টান বলে নিজের পরিচয় দেয়। মডার্নিস্ট হচ্ছে চার্চ অব ইংলণ্ডের সেই সব সদস্য যারা একবারে চার্চ ছেড়ে দিতে চায় না, তাকে এ কালের উপযোগী করে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। খ্রীস্টধর্মের এরা এক বিজ্ঞানশোধিত সংস্করণে বিশ্বাসী।

বাদল বলল, "আমি? আমি ফ্রী-থিঙ্কার।"

মিলফোর্ড বললেন, "ভারতবর্ষের সকলেই কি তাই? আমি শুনেছিলুম ওরা মূর্তিপূজা করে।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, "ভারতবর্ষের ওরা যা করে আমিও যে তাই করব এমন কোনো কথা নেই। তা ছাড়া মূর্তিপূজা রোম্যান ক্যাথলিকরাও করে, মিস্টার মিলফোর্ড।"

কলিন্স্‌ চোখ টিপে বলল, "এবং এ্যাংলো ক্যাথলিকরাও।"

বাদল জানত হাই চার্চম্যানরা বহু পরিমাণে রোম্যান ক্যাথলিক ভাবাপন্ন। বস্তুত তাদের সেই রোম্যান ক্যাথলিক ভাব দেখে পার্লামেণ্টের সন্দেহ হয় যে, তারা রোম্যান ক্যাথলিক যুগে দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই তাদের সমর্থিত Prayer Book Measureকে পার্লামেণ্ট বাতিল করে। তবু ওটার সামান্য পরিবর্তন করে আবার ওটাকে পার্লামেণ্টে পেশ করবে ওরা। এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

বাদল বলল, "আচ্ছা, মিস্টার মিলফোর্ড, কেন আপনাদের এই অধ্যবসায়? দেশ যে এগিয়ে চলেছে তা কি আপনার আর্চবিশপদের চোখে পড়ে না?"

মিলফোর্ড গম্ভীরভাবে বললেন, "এগিয়ে যাওয়া আপনি কাকে বলেন, মিস্টার সেন? যে মানুষটা সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যায় সেও তো এগিয়েই যায়।"

কলিন্স্ বলল, " 'কেন' ছেড়ে এখন 'কেমন-করে' নিয়ে আলোচনা করা যাক। পার্লামেণ্ট যদি এবারেও বাতিল করে তা হলে কী উপায়?"

মিলফোর্ড shrug করলেন। বললেন, "পার্লামেণ্টের সুমতির উপর আমাদের আস্থা আছে। থ্যাঙ্ক গড্, এখনো এ দেশটা সোশ্যালিস্টদের হয়নি।"

ইংলণ্ডের চার্চ সরকারী টাকায় চলে, তার বিশপরা সরকারী চাকুরে। সোশ্যালিস্টরা রাজ্যভার পেলে চার্চের ভাতা বন্ধ করে দিতে পারে, কারণ এ যুগে স্টেট্ ও চার্চ একাত্ম নয়, এ যুগের অনেক প্রজার ধর্মমত চার্চের থেকে ভিন্ন, তাদের খাজনায় পরিচালিত হবার অধিকার চার্চের নেই।

বাদল বলল, "সোশ্যালিস্‌ম আমিও চাইনে। কিন্তু স্টেটের কর্তব্য সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা। খাজনা দেব আমি, আর তার ফলভোগ করবেন আপনি, এ যে আমার প্রতি অবিচার।"

মিলফোর্ড একবার কাশলেন। বললেন, "Sorry. কিন্তু খাজনার ফলভোগ করতে আপনাকেও তো বারণ করিনি, আপনাকে আমরা আহ্বান করছি। চার্চের চোখে সকলেই সমান, চার্চের কাছে সকলেই প্রিয়—যেমন রাজার চোখে, রাজার কাছে। আচ্ছা, রাজ-তন্ত্রেও তো অনেকের আপত্তি দেখি, তাঁদের খাজনায় রাজপরিবারকে পোষণ করা তা হলে অন্যায়?"

বাদল বলল, "রাজতন্ত্র কি ইংলণ্ডে আছে ভাবছেন? রাজতন্ত্রের

বেনামীতে গণতন্ত্র কাজ করছে। রাজা যাঁকে বলছেন তিনি আসলে একজন আমলা। তাঁকে তাঁর মাইনে দিতে হবে বৈ কি।"

মিলফোর্ডের বয়স বেশী নয়, তিনি King's Collegeএ থিয়লজীর ছাত্র। থিয়লজীর ছাত্রের সঙ্গে বচসা করা নিষ্ফল জেনে কলিন্স্ কাজে মন দিয়েছিল ও চুপি চুপি হাসছিল। বাদল বলল, "এই কলিন্স্, ভারি স্বার্থপর তো, তর্কে যোগ দাও না কেন?"

কলিন্স্ বলল, "দেখছ না ওঁর কত বড় বড় দাড়ি। একেবারে মধ্য-যুগের মানুষ। তর্কের গিলেট-ক্ষুর দিয়ে ওঁর ঐ সব মধ্যযুগীয় সংস্কার কামিয়ে সাবাড় করা কি এক আধ ঘণ্টার কাজ, মাই ডিয়ার চ্যাপ্?"

মিল্‌ফোর্ড বললেন, "এমন দাড়ি বহু সাধনায় মেলে। চার্চের মতো এর একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তোমাদের সোশ্যালিস্‌মের মতো ভুঁইফোড় নয়। চেঁছে সাফ করা তো দু মিনিটের কাজ, পনের ষোল শতাব্দী ধরে গজিয়ে তুলতে পার?"

কলিন্স্ বলল, "তোমার দাড়ির যে অত বয়স তা কি জানতুম, ডিয়ার ওল্ড বয়?"

মিলফোর্ড বলল, "ঠাট্টা নয়, কলিন্স্। কত বড় একটা আইডিয়া রয়েছে এর পিছনে! একটি রাজা, একটি রাষ্ট্র, একটি চার্চ—যেমন একটি ভগবান, একটি খ্রীস্ট, একটি Holy Ghost."

কলিন্স্ টেবিল চাপড়ে বলল, "হিয়ার হিয়ার।"

বাদল ভাবছিল মিলফোর্ডের মতামত যে অমন হবেই তার আর আশ্চর্য কী! সে যে থিয়লজীর ছাত্র, পাস্ করলে চার্চের অধীনে চাকরি পাবে। যে ডালে তার বাসা সেই ডালকেই সে কাটবে কোন দুরাশায়? কিন্তু পার্লামেণ্ট যখন ভর্তা ও চার্চ ভার্যা তখন পার্লামেণ্টের

সুমতির (অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার) উপর আস্থা রাখা ছাড়া চার্চের গত্যন্তর নেই। চার্চের আত্মসম্মান থাকলে চার্চ নিজের থেকেই পৃথক হয়ে যেত। এতগুলো বিরাট হাসপাতাল চাঁদার উপর চলছে ; রোম্যান ক্যাথলিক ও নন্‌কন্‌ফর্মিস্টরা রাষ্ট্রের বিনা সাহায্যে নিজ নিজ ধর্মের ব্যবস্থা করেছে ; এ্যাংলিকানরা কেন চাঁদা করে চার্চের ভার নেয় না ? তা হলে তো ইংলণ্ডের লোকের কর-ভার কমে। যেমন ফ্রান্সের লোকের কর-ভার কম। কী বল, কলিন্স্ ?"

কলিন্স বলল, "আমিও তাই বলি, সেন। পরের খাজনার চেয়ে নিজের লোকের চাঁদা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা বাড়ায়। চাঁদার আশায় নিজের লোকের প্রতি কর্তব্য করতেও চাড় হয়। কিন্তু ওরা কি এ কথা শোনে ? প্রেষ্টিজ ওদের বড়ই প্রিয়। পিছনে রাজশক্তি থাকার প্রেষ্টিজ, অতীতকালের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রেষ্টিজ, নিছক টাকা পয়সার দিক থেকেও দিলদরিয়া ভাব—লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন !" —মিলফোর্ড ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছিলেন। কলিন্স্ বলে চলল, "তা ছাড়া আরো ফ্যাকড়া আছে। সরকারী সাহায্য না পেলে অনেকগুলো বেসরকারী endowments থেকে বঞ্চিত হবার কথা। তাতে চার্চের ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হয়।"

৮

সুধীর দিনগুলি ঘটনাবিরলভাবে কাটছিল। মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে তুলনামূলক দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য পড়া তার প্রাত্যহিক কাজ। রবিবার জন-কয়েক ভারতীয় বন্ধুর খোঁজ খবর নিতে হয়, তাদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মনে হয় ভারতবর্ষে আছে, তাদের

কারুর সঙ্গে বাংলাতে, কারুর সঙ্গে হিন্দীতে কথা কয়ে আরাম পায়। আড্‌ওয়ানী নামের একটি সিন্ধী ছেলে তার বিশেষ অনুগত হয়ে পড়েছে, মিউজিয়ামে তার পাশের আসনে বসে, লাঞ্চের সময় তার সঙ্গে ঘোরে এবং সে যখন যা বলে নিজের নোট বুকে সযত্নে টুকে রাখে। বলে, "নতুন একটা আইডিয়া। আমার থীসিসের মধ্যে কোথাও এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।" বেশ নম্রস্বভাব ছেলেটি, মুখে বিনয়ের হাসি লেগেই আছে, সুধীকে ডাকে "চক্রবর্তীজী", গোঁড়া স্বদেশী। তার গবেষণার বিষয় "ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ক্রমবিকাশ।"

আড্‌ওয়ানী বলে, "চক্রবর্তীজী, জাত বা caste আপনারা যাকে বলেন সিন্ধুপ্রদেশে তা নেই। আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের কথা তো জানেনই, আমাদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের মধ্যে মোটামুটি দুটি শ্রেণী—যারা লেখাপড়ার কাজ করে আর যারা গতর খাটায়। অনেকটা ইংরেজদের professional and working classes আর কী! পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের চেয়ে কায়স্থ নাকি বড়। এমনি করে সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা কত যে বিচিত্র, স্বতোবিরুদ্ধ ও জটিল তার ইয়ত্তা হয় না। সব ভেঙে একাকার করে দেওয়া যায় না, চক্রবর্তীজী? একধার থেকে কমিউনিস্‌ম—?" আড্‌ওয়ানী কথাটা শেষ না করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

সুধী হেসে বলে, "কেন? আপনার থীসিস লেখার সুবিধা হবে বলে?"

আড্‌ওয়ানী অত্যন্ত বিনয়পূর্বক বলে, "না না, তাই কি আমি বলেছি? জাতীয় ঐক্যের খাতিরে যাবতীয় বিভিন্নতা দূর হওয়া উচিত, এই আমার বিশ্বাস।"

'আপনি ও আমি বাঙালী ও সিন্ধী ; ব্রাহ্মণ ও 'আমিল'। তা বলে

কি আমরা কোনো দুজন ইংরেজের তুলনায় পর ? দুজনের মধ্যে একটি সহজ ঐক্যবন্ধন নেই কি ?"

"সেটা—সেটা—বুঝলেন কি না ? সেটা আমরা ইংলণ্ডে আছি বলে। ভারতবর্ষে থাকলে আমরা নিজেদের অনৈক্যের কথাই আগে ভাবতুম।"—এই বলে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। যেন তার যুক্তির কোনো মূল্য নেই যদি সুধী না সমর্থন করে।

সুধী বলে, "ইংরেজ তার স্বদেশে থেকেও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত আছে, স্বদেশে থেকেও সকলের সংবাদ রাখে। তার খবরের কাগজগুলি খুলে দেখুন, আদার খবর থেকে জাহাজের খবর পর্যন্ত সব রকম খবর সেগুলিতে থাকে এবং সেগুলিতে সম্পাদকীয় আলোচনা হয় বিশ্ব-রাজনীতি, বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে। কেমন ?"

আড্ওয়ানী মাথাটাকে অত্যধিক নুইয়ে বলে, "ঠিক।"

সুধী বলে, "অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে অহর্নিশ নিজেদের জাতিটিকে তুলনা করতে পায় বলে ওরা ঐক্যের সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তা বলে ওদের চেতনায় যে ওদের ঘরোয়া অনৈক্যের অংশ নেই তা নয়। কাউণ্টি ক্রিকেট ম্যাচের সময় ওদের কাউণ্টি-প্রীতি মাথা নাড়া দেয়, ভাষাগত প্রসঙ্গ উঠলে ওদের প্রাদেশিকতা গা-ঝাড়া দেয়।"

আড্ওয়ানী যেন কী একটা আবিষ্কার করেছে। বলে, "একেবারে ঠিক। Devonshire-এর ভাষা, Lincolnshire-এর ভাষা, স্কটল্যাণ্ডের ভাষা এই নিয়ে কি কম তামাশা বাধে!"

সুধী বলে চলল, "আমাদের যখন বিশ্ব-চেতনা বাড়বে তখন জাতীয় ঐক্যবোধ বাড়বে, তা আমরা স্বদেশেই থাকি আর বিদেশেই থাকি। 'জাতি' 'জাতি' করলে জাতীয়তা আসে না, 'বিশ্ব-'বিশ্ব' করলে আসে।"

আড্ওয়ানী চটপট টুকে নিল।

সুধী বলে চলল, "ঐক্যবোধই অনৈক্যবোধকে স্বীয় অঙ্গীভূত করবে, যেমন শাদা রঙ সকল রংকে আত্মসাৎ করে। সব কটা রঙকে মুছে দিলে যা দাঁড়ায় সে হচ্ছে কালো রঙ। অর্থাৎ কোনো রঙ নয়। কিছু নয়। অনৈক্যকে বেবাক লুপ্ত করলে ঐক্যও থাকবে না, আডওয়ানীজী। সেই ভয়ে কমিউনিস্‌মও শ্রেণীগত অনৈক্যকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় করেছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে।"

আড্‌ওয়ানী উৎসাহের সহিত টুকতে থাকল।

দে সরকারের সঙ্গে রবিবারগুলোতে প্রায়ই দেখা হয়। ছোটখাট একটি আড্ডা বসে। আড্ডার সকলেই বাঙালী। আমেরিকা-ফেরত সেই যে ছেলেটির নাম মৃণাল চৌধুরী সেও তার হাইগেটের বাসা থেকে ব্লুমস্‌বেরীতে আসে।

দে সরকার বলে, "আমাদের এই মিলনটিকে বলা যাক 'ত্র্যহস্পর্শ'। একজন মিষ্টিক, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ম্যান অব দি ওয়ার্লড্‌।"

সুধী বলে, "আমি মিষ্টিক হলুম কবে?"

মৃণাল চৌধুরী বলেন, "আর আমি বা কিসের বৈজ্ঞানিক? জানি তো যৎসামান্য রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং।"

দে সরকার বলে, "চারজন হলে বেশ কয়েক হাত তাস খেলা যেত। চক্রবর্তী, আপনি খেলেন তো?"

সুধী বলে, "নিশ্চয়।"

দে সরকার বলে, "তবে আর আপনি ওরিয়েণ্টাল 'ইওগী' বলে বুড়ীদের মহলে পসার জমাবেন কী করে? কৃষ্ণমূর্তি স্মার্ট ইংরেজী পোশাক পরে অর্ধেক মক্কেল হারিয়েছে।"

রসিক মানুষ, রসে টস্‌ টস্‌ করছে। চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, কোনো ব্রিজখোর মহিলার নাম ঠিকানা জানা আছে আপনার?

চৌধুরী বলেন, "কেন বলুন তো ?"

"তাও বলতে হবে ? তবে শুনুন। দেশ থেকে যা পাই তাতে কুলোয় না। আর এ শালারা তো আমাদের দেশে থাকতে নিজের দেশ থেকে এক পেনীও নেয় না, আমিই বা কেন গরীব দেশের টাকা এনে ধনীর দেশে ছড়াব ? সুযোগ পেলে দু দশ শিলিং উপার্জন করতে ছাড়িনে। Public Barএ ঢুকে বিলিয়ার্ড খেলি, প্রায়ই জিতি। ব্রিজ খেলার নিমন্ত্রণ জুটিয়ে নিই। ব্রিজের বৈঠকে নৈশভোজনটা মেলে, সেই সঙ্গে খেলা জেতার দক্ষিণাও।"

চৌধুরী বলে, "বাস্তবিক, কত টাকাই যে আমরা বিদেশে পড়তে এসে বিদেশীকে দিই! আবার সেই টাকা দেশে ফিরে শ্বশুরের কাছ থেকে, জনসাধারণের কাছ থেকে, করদাতার কাছ থেকে আদায় করি।"

দে সরকার উষ্মার সহিত বলে, "আদায় করেন, না, কাঁচকলা! আপনার নিজের দিক থেকে ওটা হয়তো একটা investment, কিন্তু দেশের দিক থেকে dead loss। বিলেতের কাছ থেকে কেউ কোনো দিন একটা পাউণ্ড ফিরে পেয়েছ ?"

সুধী তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়। বলে, "না না, শুধু আর্থিক লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখলে চলবে না। বিদেশে এসে আমরা চড়া দাম দিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও যে মানসিকতা কিনে নিয়ে যাচ্ছি সেটার ফল আমাদের সাহিত্যে সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করছি। অপ্রত্যক্ষ ভাবে সে যে আমাদের সভ্যতাকে ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণতা দিচ্ছে এবং বিশ্বের গ্রহণযোগ্য করছে এও আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশ তাঁদের বয়সে আমাদেরি মতো মূল্যদান করেছিলেন।"

দে সরকার পরিহাসচ্ছলে বলে, "ওঃ! সেই জন্যে বুঝি বাদলচন্দ্র সেন

মাসে মাসে পঁচিশ পাউণ্ড ঢালছেন! আমার কিন্তু কোনো আশা নেই, মিস্টার চক্রবর্তী, গান্ধী কি রবীন্দ্রনাথ হবার। আমি অভিজ্ঞতাও নিচ্ছি, তার সঙ্গে সঙ্গে দামও নিচ্ছি। মাছের তেলে মাছ ভেজে খাচ্ছি আর কী!"

৯

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ না পেলে সুধীর দিন কাটে না। যে বাড়ীতে শিশু নেই সে বাড়ীতে বাদলের উল্লাস, সুধীর অসোয়াস্তি। মার্সেলকে আদর করতে তার অনেক সময় নষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট করবার জন্যেই তো সময়ের সৃষ্টি, যে মানুষ সময়কে সোনার বাসনের মতো সিন্দুকে বন্ধ রাখে সে নিজেকেই বঞ্চিত করে।

"আয়, আয়, কেমন আছিস আজ? গল্প শোনাতে হবে? 'ধ্রুব'র গল্প শুনবি? 'ধ্রুব' বলে সেই যে ছেলেটি বনে গিয়ে একমনে ভগবানকে ডাকছিল আর তার চারদিকে বাঘ সিংহ গর্জন করে বেড়াচ্ছিল, শুনবি তার গল্প?···বাঘ সিংহ কেমন গর্জন করে শুনতে চাস? তুই-ই শুনিয়ে দে না?···দূর, ওটা কি বাঘের মতো হল? ও তো বাঘা কুকুরের ঘেউ ঘেউ! ···কখনো বাঘ দেখিসনি? আচ্ছা, রোস্ তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব একদিন। কী করে যাবি তুই? তোর যে গাড়িতে চাপলে বমি আসে।···হাঁটতে পারবি কেন অতখানি—হেণ্ডন থেকে রিজেণ্টস্ পার্ক! তুই বেজায় ভারি, তা নইলে তোকে কাঁধে করে নিয়ে যেতুম।"

মার্সেলকে সুধী এক নতুন ধরনে ইতিহাস শেখায়।

"তুই যখন আরো ছোট ছিলি তখনকার কথা তোর মনে পড়ে?··· পড়ে?···কী মনে পড়ে?···তুই একবার বিছানার থেকে পড়ে গেছলি, ভারি কাঁদছিলি, তোকে তোর মা এসে তুললেন, তুলে একটা 'টেডি'

ভালুক ধরিয়ে দিলেন। কেমন, এই তো ?···তোর যেমন এত কথা মনে আছে তেমনি তোর বাবারও কত কথা মনে আছে। তাঁর যে বাবা ছিলেন তাঁরও কত কথা মনে ছিল। তিনি মারা গেছেন। মানুষ মারা গেলে তার মনে-রাখা কথাগুলো যদি কেউ জানতে চায় তবে বড় মুশকিলে পড়ে। তোর ঠাকুরদাদা বেঁচে থাকলে তোকে তাঁর গল্প বলতেন, এখন তুই কার কাছে তাঁর গল্প শুনবি ?···তোর বাবার কাছে ? তোর বাবা যদি আজ মারা যান তবে কার কাছে শুনবি ?—"

মার্সেল মাথা দুলিয়ে বলে, "না, বাবা মারা যাবে না।" তার চোখ ছল ছল করে।

সুধী বলে, "না রে, আমি কি তাই বলেছি ? আচ্ছা, ধর্ তোর বাবা তাঁর ঠাকুরদাদার গল্প শুনতে চান। তাঁর বাবা তো বেঁচে নেই, কে তবে ও-সব গল্প মনে রেখেছে যে বলবে···বুঝলি ? সেই জন্যে বইতে করে সব কথা লিখে রেখে যেতে হয়। আগেকার লোকের গল্প বড় বড় বইতে লেখা রয়েছে। আমরা যতই বড় হই ততই বড় বড় বই পড়ি, পড়ে জানতে পাই আমাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, তাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, এমনি সব বুড়ো বুড়ো মানুষদের ছেলেবেলার গল্প, বেশি বয়সের গল্প, খাওয়াপরার গল্প—কী খেত ওরা, কোথায় পেত ওই সব খাবার, মাটিতে ফলাত, না, শিকার করে আনত, কী পরত ওরা, কোথায় পেত ওই সব কাপড়, কল দিয়ে তৈরি করত, না, জীবজন্তুর চামড়া থেকে বানাত—এই সব গল্প। আর গান গাওয়া, ছবি আঁকা, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, ঘর, আসবাব, বাসন, খেলনা তৈরি করা, এই সকলের গল্প। আর জঙ্গল কাটা, পাহাড়-পর্বতে চড়া, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া, বিদেশী মানুষদের সঙ্গে জিনিসের বেচাকেনা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

মার্সেল চক্ষু বিস্ফারিত করে তন্ময় হয়ে শোনে। গম্ভীর ভাবে বলে, "হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

সুধী তার গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে, "এই গল্পকে বলে ইতিহাস। কোন কাল থেকে কত মানুষ তাদের গল্প তাদের ছেলেপুলে নাতি নাতনীদের জন্যে রেখে গেছে। কেউ বইতে লিখে রেখে গেছে, কেউ পাথরের গায়ে খোদাই করে রেখে গেছে, কেউ লিখতে জানত না বলে তৈজসপত্রের মধ্যে চিহ্ন রেখে গেছে। অনেক দিনের গল্প জমেছে রে মার্সেল। সব তো এক দিনে বলা যায় না। কিছুটা আমি তোকে বলব, বাকীটা তুই বইতে পড়বি।"

মার্সেল খুশি হয়ে বলে, "হুঁ।" কিন্তু তার খুশি চাপল্যে ব্যক্ত হয় না। সে যেন ঝরণা নয়, দীঘি। শান্ত, সমাহিত, বিরলধ্বনি।

১০

উজ্জয়িনীর আকস্মিক "ভাগবত উপলব্ধি"র সংবাদ সুধীকে কেবলমাত্র হাসি জোগাল না, সে বাদল এবং উজ্জয়িনী উভয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে গভীর বেদনা বোধ করল। রসিকতা করে হালকা ধরনের চিঠি লিখে উজ্জয়িনীকে কাঁহাতক সান্ত্বনা দেওয়া যায়? সে তো ছোট খুকীটি নয়।

বাদল যদি তাঁকে সামান্যমাত্র প্রশ্রয় দিত তাহলে উজ্জয়িনী অনেক দুঃখ সয়েও মোটের উপর সুখে থাকত, নিয়মিত স্বামীর চিঠি না পেলে ভাবত তিনি ব্যস্ত আছেন ও নিয়মিত তাঁর কুশল সংবাদ অন্য কারুর চিঠিতে পেলেই নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু বাদলটা এমন অমানুষ, ভদ্রতার খাতিরেও তাকে এক লাইন লেখে না। বাদল কি তবে সত্যি সত্যিই তাকে ছাড়বে? ছি, ছি! এমন গুণবতী সদ্বংশীয়া পাত্রী সে পেত

কোথায়? ইংরেজ বিয়ে করাই যদি তার অভিপ্রায় ছিল তবে কাকা-মশাইকে সেই কথা খুলে বললেই হত, তার ফলে যদি বিলেত আসা বন্ধ হত তাও সই। বিলেত আসার নানা উপায় ছিল, অপেক্ষা করলে হয়তো স্টেট্ স্কলারশিপ পাওয়া যেত, যদিও বেহারের ওরা বাঙালীকে ও-জিনিস কিছুতেই নাকি দেবে না। কয়েক বছর চাকরি করেও তো টাকা জমানো যেত। বাদলের যদি এতই আগ্রহাতিশয্য তবে সুধীকে বললে সুধী নিজের আসা বন্ধ করে বাদলকে অর্থ সাহায্য করত, অন্তত টাকা ধার দিত।

কিন্তু একটি মেয়েকে এমন করে বঞ্চনা করা, শুধু একটি মেয়েকে নয় তার ও নিজের পিতাকে পাকা খেলোয়াড়ের মতো চালমাৎ করা—এ দুর্বুদ্ধি বাদল পেল কোথায়? যার ব্যক্তিগত জীবনে এত বড় অন্যায় সে বিশ্বের অন্যায় দূর করবে, মস্ত চিন্তানায়ক হবে? বিশ্ব কি কখনো তার এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে?

বিয়েতে বাদলের মত ছিল না, সুধী সে কথা জানত। কিন্তু বিয়ের পরে সকলেরই মত বদলায়, এ কথাও সুধীর অজানা ছিল না। বৌ অপছন্দ হলে কেউ কেউ ভারি চটে যায়, এও সত্য। কিন্তু তা বলে কোন ভদ্র সন্তান বৌকে বয়কট করে না, বাদল যেমন করেছে।

বাদলকে এই বিয়েতে সুধী প্ররোচনা দিয়েছিল, দেবার সময় ভেবেছিল বিয়ের পর তার পাগলামি সেরে যাবে। এখন যে এর পরিণাম এমন হবে তা তো সে কল্পনায় আনতে পারে নি। এই তো তার বন্ধু চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের নাম শুনলে মারতে আসত, কিন্তু যেই বিয়েটি করা অমনি ভায়ার চেহারা আহ্লাদি গোছের হয়ে উঠল। ভায়া বিলেত এসে অবধি দুবেলা দুখানা করে প্রেমপত্র লিখে এক সঙ্গে চোদ্দখানা খাম ডাকে দিচ্ছে—একখানা লিখলে পাছে সেখানা হারিয়ে

যায়, দুখানা লিখলে পাছে দুখানাই হারিয়ে যায়! তাই চোদ্দখানা। সেগুলো মেল্-ডে'র দুদিন আগে পোস্ট করা চাইই—পাছে মেল্ ফেল্ হয়।

না, বাদলের শুভবুদ্ধির উপর সুধীর আস্থা আছে। এই সাময়িক ইংরেজিয়ানা সময়ের ধোপে টিঁকবে না। বাদল দেশেও ফিরবে, উজ্জয়িনীকে গ্রহণও করবে। আর উজ্জয়িনী? স্বামীর কাছে আদর না পেলে সব মেয়েরই ধর্মে মতি যায়। বিশেষত উজ্জয়িনীর কাছে ঠাকুর দেবতা যখন খুব একটা নতুন জিনিস। ওটাও সাময়িক। ধোপে টিঁকবে না।

তবু কী জানি কেন সুধীর অন্তর থেকে হাহাকার উঠতে লাগল। বাদল হয়তো সত্যিই ভারতবর্ষে ফিরবে না, ভারতবর্ষের প্রতি কোনো দিন তার মমতা ছিল না, দেশে থাকতে সে সারাক্ষণ বিদেশী বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকত, দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে ভুলেও দৃক্‌পাত করত না। কলেজে তার বন্ধু ছিল না একটিও—এক সুধী ছাড়া। যারা তাকে শ্রদ্ধা করত, তারাও তাকে দাম্ভিক মনে করে ভয়ে তার কাছে ঘেঁষত না। যারা তাকে গ্রন্থকীট ইত্যাদি বলে তার প্রতিভাকে উড়িয়ে দিত তারাও তার সম্মুখীন হতে সাহস পেত না। অধ্যাপকদের বাদল অবজ্ঞা করত, অধ্যাপকরাও বাদলকে কথাটি কইতেন না। এ হেন বাদল দেশে ফিরে বিদেশীর মতো বোধ করবে। তাই নাও ফিরতে পারে।

আর উজ্জয়িনীই কি বাদলের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের সহধর্মিণী হতে পারবে? প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহধর্মিণী হতে পারা অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ। কেবল সহিষ্ণুতা নয়, আত্মবিলোপসাপেক্ষ। উজ্জয়িনীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জ্বল্ জ্বল্ করছে। সেই বা বাদলকে সইতে রাজি হবে কদিন?

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বিচ্ছেদ, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো কুৎসিত ব্যাপার অল্পই আছে। বনিবনা হল না, অত্যন্ত খেদের বিষয়, তুমিও পৃথক থাক, আমিও পৃথক থাকি। কিন্তু পুনর্বিবাহ! ছি, ছি! জীবনে শুধু একবারমাত্র বিবাহ করা যায়, সে উৎসবের পুনরাবৃত্তি অসুন্দর।

উজ্জয়িনীর মনটাকে ধীরে ধীরে সুন্দর উদার অনুশোচনাহীন বিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। সে যেন নিজেকে হতভাগিনী ভেবে জীবন্মৃত না হয়, যেন রক্তমাংসের ক্ষুধায় জর্জর না হয়, যেন কঠিন আত্ম-নিপীড়নের দ্বারা জীর্ণ না হয়। অবিবাহিত থেকেও তো কত নারী মহীয়সী হয়েছেন। যেমন এলেন কেই। উজ্জয়িনীও প্রকৃতপক্ষে অবিবাহিতা।

বেশ, বেশ, সিস্টার নিবেদিতাই হোক সে। কিংবা মীরাবাই। দুটিই বড় মনোহর আদর্শ। কিন্তু উজ্জয়িনী নিজেই তৃতীয় একটি মনোহর আদর্শ স্থাপন করুক। তার প্রতিভাশালী স্বামীকে সে অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তি দিল এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ থেকে বিনষ্টি থেকে রক্ষা করল। অন্যথা তাঁকেও ক্ষতিগ্রস্ত করত, নিজেকেও। এইরূপ যে বিচ্ছেদ এ তো প্রকারান্তরে মিলন।

উপেক্ষিতা

১

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার॥

বীণা নিবিষ্ট মনে ও বিনম্র স্বরে পাঠ করছে, বীণার শাশুড়ী মালা জপ করতে করতে ব্যাখ্যা করছেন, উজ্জয়িনী স্তব্ধ হয়ে শুনছে। তার চোখে জলের আভাস।

শাশুড়ী বলছেন, "স্বধর্মাচরণ বেশ ভালো জিনিস বৈকি; জীবমাত্রেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করলে তবে তো সৃষ্টি থাকবে; কিন্তু ওর ভিতরে একটু কথা আছে মা। সেই জন্যেই গৌরচন্দ্র বললেন এটা বাহ্য। না, না, বাজে নয়, বাজে নয়।"—মুচকি হেসে আপন মনে বলে যাচ্ছেন, "বাহ্য। তার মানে বাহ্যিক। তুমি আমি স্বধর্মাচরণ করছি কিছু একটা ফল কামনা করে। নিজে সেই ফল ভোগ করব এই আমাদের অভিলাষ। গৌরহরি বললেন, এ তো বাহ্যিক। এর থেকে গূঢ় কিছু জান তো বল। রায় রামানন্দ বললেন, আছে বৈকি প্রভু।"—হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন, "আছে। ফলটুকু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে হবে। আমি কাজ করে যাব, তিনি ফল ভোগ করবেন। আমি রাঁধব, তিনি খাবেন। আমি ঘর বাঁধব, তিনি বাস করবেন। আমি ধন সংগ্রহ করব, তিনিই মালিক হবেন। বুঝলে না, মা!"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—হ্যাঁ, বুঝেছে।

বীণা আবার পাঠ করছে :—

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্মত্যাগ সর্ব সাধ্য সার।

শাশুড়ী বললেন, "ওমা আমার কী হবে! বল কি গৌর, এও বাহ্য? এঁ্যা!"—মুচকি হেসে বলছেন, "একটু মজা আছে। কর্ম করব কেন? কী দরকার? যিনি এত বড় জগৎ চালাচ্ছেন তিনি কি আমারই সামান্য কর্মটুকুনের উপর নির্ভর করেন? বল তো মা। আমি খাওয়ালে তিনি খাবেন, নইলে খেতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হল?"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—না, তা কি হয়!

শাশুড়ী বলছেন, "মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করা কি সহজ? কত বড় বড় নৈয়ায়িককে তর্কে পরাস্ত করেছেন যিনি, রায় রামানন্দ কিনা তাঁকে করতে চান পরীক্ষা। বলে ফেললেই তো হয় যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব সাধ্য সার। না, সে কথাটা বলবার নাম করবেন না। এটা বলবেন, ওটা বলবেন, সেটা বলবেন না। ভারি বুদ্ধিমান লোক, তার সন্দেহ কি? কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় কি পারবেন? দেখো তোমরা শেষে তিনি কেমন—না, না, আগে থেকে বলে ফেলব না, মা।"

থেমে বলছেন, "হঁ্যা, কী বলছিলুম। একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। কাজকর্ম ছেড়ে দিতে হবে। তাঁকে বলতে হবে, ঠাকুর, তোমার কাজ তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও তো করিয়ে নাও। যা তোমার খুশি। আমি তোমাকেই জানি, তোমাকেই ভালোবাসি, তোমাকে ভেবে আনন্দ পাই, তোমাকে দেখে কৃতার্থ মানি। আমাকে খাটিয়ে নিতে চাও তো নাও, কিন্তু আমি তোমার সুমুখ থেকে স্বেচ্ছায় এক পা নড়ব না।"

উজ্জয়িনী এবার বুঝতে পারছে না, কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে

সংকোচ বোধ করছে। শাশুড়ী সেটা অনুমান করে বলছেন, "বুঝবে, মা, বুঝবে ক্রমে বুঝবে। সব কি একদিনে হয়। তোমার বয়সে আমরা কী অবোধ ছিলুম, কী পাতকী ছিলুম। তাঁর কৃপা না হলে কি কেউ কিছু বুঝতে পারে! তোমার উপর তাঁর এখন থেকেই কৃপা দেখে বড়ই আশ্চর্য হয়েছি, মা।"

উজ্জয়িনীর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। সে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বীণার শাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে কী বলতে চাইছে, কিন্তু তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তার হৃদয় ভাবাবেগে আকুল হয়ে তার চোখ দিয়ে ঝরণার মতো ফুটে বেরচ্ছে ছুটে বেরচ্ছে।

শাশুড়ী বলছেন, "থাক্, মা থাক্। হয়েছে, খুব হয়েছে। পাগলী মা আমার। কত বড়লোকের মেয়ে, কত বড়লোকের বৌমা, কিন্তু কী চমৎকার স্বভাব! ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ!"—তিনি উজ্জয়িনীর চিবুক স্পর্শ করে সেই হাত নিজের মুখে ছোঁয়ালেন।

রোজ দুপুরে উজ্জয়িনী বীণাদের বাড়ী যায়। ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয়। কোনোদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কোনোদিন শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, কোনো-দিন শ্রীপদকল্পতরু। এমন জিনিস পৃথিবীতে ছিল সে জানত না। এত দিন কেউ তাকে জানায়নি বলে সকলের উপর তার অভিমান—বাবার উপর, স্বামীর উপর, সুধীদার উপর। ওঁরা নিজেরাও যেমন বঞ্চিত উজ্জয়িনীকেও তেমনি বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু ভগবান তো আছেন, তিনি উজ্জয়িনীর উপর কৃপা করে বীণাকে ও বীণার শাশুড়ীকে পাঠিয়ে দিলেন। করুণাময়ের করুণা! যতদিন তাঁর করুণা না হয় ততদিন বঞ্চিত থাকা ছাড়া উপায় কী!

দিবারাত্র একটা আবেশের মধ্যে বাস করে—স্নান করে, আহার করে, আলাপ করে, চিন্তা করে, ধ্যান করে, শয়ন করে। অকারণে

তার মন কেমন করে, কারুর জন্যে নয়, এমনি। চোখ দিয়ে হু হু করে গরম জল উথলে পড়ে, দেহে রোমাঞ্চ লাগে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত তড়িৎ রেখা ছুটে যায়। বীণা শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে ভাবে কিন্তু লজ্জায় পারে না—"মা, হবে তো? আমার মুক্তি হবে তো? অধম পাতকী আমি, মূঢ়মতি দুর্মতি!"

বীণা সেদিনকার মতো পাঠ শেষ করছে :—

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমাণ।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।"

শাশুড়ী সগর্বে বলছেন, "কেমন, মা, শুনলে তো? শুনলে তো রায় নিজ মুখে স্বীকার হলেন যে প্রভুর সঙ্গে এ ভুবনে কেউ পারবে না! কাল শুনো রায় আরো কী বললেন। সে ভারি মজা। একেবারে নাকে খৎ যাকে বলে। বললেন, আমি কিছুই না জানি। যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।"

শাশুড়ী জোরে হেসে উঠছেন। বীণা বাধ্য হয়ে হাসির ভান করছে। এত বড় একটা তামাশার কথা, না হাসলে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু উজ্জয়িনী হাসতে পারছে না। সে ভাবছে শ্রীরাধার প্রেম কি মানুষে সম্ভব? জীব যতদিন শ্রীরাধার মতো প্রেমিকা না হয়েছে ততদিন কি তার মুক্তি সম্ভব?

শ্রীরাধার কথা ভাবতে তার কী যে ভালো লাগে। পদাবলীর শ্রীরাধার সঙ্গে ইতিমধ্যে তার পরিচয় হয়েছে। "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি

অবনী বহিয়ে যায়," "রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা," "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম," ইত্যাদি তার মুখস্থ হয়ে গেছে। গান তার আসে না। তবু যখন একা থাকে তখন আপন মনে গুন্ গুন্ করে গায়। বেচারি রাধিকার জন্যে তার শোক উথলে ওঠে। যে কৃষ্ণ তাঁকে এত ভালো-বাসলেন ও ভালোবাসালেন সেই কৃষ্ণ কিনা একদিন তাঁকে ফেলে মথুরায় চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন না। রাধার দুঃখ জানাবার জন্যে নাকি ব্রজের গোপবালকরা অবশেষে তাঁর কাছে গেছল। তিনি নাকি তাদের চিনতেই পারলেন না, পারবেন কেন, তিনি যে তখন মথুরায় রাজা!

নিজের জীবনের সঙ্গে রাধিকার জীবনের কথা মিলিয়ে উজ্জয়িনীর ব্যথা দ্বিগুণ হয়। বাদল কি কোনোদিন বিলাত থেকে ফিরবে? উজ্জয়িনী যখন শ্বশুরের সঙ্গে বিলাত যাবে তখন তাকে কি বাদল স্ত্রী বলে স্বীকার করবে?

উজ্জয়িনীর চিন্তার জল কোথা থেকে কোথায় গড়ায়!

২

উজ্জয়িনী তার বাবাকে ভোলেনি। সে নিজে যে আনন্দ পাচ্ছিল তার বাবাকে—শুধু তার বাবাকে কেন, বিশ্বের সব সংশয়বাদীকে —সেই আনন্দের বার্তা দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। তার সংশয় ছিল না যে অন্যান্য সংশয়বাদীরাও তারই মতো আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হবে এবং উদ্বাহু হয়ে হরিসংকীর্তনে নামবে। তাই তার বাবাকে অতি গদ্‌গদ ভাবে তার অভিনব অভিজ্ঞতার সংবাদ দিয়েছিল। উত্তরে তিনি লিখেছেন—

মা, তোর দিদিদের আচরণ আমাকে তেমন ব্যথিত করেনি

কোনোদিন, তোর এই শোচনীয় অধঃপতন আজ যেমন করছে। ছি ছি খুকী, তুই করছিস কী, হয়েছিস কী! এতদিন তোকে হাতে গড়লুম, তোর মনটা যাতে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয় তার জন্যে তোকে শিশু বয়স হতে বিজ্ঞানশিক্ষায় ব্রতী করলুম, যুক্তি এবং তথ্য এই দুই অশ্বকে দিয়ে তোর কৈশোরের রথ পরিচালন করলুম, সারথি স্বয়ং আমি। আজ দেখি তুই শত্রুপক্ষের শিবিরে ভাবাবেশে ধেই ধেই করে নাচছিস, অবসাদে ঢলে পড়ছিস, অশ্রুরসে গলে পড়ছিস। ধিক্!

তোর মধ্যে আমার সনাতন স্বদেশের সনাতন দুর্বলতাকে প্রত্যক্ষ করে আমার আর কিছুতে মন বসছে না। দূর হোক্, কী হবে এ দেশে দর্শনচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, বিশুদ্ধ যুক্তি তথ্যের উপাসনা, scientific attitude! রক্তের মধ্যে নেশার প্রতি টান ইংরেজের ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, কিন্তু ইংরেজ তো স্থায়ী হবে না, কাল ওরা গেলে পরশু আমরা তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ নিয়ে বোতল হাতে-করা মাতালের মতো বুঁদ হয়ে যাব, চুর হয়ে যাব। ইংরেজী শিক্ষা যে আমাদের রক্তে মেশেনি তার প্রমাণ তো ভূরি ভূরি দেখছি। বৃথাই এতদিন এত ইন্‌জেক্‌শন নেওয়া, দুর্বলতা তো জীবাণু নয় যে ইন্‌জেক্‌শনে মরবে।

হতাশ হয়ে গেছি, খুকী। তুই যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তবে ভারতবর্ষের অতীত কে!

বাদলের উপর এখনো আমার ভরসা আছে। সেই হয়তো এই মরা দেশে ভাগীরথীর ধারা আনবে। যতটুকু তার সঙ্গে আলাপ করেছি, করে আশান্বিত হয়েছি। টাকা সিকি আধুলি দুয়ানি কোনো কিছুকে সে না বাজিয়ে নেয় না। যতই হোক না কেন তার বাজার দর, যতই

থাকুক না কেন তার উপর রাজার মাথার ছাপ। মানি না বলতে পারা সহজ, আজকালকার অনেক ছেলে তো কিছু মানে না, তার কারণ দর্শাতে পারে একমাত্র বাদল। বাদল যেমন মানে না তেমনি মানেও। বিচার ফল, পরীক্ষা ফল, গবেষণার ফল তার কাছে আসল টাকার মত দামী।

বাদল হয়তো জীবনে কিছু করে যেতে পারবে না, আমাদের দেশে আমরা কাউকে কিছু করে যেতে দিই না, কেবল বিবাহ চাকুরী ও বক্তৃতা ছাড়া। আমার জীবন যেমন স্ত্রী-কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যয়িত হল ওর জীবনও হয়তো তেমনি ব্যর্থ যাবে। বড় জোর চাঁদা দিয়ে দু-চারজন দরিদ্র ছাত্রকে কলেজে পড়াবে, দু-একটা ইস্কুল কি লাইব্রেরী কি হাসপাতাল বসাবে, সরকারী চাকুরে হয়ে খদ্দর পরে তাক লাগিয়ে দেবে। এমনি করে তার নিজের জীবন আমাদের শিক্ষিত সাধারণের জীবনের মতো ট্র্যাজিক হবে। না, না, ট্র্যাজেডী অত সস্তা নয়, অত একঘেয়ে নয়, আমাদের ব্যর্থতা নিয়ে কোনো কবি ট্র্যাজেডী লিখবেন না। বীরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে ট্র্যাজেডী, স্থবিরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে প্রহসন। আমরা মনের দিক দিয়ে জন্ম-স্থবির। ছাত্র-জীবনে দু দিনের জন্যে দপ করে উঠি, চাকুরী জুটলে বিবাহ করে নিভে যাই।

তবু বাদলের উপর আমার এইটুকু ভরসা আছে যে সে কিছু না করতে পারুক তার scientific attitudeটিকে সারা জীবন জীইয়ে রাখবে। ওটা বড় কম কঠিন কাজ নয়, ওই তো সত্যকারের দেশের কাজ। আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষে অন্নবস্ত্রের অভাব হয়তো ঘুচবে না, দারিদ্র্য এই রকমই লেগে থাকবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ পর্যবেক্ষণ করবে পরীক্ষা করবে সিদ্ধান্ত গড়বে সিদ্ধান্ত ভাঙবে, কোনোরূপ সহজ মীমাংসাকে প্রশ্রয় দেবে না, প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধকে সন্দেহ করবে। যখনি অলৌকিক

কিছু দেখবে বা শুনবে অমনি একবার ডাক্তারকে দিয়ে চক্ষু বা কর্ণ পরীক্ষা করিয়ে নেবে। ম্যাজিককে প্রাণপণে ঘৃণা করবে, miracleকে যতদিন নিজে ঘটাতে না পারে ততদিন হেসে উড়িয়ে দেবে। তা বলে কেবল বৈনাশিক হবে না, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়বে ও ঈশ্বরভক্তকে প্রণাম করবে। তবে এও সমস্তক্ষণ মনে রাখবে যে অল্প বয়সে কোনো নদীর গভীরতা নির্ণয় করতে নামা নিরাপদ নয়। বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা মনকে মজবুৎ করে পাকা ডুবারীর মতো আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রে অবতরণ করবে। দর্শনের সঙ্গে ভক্তির, যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের, নীতির সঙ্গে লোকাচারের ও জ্ঞানের সঙ্গে পারলৌকিক পাটোয়ারীবুদ্ধির গোঁজামিলন দেখতে দেখতে বুড়া হয়ে গেলুম। যেমন প্রাচীন ভারত তেমনি আধুনিক ভারত—গোঁজামিলনের দুই বিরাট ওস্তাদ। গোঁজামিলনকে সমন্বয় নাম দিয়ে বিবেকানন্দের দল বেশ কিছু দিন কালোয়াতীর আসর জমালেন। এতদিনে এরা এঁদের যথোপযুক্ত কর্ম পেয়ে গেছেন। সেটা দরিদ্র নারায়ণ সেবা। এদের পূর্বে ব্রাহ্মরা উপনিষদের সহিত বাইবেলের ও উভয়ের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের গোঁজামিল ঘটিয়ে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন ; ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে সমাজ সংস্কারই তাঁদের প্রকৃত কাজ। আমার পিতা আনুষ্ঠানিকতা পরিত্যাগ করে শুদ্ধমাত্র সংস্কারকার্য ব্রতী হলেন।

আজ ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল হতে কী এক উদ্যমের বার্তা কানে আসছে। কামনা করি তা গোঁজামিলনের অতীত হোক। তবু দেশের মাটির উপর সন্দেহ ধরে গেছে, খুকী। দেশের জল বাতাস মানুষকে পূরাদমে খাটতে দেয় না। মানুষ চালাকি দিয়ে ফাঁকি পুষিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এখনি তো শুনছি ওরা বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা ও করুণা করছেন। বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বগুলো নাকি যোগবলে আবিষ্কার করা

যেতে পারে, scientific method-এর নাকি কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। এ সব শোনা কথা, সত্য কি না জানি না, সত্য হলে ভীত হব। চিরকাল একদল মানুষ লোহাকে অবজ্ঞা করে সোনা তৈরি করবার কৌশল খুঁজেছে। অথচ আজ আমরা জানি লোহা বড় তুচ্ছ ধাতু নয়; লোহা ছিল বলেই এত বড় সভ্যতার বিপুল উপকরণসম্ভার সম্ভব হল নইলে এঞ্জিন হত না, যন্ত্র হত না, রেল হত না, পুল হত না, এমন কি সামান্য একটা ছুঁচ হত না। লোহা এবং কয়লা মিলে সভ্যতাকে এতদূর এগিয়ে দিয়েছে, লোহা এবং পেট্রোলিয়াম মিলে আরো অনেক দূর নিয়ে যাবে। তোমার সোনা তো অত্যন্ত শৌখীন ধাতু, ওর কাজ উপকরণ নির্মাণ নয়, উপকরণ বিনিময়সৌকর্য। তাও আজ বেহাত হয়ে কাগজের হাতে পড়ল। পণ্ডিচেরীর alchemistগণ মানবপ্রকৃতির লোহাকে সোনা করবার প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেকালের alchemistগণের মতো ভ্রান্ত পথে ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হলে পরে "al"-টুকুর মোহ কাটিয়ে শুধু chemist হবেন। তখন এই লোহাকে এর যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে এর দ্বারা কত কী করিয়ে নেবেন। সোনার দ্বারা এত কিছু করানো যেত না, সোনার যথার্থ কাজ অলঙ্করণ।

আমি বলি মানব-প্রকৃতিকে সকলে এক জোট হয়ে অবজ্ঞা করায় মানব-প্রকৃতির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। মানুষকে মুক্তি নির্বাণ salvation ইত্যাদির আশায় বিপথগামী না করলে মানুষ তার বিচিত্র প্রকৃতির অনুশীলন করতে করতে এতদিনে পথ পেয়ে যেত। স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন যেমন লৌহযুগকে পিছিয়ে দিল, নইলে দুই হাজার বছর আগে রোটারি মেশিনে বই কাগজ ছেপে বার হত, তেমনি দেব-প্রকৃতির মিথ্যা সম্মোহন মানব-প্রকৃতিকে দুই তিন হাজার বছর পিছিয়ে

রেখেছে। সময় নষ্ট করতে নেই, মৃত্যুর পরের কথা পরে বোঝা যাবে, আপাতত যতদিন বেঁচে আছি ততদিন যেন মানব-প্রকৃতিকে সহজ চরিতার্থতা দিই—খাই, শুই, কাজ করি, খেলা করি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করি, আঁকি, লিখি, গাই, বাজাই, নাচি, ঝগড়া করি, সন্ধি করি, ঘরে ডেকে আতিথেয়তা করি, ছুটে যেয়ে সেবা সাহায্য করি, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ পাতাই ও দুজনে মিলে বংশরক্ষা করি। "Give human nature a chance"—এই আমার বাণী।

৩

পত্রসূত্রে পিতার সঙ্গ পেতে উজ্জয়িনীর বিশেষ ভালো লাগে। তার পিতা তিনি, বন্ধু তিনি, গুরু তিনি। কিন্তু অধুনা তাঁর পত্র উজ্জয়িনীকে পীড়া দিচ্ছে। ছেলের সঙ্গে মতের অমিল হলে মায়ের মনে যেমন পীড়া লাগে। বিশেষত সে মত যদি ধর্মবিশ্বাসসংক্রান্ত হয়। উজ্জয়িনী তার ঘরের দেয়ালে লম্বমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে বলে, "প্রভু, তুমি রাগ কোরো না, বাবা অতবড় পণ্ডিত হলে কী হয় সার্বভৌমের মতো একদিন পরম ভক্ত হবেন।

অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি।
নাচে গায়, কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি॥

বেচারা বাবা! কোনোদিন তোমার কৃপা হল না তাঁর উপর, আপনা থেকে তো কেউ হরিভক্ত হতে পারে না!"

বাবার চিঠি দুতিনবার পড়লে হয়তো তার মর্ম গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু না, পড়তে চায় না, কি হবে পড়ে! যারা জন্মান্ধ তারা জন্মান্ধের মতোই তর্ক করবে, সূর্য চন্দ্র উড়িয়ে দেবে, তর্কের স্বপক্ষে এমন সব কথা বানিয়ে বলবে যার উত্তরে শুধু একটা দেশলাইকাটি জ্বাললেও ঢের হয়,

কিন্তু জন্মান্ধ যে! তার থেকে আলোর সত্যতার প্রমাণ পাবে না। স্বয়ং শ্রীভগবান ছাড়া এদের উদ্ধার করবার ক্ষমতা আর কারুর হাতে নেই। মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

উজ্জয়িনী বীণার শাশুড়ীর ইষ্টদেবতা অষ্টধাতুর গোবিন্দজী মূর্তির সেবা দেখতে যায়। তার শ্বশুর আজকাল প্রায়ই সফরে বেরন, অস্থায়ীভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।

ভোর হল, শাশুড়ী ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান করে এসেছেন, ফুল তুলে এনেছেন। গোবিন্দজীর ঘুম ভাঙল, গোবিন্দজী স্নান করলেন, প্রসাদ সেবন করলেন। এ তাঁর প্রাতর্ভোজন। যথাকালে মধ্যাহ্নভোজন হবে, গোবিন্দজী শয়ন করবেন, চামর ঢুলানোর দরকার হবে। অপরাহ্ণে তাঁর ঘুম ভাঙলে আর একবার ভোজন। নূতন সজ্জা। ফুলের মালা পরিধান। তারপর তাঁর আরতির সময় হবে। ধূপধুনা জ্বলবে। শাঁখ বাজবে, কাঁসি বাজবে, ঘণ্টা বাজবে। স্বয়ং কমলবাবু ঘণ্টা বাজাবেন, বীণা বাজাবে শাঁখ, উজ্জয়িনী কাঁসি। গোবিন্দজী কিছুক্ষণ ছুলবেন। রাত্রিভোজন করবেন। নিদ্রা যাবেন।

উজ্জয়িনী এতদিন জানত বীণারা মাত্র তিনজন মানুষ। তা তো নয়। ওরা চারজন। গোবিন্দজী ওদেরই একজন। তাঁকে ওরা ধাতুমূর্তি বলে ভাবতে পারে না, তিনি যদি ধাতুমূর্তি হন তবে ওরাই বা এমন কী! ওরাও তো মৃৎপিণ্ড মাত্র। গোবিন্দজী খাচ্ছেন, পাখা হাতে করে হাওয়া করতে হবে, বড় গরম খাবার মুখে দিতে ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হবার কথা। গোবিন্দজী ঘুমোচ্ছেন। চুপ চুপ চুপ। জোরে কথা কইলে ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে। বাইরে কে ডাকাডাকি করছে, ওকে চুপ করতে বল তো ঝি।

প্রতিমা যে কত জীবন্ত, কত সত্য হতে পারে উজ্জয়িনী প্রত্যক্ষ

করল। কে বলবে গোবিন্দজীর প্রাণ নেই! আহা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কী হাসি, কী চাউনি! মাঝে মাঝে বেশ মনে হয় গোবিন্দজী সব কথা শুনছেন, শুনে টিপে টিপে হাসছেন। শাশুড়ী বলেন, "ও কি কম পাজী! ঐখানে বসেই সমস্ত সৃষ্টি চালাচ্ছে, গোপিনীদের সঙ্গে কেলি করছে, শুক-সনকাদি মুনিরা তপস্যা করে ওর দেখা পাচ্ছেন না, ঐটুকুটুকু পা দিয়ে বলি রাজাকে পাতালে চেপে রেখেছে।"

উজ্জয়িনীর কল্পনাচক্ষু স্বর্গ মর্ত পাতাল পরিক্রমা করে, বৃন্দাবনে আটকে যায়। আছে, আছে, এখনো বৃন্দাবন ঠিক সেই রকমটি আছে। রাধা তেমনি অভিসারিণী, কৃষ্ণ তেমনি বংশীধারী। কেউ চর্মচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করতে পায় না, মানবীয় শ্রুতিপথে শ্রবণ করতে পায় না। তবু কল্পনাবৃত্তির চালনা করলে আভাসটা ইঙ্গিতটা পায়। ভক্তিবৃত্তির চালনা করলে কিছুই অগোচর থাকে না। ধন্য বীণার শাশুড়ী। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন সৃষ্টিপরিচালন, বৃন্দাবনলীলা, শুক-সনকের তপস্যা, বলির প্রতি ছলনা! কী সাহস তাঁর, বলেন কিনা "পাজী!" ভক্তি কত বেশী হলে সাহস এত বেশী হয়!

এই উপলব্ধির কাছে দরিদ্রসেবা, সমাজসংস্কার, দেবপ্রকৃতি পরিগ্রহ, দেশের স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব—সব তুচ্ছ, সব উপেক্ষণীয়। সারাক্ষণ তাঁকে দর্শন করতে স্পর্শ করতে সেবা করতে চাই। অন্য কিছু করবার জন্যে সময় কই? উজ্জয়িনীর ঘুম মাঝরাত্রে ভেঙে যায়, ভোর হতে আর কত দেরি? ফুল তুলতে হবে যে! গঙ্গাস্নানে যাবার জো নেই, শ্বশুর শুনতে পেলে বকবেন, ভোরবেলা স্নান করে উঠলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ভারি তো ঠাণ্ডা লাগা। লাগুক না একটু। ঠাণ্ডা লাগলেই যদি নিমোনিয়ায় দাঁড়াত, আর নিমোনিয়া হলেই যদি মরণ হত তা হলে দুনিয়া উজাড় হয়ে যেত। আর মরণ হলেই বা কী! কৃষ্ণনাম জপ

করতে করতে মরবে, বৃন্দাবনে গোপী হয়ে জন্মাবে, গোপীরা তো মুক্ত হয়েই আছে, মুক্তির ভাবনা করতে হবে না।

৪

বিলাতী মেল! সুধীবাবুর চিঠি। পাটনার ঠিকানায় উজ্জয়িনীর নামে সুধীবাবুর চিঠি এই প্রথম এল। বিলাতে কি অন্য কোনোরকম ডাকটিকিট চলে না কিংবা বার হয় না? ঐ সনাতন রাজার মাথা, তাও মুকুটহীন ও প্রায় টাকপড়া? আমেরিকার ডাকটিকিটে কেমন ওয়াসিংটন ফ্রাঙ্কলিন লিঙ্কন। জার্মানীর ডাকটিকিটে কেমন গ্যয়টে কাণ্ট বিস্‌মার্ক। ফ্রান্সের টিকিটে কেমন—

সুধীর চিঠি পড়ে উজ্জয়িনী থ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার নিঃশ্বাস পড়ল না, যখন পড়ল তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। অনেকক্ষণ তার চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে রইল, যখন বইল তখন দুচোখ বেয়ে বইল।

বাদলকে তো সে সত্যি ভোলে নি। 'ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা।' তার কঠিন গভীর তপশ্চর্যা বাদলেরই মুক্তির জন্যে, তার নিজের মুক্তি এমন কিছু জরুরি নয়। কিন্তু এ কেমন মুক্তি বাদল চায়? উজ্জয়িনীর সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে মুক্তি? বাদল তা হলে অন্যকে তার সঙ্গিনী করবে? উজ্জয়িনী এখন থেকে কী বাস্তবে কী কল্পনায় সর্বতোভাবে নিঃসঙ্গ? সুদূর ভবিষ্যতেও বাদলের সঙ্গ পাবে না জানলে কল্পনাও ফাঁকা হয়ে যায় যে! নীরস হয়ে যায় যে! কী নিয়ে উজ্জয়িনীর দিন কাটবে? ধর্ম নিয়ে? হঠাৎ তার মনে হল ধর্মকর্ম সব মিথ্যা, স্বামীই সব। বীণার ধর্মে মতি আছে, কারণ তার স্বামী আছে। বীণার শাশুড়ীর ধর্মে প্রেরণা আছে, কারণ তাঁর স্বামীর চিহ্ন আছে।

কিন্তু সেটা শুধু ক্ষণকালের জন্যে। পর-মুহূর্তে সে নিজেকে দৃঢ়

করল। নিবেদিতার কেউ ছিল না। পাশ্চাত্য মনস্বিনীরা কুমারী। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য স্বজন সংসার ত্যাগ করেছিলেন। উজ্জয়িনীও ত্যাগ করবার জন্যে বিয়ের আগে প্রস্তুত ছিল। ছেলেখেলার মতো একটা রাত্রের বিয়ে, তার দরুণ এমন কী পরিবর্তন ঘটেছে যে উজ্জয়িনী বাদলকে ধ্রুবতারা করে জীবনান্তকাল অবধি পথ চলবে?

উনিই আমার স্বামী, উনি আমার সঙ্গী হবেন।—এই বলে সে শ্রীকৃষ্ণের পটখানার দিকে চাতকের মতো চেয়ে রইল। আবার তার চোখ দিয়ে ও গাল বেয়ে ঝরণা ছুটতে লাগল, তার জামায় বাধা পেয়ে ছপ ছপ করতে লাগল। হেতুহীন অবাধ্য অশ্রুর উপর তার রাগ হল, রাগ করে চোখ দুটোকে অতিরিক্ত মুছতে মুছতে পদ্মের মতো লোহিত করে তুলল। তবু জল ক্ষরে, লোহিত পদ্মে শিশিরবিন্দু টলমল করে, ক্রমশ যখন জলাধিক্য হয় তখন সরোবরগর্ভে লোহিত পদ্ম ঢল ঢল করে।

সেদিন বীণা তাকে দেখে বলল, "সত্যি ভাই, কেমন করে পার?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য হয়ে বলল, "কী পারি?"

বীণা তার স্বভাবসিদ্ধ সংকোচের সঙ্গে বলল, "কিছু না, এমনি বলছিলুম।"

উজ্জয়িনী চেপে ধরল। বীণা বলল, "উনি এক দিনের জন্যে কোথাও গেলে আমি মরে যাই। বিলেতে যাবার কথা ওঁরও উঠেছিল। আমি বললুম, যাও না? কে ধরে রাখছে? উনি বললেন, বিলেতে না গিয়েও বিদ্যাসাগর হওয়া যায়। হ্যাঁ ভাই, তুমি তো ফিজিক্স্ পড়েছ, না?"

উজ্জয়িনী আবেগ দমন করে বলল, "পাগল!"

বীণা টের পেল না আঘাত কোনখানে লাগল। বলে চলল, "কোনো কাজে লাগলুম না ভাই। স্বামীর একেবারে অযোগ্য। কেন যে তিনি এত ভালোবাসেন আজো বুঝলুম না।"

উজ্জয়িনী সহসা বলল, "বল দেখি আমিই কেন এত ভালোবাসি?"

"কাকে?"

"তোমাকে?"

"যাঃ। তোমার যা কথা। ভারি দুষ্টু। আমাকে মুখ্যু দেখে ঠাট্টা করছ।"

"না ভাই বীণা। তোমা বিনা আমি আর কারুকে ভালোবাসিনে।"

"ওমা, আমার কী হবে! আর কারুকে ভালোবাসো না? সত্যি বলছ? তিন সত্যি? ইস! মেয়ের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে উনি কেমন সত্যবাদী।"

"তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কী করব বল!"

উজ্জয়িনীর ভাঙা কণ্ঠস্বর বীণাকে দমিয়ে দিল। কিছু একটা ঘটেছে নাকি? শুনেছে বটে সে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য কোনো কোনো পরিবারে হয়। কিন্তু তার জানাশুনা সকল স্বামীস্ত্রীই সুখী। সে ও তার স্বামী তো জন্মজন্মান্তর সুখী হয়ে এসেছে। যদিও তার একরত্তি যোগ্যতা নেই, তবু উনি নিজ গুণে অভাগীর সব দোষ ক্ষমা করেন।

অন্য কোনো মেয়ে হলে পীড়াপীড়িপূর্বক উজ্জয়িনীর মন থেকে কথা বার করত। কিন্তু বীণার স্বভাব অমন নয়। সে ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। তারপর উঠে গিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত এনে তাকে খাইয়ে দিল। বলল, "কল্যাণ হবে।" তবু উজ্জয়িনীর মুখখানা বিমর্ষ দেখে তার আর সহ্য হল না। সে আঁচলের খুঁট দিয়ে নিজের চোখ মুছতে লাগল।

উজ্জয়িনী হেসে উঠে বলল, "বাঃ, বেশ মেয়ে তো। ভালোবাসি শুনে খুশি হয়ে কিছু খাওয়াবে, না, কেঁদেই ভাসালে।"

বীণা লজ্জিত হয়ে বলল, "যাও। কী যে বল। আমার বুঝি ওসব শোনবার বয়স আছে!"

উজ্জয়িনী নেহাৎ অরসিক নয়। মাঝে মাঝে তারও মুখ খুলে যায়। বলল, "তার চেয়ে বল, যার তার কাছে কি ওসব শোনবার বয়স আছে! সকলে তো কমলবাবু নয়।"

বীণা খপ করে উজ্জয়িনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে তারপর কী মনে করে সরিয়ে নিল এবং নিজের দুই কান দুই হাতে বন্ধ করল।

৫

উজ্জয়িনী কথাটা ভেঙে বলল না, বলতে পারল না। বীণা তার বন্ধু বটে, কিন্তু বন্ধুকেও কি সব কথা বলা যায়? হয়তো বলা যায়, যদি তেমন-তেমন বন্ধু হয়, যদি সমদশাপন্ন বন্ধু হয়। স্বামীপরিত্যক্তার ব্যথা স্বামীসোহাগিনী কী বুঝবে! মনে মনে করুণা করবে, কিন্তু করুণা কে চায়?

বাবাকে লিখতে পারে না, মাকে জানাতে পারে না, বোনেরা পর। শ্বশুরকে বলবার মতো নয়, বীণার শাশুড়ীর সঙ্গে বয়সের দূরত্ব অনেক। সুধীবাবুকে ভালো করে চেনে না। তিনি তার দাদার মতো, তার ইচ্ছা করে তাঁকে দাদা বলে ডাকতে, কিন্তু অধিকার নেই। তিনি যদি দাদা হতে অসম্মত হন। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে মতেরও অমিল ঘটবে। উজ্জয়িনীর ধর্মকর্মকে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, অমর্যাদা করেছেন। তুচ্ছ গৃহকর্ম, রাঁধা আর খাওয়া আর খাওয়ানো—যা পশুতেও করে—তাই কিনা সুধীবাবুর মতে ধর্মের মতো করণীয়। বীণা ওকাজ করে তার স্বামীর জন্যে, স্বামীর জননীর জন্যে, উজ্জয়িনী কার জন্যে করে মরবে? তার স্বামী নেই, স্বামী না থাকায় শ্বশুরও নেই।

এ বাড়ীতে থাকা বিবেকসঙ্গত কি না উজ্জয়িনী ভাবতে আরম্ভ করল। বাবার কাছে ফিরে যেতেও মন চায় না। বাপ রে! সেখানে শুষ্ক নীরস বিজ্ঞান ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তবে সেটা মা'র অনুশাসনাবলী। তুমি এখন বিবাহিতা মেয়ে, তোমার এটা করা উচিত, ওটা শেখা উচিত, সেটা বলা উচিত। অমন করে হাসতে নেই, এমন করে চলতে নেই, তেমন করে পরতে নেই। মা ইতিমধ্যে বহুবার চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই মিশনারী বন্ধুনীকে পাঠাতে চেয়ে উজ্জয়িনীর উত্তর পাননি।

বীণাদের গোবিন্দজীকে ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবা যায় না। উজ্জয়িনী মনকে চোখ ঠারে—বাদলের মুখ থেকে তো ওকথা শোনেনি, শুনেছে সুধীর মারফৎ। বাদল নিজে বলুক, তারপর দেখা যাবে। ততদিনে নিশ্চয়ই একটা উপায় গোবিন্দ দেখাবেন। হয়তো বৃন্দাবনেই নিয়ে যাবেন, রাখবেন কোনো কুঞ্জে। কিংবা তীর্থে তীর্থে ঘোরাবেন। কোথাও থাকতে দেবেন না। লীলাময়ের লীলা। ভক্তকে দুঃখ দেওয়াই তো তাঁর চিরকেলে রীতি।

বাদলের উপর উজ্জয়িনীর অভিমান অন্য রূপ ধারণ করল। সে পদাবলী মন্থন করে অভিমানের কবিতায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়। শ্রীরাধাকে অবহেলা করে কিংবা বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণকথা চিন্তা করছেন, কৃষ্ণরূপ ধ্যান করছেন ও আত্মনিপীড়নের সীমা মানছেন না। উজ্জয়িনী চোখের জলে ডুবতে ডুবতে এই সব পড়ে। তার ভারি তৃপ্তি হয়। সে যে সকলের থেকে দুঃখিনী, সে যে যৌবনে যোগিনী, সে যে প্রিয়-প্রত্যাখ্যাতা এই পরম গৌরব। হবে, হবে, তেমন দিন হবে যেদিন বাদল অনুতপ্ত হয়ে উজ্জয়িনীর পায়ে ধরে সাধবে। গলদশ্রুনয়নে বলবে, তখন বুঝতে

পারিনি তুমি কী মহীয়সী, তখন চিনতে পারিনি তুমি দেবী। এত বড় তপশ্চর্যা ব্যর্থ যাবে না, এ কঠোর নিষ্ঠা এর নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে।

বাদল যদি তাকে চিঠি লেখে উজ্জয়িনী ঘটা করে উত্তর লিখবে। বাদলের রথ বাদলকে মথুরায় নিয়ে গেছে, বাদল রাজা হোক, অভাগিনী উজ্জয়িনীকে মন থেকে মুছে ফেলুক, বৃন্দাবনকে—ভারতবর্ষকে—ভুলে থাক্। উজ্জয়িনীর জীবন তো ব্যর্থ হয়ে গেছেই, কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে তার পরম সার্থকতা সে এক হিসাবে শ্রীরাধার চাইতেও দুঃখিনী, শ্রীরাধার ললিতা বিশাখাদি সখী ছিল, তার এমন কেউ নেই যার কাছে প্রাণের ব্যথা বলে হৃদয়ভার লঘু করতে পারে।

উজ্জয়িনী মেঝের উপর শোয়া শুরু করল। একটি হাতকে বালিশ করে, অন্য হাতটি দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টায়, চোখ মোছে। ঘর সংসারের কাজ দেখা চুলোয় গেল, ছাই ঘর সংসার, ঘর সংসারের কাজ তাকে কোন স্বর্গে নিয়ে যাবে শুনি? নিজের জন্যে সে কিছু দাবি করছে না, একবেলা চারটি ভাত (গোবিন্দজীর প্রসাদ হলেই ভালো হত, কিন্তু তার উপায় নেই), একটু দই (উজ্জয়িনী দই বড় ভালোবাসে), যে-কোনো ফল। বেঁচে থাকবার পক্ষে এই অনেক, কিন্তু কেন বেঁচে থাকতে হবে হে ভগবান বলে দাও। পৃথিবীতে কার জন্যে, কী জন্যে বেঁচে থাকা দরকার? যারা দেশকে স্বাধীন করছে, জন-সাধারণের দৈন্য দারিদ্র্য দূর করছে, পীড়িতের সেবা ও রুগ্‌ণের শুশ্রূষা করছে তারা দীর্ঘজীবী হোক, কিন্তু আমি উজ্জয়িনী কারুর উপকার করতে পারব না, আমি চাই নিজের মুক্তি, আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাও।

উজ্জয়িনী ভক্তিমার্গে বীণাকে ছাড়িয়ে গেল। বীণা তার ঐকান্তিকতা দেখে উল্টো বুঝল। ভাবল বেচারি বুঝি তার প্রবাসী স্বামীর জন্যে কাতর হয়ে পড়ছে ক্রমে ক্রমে। তবু মুখ ফুটে বলছে না। বিরহ

বীণার জীবনে দীর্ঘকালীন হয়নি, তার স্বামী থাকেন পাটনায় ও পিতা আরায়, সে বাপের বাড়ী গেলে স্বামী শনি রবিবার সেইখানে কাটিয়ে আসেন। কয়েক দিনের বিরহও বীণাকে কান্না পাইয়ে দেয়, তাই থেকে সে জানে যে মাসের পর মাস যে নারী প্রোষিতভর্তৃকা সে নারী জীবন্মৃত না হয়ে পারে না। পারে বটে তারা, যাদের কোলে শিশু ও হাতে বৃহৎ সংসারের ভার, অধিকবয়স্কা গিন্নীবান্নী মানুষ। আহা বেচারি উজ্জয়িনী!

বীণা বলে, "বাস্তবিক, ভাই, এ বড় অন্যায়। ছেলে বিলেত যাবে, যাক; কিন্তু তাকে বিয়ে দিয়ে পাঠানো কেন? তার নিজের মনেও কষ্ট, তার বৌয়ের মনেও কষ্ট। দুদিনেই মায়া পড়ে যায় যে। বেচারা বাদলবাবুরও কি কম কষ্টটা হচ্ছে! বিরহ, ভাই, এমন ধারালো জিনিস, এদিকেও কাটে ওদিকেও কাটে। ওর দেশবিদেশ নেই। বিলেতেও বাদলবাবু ঠিক তোমারি মতো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন।"

উজ্জয়িনী রসিকতা করে বলে, "হিম লাগলে কমল শুকিয়ে যায় জানি, কিন্তু বাদল যে নিজেই হিমশীতল।"

বীণা কানে আঙুল দিয়ে মিষ্টি হাসে। বলে, "যাও! যত সব বাজে কথা!"

৬

পাটনায় আসার দু'মাসের মধ্যে উজ্জয়িনীর এমন পরিবর্তন হবে কে জানত। যোগানন্দের কাছে বাদলের কাছে রায়বাহাদুরের একটা দায়িত্ব আছে। যোগানন্দ যদি বেড়াতে এসে বলেন, "য়্যাঁ! এ কী করেছ, মহিম! মেয়েটাকে ভদ্র-সমাজের অযোগ্য করে তুলেছ!" কিংবা বাদল যখন ফিরে এসে বলবে, "এই আমার স্ত্রী!" তখন রায়বাহাদুরকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

বেশ তো ছিল সে বহরমপুরে, তার মা-বাবার কাছে, তাকে পাটনায় এনে বৈষ্ণবী হয়ে ওঠার সুযোগ না দিলেই হত। তাকে বাধা দিতে সাহস হয় না, পরের মেয়ে, হাজার হোক। পাশের বাড়ীর সেই বুড়ীটা ও ছুঁড়ীটা কখন এসে দীক্ষা দিয়ে যায়, তারা ভদ্রমহিলা না হলে তাদের ধমকে দেওয়া যেত, কিন্তু ভদ্র পুরুষের এটুকু অধিকার নেই যে নিজের বাড়ীতে অপরিচিতা ভদ্রমহিলার যাতায়াত ঠেকায়।

এই ছুমাসের মধ্যে উজ্জয়িনী বড় কোথাও বেরয়নি। যাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেনি। রায়বাহাদুরের ব্যারিস্টার ও সিবিলিয়ান বাঙালী মুরুব্বিরা ইতিমধ্যেই পরিহাস করে বলেছেন যে জুনিয়র মিসেস সেন নাকি সিনিয়র মিসেস সেন-এর মতো পর্দানশীন। (যদিও বাদলের মা বহুকাল মৃত তবু রায়বাহাদুরের সমবয়সীদের পক্ষে পনেরটা বছর যেন সেদিন।)

অগত্যা রায়বাহাদুর মিসেস গুপ্তের প্রস্তাব অনুসারে মিসেস স্যামুয়েলসকে আনাবার চেষ্টা করলেন, উজ্জয়িনীর অজ্ঞাতসারে চিঠিপত্র চলতে থাকল। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ নিজের ছুই ছেলেকে ইউরোপীয় ইস্কুলে দিয়ে দেশীয় মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার জন্যে এক প্রাইভেট ইস্কুল খুলেছেন, কাজেই তিনি সহজে আসতে রাজী নন। তবু তাঁর টাকার টানাটানি এবং ইস্কুলের থেকে টাকা যা হয় রায়বাহাদুর তার ছুগুণ দিতে প্রস্তুত।

একদিন রায়বাহাদুর মফস্বলে গেছেন, একখানা ট্যাক্সি তাঁর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাল। উজ্জয়িনী প্রাতঃস্নান করে সবে ধ্যান করতে বসেছে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ক্রমশ বাদলের মূর্তি হয়ে উঠছে, ঠিক এমন সময় কে এসে বলল, “মা, মেমসাহেব এসেছেন।”

কোনো মেমসাহেবের এই অসময়ে আসার কথা ছিল না, বাঙালী

মেমসাহেব না ইংরেজ মেমসাহেব তাও জানা নেই। উজ্জয়িনী রাম-পিয়ারীকে জেরা করবে ভাবল। কিন্তু ততক্ষণ মেমসাহেবকে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই, তাঁর প্রতি অভদ্রতা হবে। নূতন করে কাপড় পরতেও সময় লাগে। উজ্জয়িনী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সেই কাপড়েই নেমে গেল, যা থাক্ কপালে।

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বোধ করি আশা করেছিলেন মিসেস গুপ্তের কন্যাকে দেখবেন তাঁরই মতো সুবেশা সুন্দরী, তাঁরই মতো সপ্রতিভ। উজ্জয়িনীকে চিনতে পারলেন না। বললেন, "আমি কি একবার মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা করতে পারি ?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য হয়ে বলল, "মিসেস সেন! কে তিনি? আপনি ভুল বাড়ীতে আসেননি তো ?"

ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত বোধ করলেন। "পিওন তো বলে এইটেই রায়বাহাদুর এম্-সি সেনের বাড়ী।"

"কিন্তু তাঁর স্ত্রী তো বেঁচে নেই।"

"আমি জানি। কিন্তু আমি যাঁকে চাই তিনি তাঁর পুত্রবধূ।"

তখন উজ্জয়িনীর মনে পড়ল যে তাকেও মিসেস সেন বলে ডাকা যেতে পারে। বাদল তাকে পত্নীত্ব থেকে বঞ্চিত করলেও পত্নীপদ থেকে বিচ্যুত করেনি।

সে লজ্জিত হয়ে বলল, "আমিই সেই।"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ তাঁর নামের কার্ড দিয়ে বললেন, "বটে? এত বড়টি হয়েছ? যখন তোমাকে বাঁকুড়ায় দেখেছিলুম তখন বোধ করি তোমার বয়স বছর দশেক ছিল। কিন্তু তোমার খ্রীস্টান নামটি ভুলে গেছি, মাই ডিয়ার।"

উজ্জয়িনী খ্রীস্টান নয়। মনে মনে বিরক্ত হল। কিন্তু এই স্নেহপরায়ণা

মহিলাটির কাছে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারল না। বলল, "বাড়ীতে আমাকে বেবী বলে ডাকত, কিন্তু আমার নাম উজ্জয়িনী। আমি বৈষ্ণব!"—গম্ভীরভাবেই বলল।

মিসেস স্যামুয়েল্‌সের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ঋজু, সুঠাম গড়ন। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। যতক্ষণ হ্যাট মাথায় দিয়ে বসেছিলেন ততক্ষণ তাঁর চোখদুটির সৌন্দর্য ঢাকা পড়েছিল, হ্যাট খুলে রেখে বললেন, "ডারলিং, আমি তোমার মায়ের বন্ধু, মায়ের মতো। তোমার মায়ের অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি। তোমার দিদিরা আমাকে আণ্টি বলে ডাকত মনে পড়ে। তুমিও তাই বলে ডেকো।"

মায়ের উপর উজ্জয়িনী কোনোদিন প্রসন্ন ছিল না। সে ছোটবেলায় ভাবত তার মা নেই, সে আকাশ থেকে তারার মতো খসে পড়েছে। বড় হয়ে বুঝল, মা আছে বটে, কিন্তু না থাকলেও চলত। এখন তার মনে হতে লাগল, না থাকলেই ভালো হত।

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে নিয়ে সে করে কী! তার ধর্মকর্মের মধ্যে তিনি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। তাঁর কাছে সর্বদা হাজিরা দেওয়া যায় না, অথচ তাঁকে সঙ্গ দেবার তাঁর তত্ত্ব নেবারও লোক চাই। বাঙালী হলে বাঙালীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাড়া বেড়াতেন। এঁর রান্নার ব্যবস্থা অবশ্য সহজেই হতে পারে, বাড়ীতে বাবুর্চি আছে, কিন্তু কে এঁর সঙ্গে বসে খাবে? মায়ের উপর উজ্জয়িনীর রোষ অহেতুক নয়।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল যে তার শ্বশুরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি যে কয়দিনের জন্যে মফস্বলে গেছেন ও কবে ফিরবেন এটা উজ্জয়িনীর অবিদিত হলেও মিসেস স্যামুয়েল্‌সের নয়। শ্বশুরের প্রতি মমত্ব তার এদানীং কমে আসছিল, সুধীবাবুর চিঠি পাবার পর। বাদল

যখন তার কেউ নয় তখন বাদলের পিতাও অনাত্মীয়। তাঁর উপর উজ্জয়িনীর অশ্রদ্ধা ধরে গেল। পুত্রবধূকে কোনো শ্বশুর এমন বিপদেও ফেলে যায়! তাও অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ।

৭

রায়বাহাদুর ইচ্ছা করেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, পাছে মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে অভ্যর্থনা করবার মুহূর্তে উক্ত মহিলার সম্মুখেই উজ্জয়িনী শ্বশুরের কাছে কৈফিয়ৎ চায়। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার ঠাহর হয়ে গেছে, এখনো যদি বা তার রাগ থাকে তবু বিস্ফোরকের মতো শব্দ করে ফেটে বেরবে না। এই ভাবতে ভাবতে তিনি সফর থেকে ফিরলেন।

উজ্জয়িনী শ্বশুরের সঙ্গে কথাটি কইল না। মিসেস স্যামুয়েল্‌সের কাছে শ্বশুরকে ইনট্রডিউস করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বললেন, "দিনটি চমৎকার। না?" রায়বাহাদুর বললেন, "হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ। হবেই তো, হবেই তো। আপনার আগমনে আনন্দে গিয়াছে দিক ছেয়ে। সিগ্‌রেট খান তো, ম্যাডাম?"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বললেন, "না। ধন্যবাদ।"

রায়বাহাদুরের বাস্তবিকই আনন্দ উথলে উঠছিল। একটা জ্যান্ত মেমসাহেব তার বাড়ীতে স্থায়ী অতিথি। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? কালকেই বাঙালী মহলে তাঁর প্রেষ্টিজ বেড়ে যাবে। পরশু ইংরেজ তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যাবে। তার পরের দিন গেজেট। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কায়েমী হলেন। রাজার জন্মদিনে নতুন খেতাবের ষোল আনা সম্ভাবনা রইল। মানুষের আর কী কাম্য থাকতে পারে?

"মাফ করবেন, ম্যাডাম, ট্রেনে আপনাকে আনতে যেতে পারিনি। চাপরাসী মোটর নিয়ে গেছল তো ঠিক ?"

"গেছল বৈ কি। আপনার করুণা।"

"হেঁ-হেঁ-হেঁ। Please don't mention it. মহাসম্মানিত অতিথি আপনি। আমি হিন্দু। আমাদের কাছে অতিথি হলেন স্বয়ং নারায়ণ।"

রায়বাহাদুর সাড়া না পেয়ে একটু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "You are divinely beautiful."

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ সতের বৎসর এদেশে আছেন। চাটুবাক্য ইতিপূর্বে অসংখ্যবার শুনেছেন। সেকেলে ধরনের ভারতীয়রা ওটাকে একটা নির্দোষ আর্ট জ্ঞান করে থাকেন। যেমন ইংরেজ দোকানদারও করে থাকে। তিনি শুধু একবার মুচকে হাসলেন।

রায়বাহাদুর আরো উৎসাহিত বোধ করলেন। প্রথম দিনেই অতিথির প্রতি এমন সব বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা প্রথম বয়সে আত্মীয়-বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য। অকস্মাৎ তাঁর তারুণ্য ফিরে এল বুঝি। কিংবা ভীমরতি এগিয়ে এল। যা হোক এমন কোনো ব্যবহার তিনি করলেন না যা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বা অসাধু। এক জাতীয় পুরুষ আছে তারা পোষা কুকুরের মতো। তারা মনিবকে কামড়ায় না, পরকে তাড়া করে যায়। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ রায়বাহাদুরকে এক আঁচড়েই চিনে নিলেন। নিরীহ প্রাণীর উপর রাগ করে কী হবে। একটু পিঠ চাপড়ে দেওয়াই বিধি।

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে সঙ্গ দেবার জন্যে রায়বাহাদুর টেবিলে খেলেন, আমিষ খেলেন ও উজ্জয়িনীকে বাধ্য করতে না পেরে বাইরে বিরক্ত হলেও অন্তরে আশ্বস্ত হলেন। উজ্জয়িনী উপস্থিত থাকলে রসের কথা হত না।

উজ্জয়িনী মেয়েটা যে আস্ত পাগল এবং তাকে সর্বতোভাবে মানুষ করবার ভার যে তিনি একা বহন করতে অপারগ এই কথাটা মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে বাছা বাছা ইংরেজী ফ্রেজ ও ইডিয়মের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করালেন। পরিশেষে বললেন, "হিন্দু আমিও। কিন্তু ঐ যে কুসংস্কার—ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার করব না কিংবা ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচব না—খাঁটি হিন্দুত্ব ওর বহু উর্ধ্বে। পাশের বাড়ীর মেয়েরা ওটা বোঝবার মতো বুদ্ধিবিদ্যার অধিকারিণী নন। উজ্জয়িনীকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনি ওর সেভিয়ার।"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌ শুধু ওষ্ঠবিকাশ করলেন। উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর পুনরায় তাঁকে হিন্দুত্বের মর্ম অবগত করালেন। ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার করব না, ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচব না, এগুলো অন্ধবিশ্বাসীদের বাড়াবাড়ি। রায়বাহাদুর এইমাত্র আহার করে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি বাড়াবাড়ির বিরোধী। এবার একটু নাচতে পারলেই প্রমাণটা সর্বাঙ্গীণ হত, কিন্তু কেউ শিখিয়ে না দিলে তিনি কেমন করে নাচবেন?

৮

উজ্জয়িনী কর্তব্য স্থির করতে পারছিল না। বাদল তার কেউ নয়। কাজেই এ বাড়ী তার বাড়ী নয়। এখানে যা ঘটছে ঘটুক, সে বাধা দেবার কে? কিন্তু বাদল ওকথা নিজ মুখে বলেনি, নিজে চিঠি লিখে জানায়নি। সুধীবাবুর কথাই কি চূড়ান্ত হতে পারে? তা যদি না হয় তবে উজ্জয়িনী এ বাড়ীর উপর থেকে অধিকার প্রত্যাহার করবে না, এখানেই থাকবে এবং এর অনাচার সহ্য করবে। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে সে আমন্ত্রণ করেনি, তিনি তার মায়ের পরামর্শে তার

শ্বশুরের অতিথি, এবং অতিথির যেটুকু প্রাপ্য তদতিরিক্ত পাবার দাবি রাখেন না। শাশুড়ীর অবর্তমানে উজ্জয়িনীই এ বাড়ীর গৃহিণী, অতিথি যেন সেটা স্মরণ রাখেন।

আবার তার চিন্তার ধারা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। অতিথি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বশুরের কাছে যেরূপ অভ্যর্থনা পেয়েছেন সেইরূপ চলতে থাকলে অচিরেই গৃহিণীর স্থান নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধবে। তখন উজ্জয়িনীকেই সরে যেতে হবে। তখনকার লজ্জা থেকে সে বাঁচবে কেমন করে? বাপের বাড়ী চলে যাবে—কিন্তু সে বাড়ীতেও লজ্জা, সে বাড়ীতে তার শ্রীকৃষ্ণের অসম্মান। আচ্ছা, দেখা যাবে তখন। অত আগে থাকতে ভেবে কী হবে! কোথাও যদি আশ্রয় না মেলে তবে তো ভালোই, তবে তো প্রভু নিজেই তাকে আশ্রয় দেবেন তাঁর বৃন্দাবনে। মীরার মতো সে গাইবে।—

চাকর রহসুঁ বাগ লগাসুঁ
নিত্ উঠ দরশন পাসুঁ
বৃন্দাবন কি কুঞ্জে গলিন্‌মে
তেরি লীলা গাসুঁ।

আহা, সে কী জীবন, কী সৌভাগ্য! বৃন্দাবন! শ্রীবৃন্দাবন! নীপতমালতরুপুঞ্জিত কুঞ্জ, কালিন্দীর উজান গতি, অদৃশ্য রাখালের বেণুধ্বনি, চির বসন্তের গীতগন্ধরূপময় উৎসব। আহা!

উজ্জয়িনী ভাবে, মানব মানবীর ছদ্মবেশে এখনো সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা শ্রীদাম সুদাম ললিতা বিশাখা চিত্রলেখা ইত্যাদি বিচরণ করছেন, কেবল চিনে নিতে পারলে হয়। ধবলী শ্যামলীর গোষ্ঠ হয়তো নেই, অঘাসুর বকাসুর পূতনা ইত্যাদি অবশ্য রূপকথা, কিন্তু যা শাশ্বত যা সাধকসাধারণ আবহমানকাল দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, যা

জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরামদাসের যুগেও বিদ্যমান ছিল তা কি আজ না থাকতে পারে! ঐতিহাসিক ঘটনা একবার ঘটে, ইতিহাসের মানুষ একবার জন্মায় ও একবার মরে, ইতিহাসের জগতে আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে। কিন্তু ইতিহাসরচয়িতার অগোচর একটি মায়ালোক আছে, তার সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁরা বলেন যে তার যৌবন অনাদ্যন্ত, তার অধিবাসিগণ অজরামর। এই সেই মায়ালোক আমাদের এই পৃথিবীতেই ছদ্মবেশে অবস্থিত।

উজ্জয়িনী অতিথিকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করল, কিন্তু তাঁকে ধরাছোঁয়া দিল না। বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরে বন্ধ থাকে, বই পড়ে, ধ্যান করে, চিন্তা করে। হঠাৎ খেয়াল হলে নেমে গিয়ে বীণাদের বাড়ীর দরজায় টোকা মারে। বীণা দরজা খুলে দিলে কৈফিয়ৎ দেয়, "এক জায়গায় ঠেকছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাধাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কেন? কী তাঁর অপরাধ?" বীণাটা সত্যিই মুখ্‌খু। জন্মাবধি এই সব পড়ছে, তবু এমন প্রশ্নের উত্তর জানে না, বোধ হয় কোনো প্রশ্নই তার মনে ওঠে না। তার শাশুড়ী তো স্পষ্ট বলছিলেন সেদিন, "আমরা সারা জীবন চর্চা করেও বৈষ্ণব শাস্ত্রের যা জানিনে উজ্জয়িনী এই এক মাসের মধ্যে তা জেনেছে। পূর্বজন্মের সুকৃতি আর শ্রীগোবিন্দের করুণা! নইলে এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ উজ্জয়িনীর শিক্ষায় ও সামাজিকতায় সাহায্য করতে এসেছেন, তার শ্বশুরের চাটুবাক্য শুনতে আসেননি। তিনি এসে অবধি উজ্জয়িনীর নাগাল পাচ্ছেন না। সে খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে, মিসেস স্যামুয়েল্‌সের সঙ্গে দেখা হলে বলে, "কেমন আছেন? রান্না পছন্দ হচ্ছে তো? ওবেলা আপনার কী কী ভালো লাগবে? আচ্ছা, আপনি স্যালাড ভালোবাসেন কি?" এর পর বলে,

"দেখুন আন্টি, আমি পাগল মানুষ। আমার দোষ ধরবেন না। আমার নিগূঢ় সাধনায় আমি যে আনন্দ পাচ্ছি সেই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।" মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ এর উপর বলবার মতো কথা পান না। বিমর্ষ হয়ে যান। তিনি স্নেহপ্রবণ মানুষ। তাঁর সন্তানরা দূরে। এই মেয়েটিকে আপনার করতে পারলে তাঁর সন্তানবিরহ উপশমিত হয়। কিন্তু দুজনের দুই স্বতন্ত্র ধর্মমত। তিনি শুনেছেন কৃষ্ণ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও কুটিল ব্যক্তি ছিলেন, মোটেই যীশুর মতো নির্মলচরিত্র না। হিন্দুরা যে কেন তাঁর মূর্তি পূজা করে তা নিয়ে তিনি বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। অথচ বিশুদ্ধ কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করতেও পারেন না। গীতার অনুবাদ তাঁকে স্থলে স্থলে আশ্চর্য করেছে। কিন্তু ওগুলির উপর নিশ্চয়ই খ্রীস্টধর্মের প্রভাব পড়েছে। কেমন করে পড়েছে ও কবে পড়েছে তিনি বলতে পারবেন না। কিন্তু Farquhar সাহেব মিথ্যা বলবার পাত্র নন। যেমন করে হোক হিন্দুদের ধর্ম যে লৌকিক কুসংস্কারের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের সংমিশ্রণ এইরূপ একটা ধারণা মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ পোষণ করে আসছিলেন।

অন্যান্য খ্রীস্টান মিশনারীবংশীয়ার মতো তাঁর ধর্মপ্রচারের বাতিক ছিল না, তিনি অপরকে ভজানোর জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করতেন না। তাঁর মনে কষ্ট হত এই বলে যে শিক্ষিত লোকেও স্বেচ্ছায় salvationএর সুযোগ হারাচ্ছে। তিনি মনে মনে সেই সব ভ্রান্ত আত্মার জন্যে প্রার্থনা করতেন।

৯

ক্রমশ রায়বাহাদুরের অন্য মূর্তি দেখা গেল। তিনি চাকর মহল লণ্ডভণ্ড করে ধমকে বেড়াতে লাগলেন। মেমসাহেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটাকে বলেন, "এই উল্লুক, হামারা মকানমে ইতনা রোজ কাম করতা হায়, আবহিতক পাঁকচুয়ালিটি দুরস্ত নেহি কিয়া?" আর-একটাকে দেখতে না পেয়ে বলেন, "কাঁহা গিয়া শূয়ারকা বাচ্চা? উস্‌কা কমন্‌সেন্স্ কব্ হোগা? মেম সাব্‌কা তক্‌লিফ্ হোতা রহা।"

ঘেউ ঘেউ করে পরকে তাড়া করে নিয়ে যাবার পর ডালকুত্তা যেমন প্রভুর পায়ে ফিরে এসে ল্যাজ নাড়ে ও জিভ বার করে, রায়বাহাদুর তেমনি মিসেস স্যামুয়েল্‌সের চেয়ারের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন ও অকারণে হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ করেন। একজাতীয় মানুষ আছে তাদের হাসি, অবিকল কুকুরের জিভ-বের-করা মাথা-কাঁপানো চোখ-জ্বলজ্বল-করা আনন্দ-জ্ঞাপনের মতো।

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে তিনি নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। উজ্জয়িনীরটাই ছিল সব চেয়ে বড় এবং সাজানো ঘর। কিন্তু তাকে বেদখল করতে তাঁর সাহসে কুলায়নি। আই-এম্‌-এস্ অফিসারের কন্যা, ওর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এখন গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার মেম্বার। উজ্জয়িনীকে তিনি ভয় এবং সমীহ করে থাকেন। তাকে পুত্রবধূরূপে পাওয়া তাঁর পক্ষে কত বড় সম্মানের বিষয়। তাই তাঁর ইচ্ছা থাকলেও উজ্জয়িনীকে তার ঘর থেকে নড়তে বললেন না।

মেমসাহেবকে বললেন, "ম্যাডাম, এ বাড়ীতে আপনার যারপরনাই অসুবিধা হচ্ছে জানি। কিন্তু আর দেরি নেই।"—হেঁ-হেঁ-হেঁ করলেন। ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে তুলে তারপর সেই রহস্যের নিরাকরণ

করলেন।—"আর দেরি নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পাকা হব। তারপর উঠে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে। কিন্তু—"

ব্যাপারটাকে আর একটু ঘোরাল করার জন্যে চশমার নিচে ও গালের ভাঁজে আর একবার হাসির লহর তুললেন। শালগ্রাম শিলার মতো মাথার গড়ন। অর্থাৎ মাথার পিছনটা একটা ঢিপির মতো। সেদিক থেকে কপালের দিকটা ঢালু। যৌবনকালে যখন চুলের জঙ্গল ছিল তখন এই অদ্ভুত চড়াই উৎরাই ঢাকা পড়েছিল। এখন কানের উপরকার দুটি ওয়েসিস ছাড়া বাকীটা মরুভূমি।

"কিন্তু পাটনাতে হয়তো রাখবে না, ম্যাডাম। ছোটখাট একটা জেলা দেবে। যথা, পুরী। পুরী গেছেন, ম্যাডাম?···গেছেন। ঘোর পৌত্তলিক স্থান। ভালো লাগেনি নিশ্চয়।···লেগেছে? হেঁ হেঁ হেঁ!··· সমুদ্র কার না ভালো লাগে? বিশেষত আপনার!"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ নীরব। বেশী কথা বলা তাঁর জাতীয় স্বভাবে নেই। অল্পকথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন। বাক্যের অভাবে হাস্য বিধেয়। তাই সমস্তক্ষণ তাঁর মুখে মৃদু হাসির সলতে জলছিল। তিনি স্বভাবত লজ্জাশীলাও বটে।

রায়বাহাদুর একতরফা বকে চললেন। "রিটায়ার করতে এখনো বছর সাতেক দেরি। কমিশনার হতে পারা খুব বেশী অবিশ্বাস্য নয়।" ওটুকু গদগদভাবে বললেন। যখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তখন তাঁর গলার স্বরের সঙ্গে নাকের সুর যোগ দেয়। "তবে ঐ যে হতভাগা স্বরাজিস্টগুলো কমিশনার পদ তুলে দেবার ধুয়ো ধরেছে তার ফলে দেশের কী পরিমাণ ক্ষতি হবে সেটা তো ধীরভাবে বিবেচনা করছে না। বাস্তবিক, ম্যাডাম, কমিশনার পদ উঠে গেলে শান্তি ও শৃঙ্খলাও উঠে যাবে।"

স্যামুয়েল্‌স্‌-জায়া এদেশের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি এই জানেন যে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিসের সাহায্যে রাজকার্য চালান। কমিশনারের প্রয়োজন ও পদমর্যাদা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিতে না চেয়ে টিপে টিপে হাসতেই থাকলেন।

রায়বাহাদুর থামলেন না। কমিশনারের বেতন, নিজের বেতন, নিজের ব্যয়তালিকা, নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, আর একখানা মোটর কেনার আবশ্যকতা, নূতন কুঠির সাজসজ্জার কথা এই সব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক বক করলেন। আপিসের সময় হলে ঘটা করে আফশোস জানালেন।—"একলাটি আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, গল্প করবার সাথীর অভাব সে কি আমি বুঝতে পারিনে? অল্পবয়সীদের সঙ্গে আমাদের মনের মিল হবে কেন? ওরা জীবনের কতটুকু জানে, কী-ইবা দেখেছে। খালি বুড়ো মানুষের মতো নিরামিষ খেলে ও মালা গড়ালে হল!"—উত্তেজিত হয়ে নাকী সুরে বক্তব্য সমাপন করলেন।—"কোনো কোনো বুড়ো মানুষ আছেন তাঁদের লজ্জা নেই, অল্পবয়সীর কানে পাকামির মন্ত্র দেন। নিছক ঈর্ষা—তাছাড়া আর কিছু নয়, ম্যাডাম। নিজের ছেলে বিলেত যেতে পারল না, আই-সি-এস হবার সুযোগ হারিয়ে দেড়শ টাকা মাইনের লেকচারার হল, অতএব পরের ছেলের উপর শোধ তুলতে হবে সে বেচারার বৌকে বিগড়ে দিয়ে। ধনী মানুষ কৃতী মানুষ দেখলে কারুর কারুর চোখ টাটায় কেন বলতে পারেন? নানাদিক থেকে তাকে অসুখী করে তুলে তারপর বলা হয় কিনা, ধনের শাস্তি ও মানের সাজা বিধাতা দিয়েছেন। ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌!" (পাঠক ইচ্ছামত চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে নেবেন।)

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন না কার প্রতি কটাক্ষ করা হল।

১০

মনের কথা খুলে না বললে মনের ব্যথা হালকা হয় না। বীণার শিক্ষা দীক্ষা হয়তো হাই স্কুল অবধি গেছে, কিন্তু তার বুদ্ধির দৌড় ও কল্পনার গতি উজ্জয়িনীর সম-দূর নয়। উজ্জয়িনীর সমস্যা বীণার অভিজ্ঞতার বাইরে। তার জগতে সবাই সুখী, সকলে সপ্রেম। ব্যথা বড় জোর বিরহব্যথা। দুঃখ সাধারণত রোগভোগের বা চাকরি না হবার দুঃখ। খেদ একমাত্র নিঃসন্তান রইবার খেদ। উজ্জয়িনী ইতিমধ্যেই বীণার অন্তর চিনে নিয়েছে। বোন হিসাবে বীণার তুলনা নেই। নিরহঙ্কার নিঃস্বার্থ নিরভিমান, সরলতার প্রতিমূর্তি, স্নেহসেবার অবতার। কিন্তু সখী হিসাবে বীণা অচল।

বীণাকে সে বারংবার পরীক্ষা করেছে, পাস-এর সুযোগ দিয়েছে। কদমকুঁয়ার একটু দক্ষিণে রেলরাস্তা। রেলরাস্তা ছাড়িয়ে খাল ডিঙিয়ে পাকা সড়কের দুধারের বুনো ফুল তুলে বেড়ানো উজ্জয়িনীর অপরাহ্ণ-কালীন নিত্যকর্ম। সেই সব ফুল দিয়ে মালা গেঁথে বীণাদের গোবিন্দজীকে উপহার দেওয়া হয়। বীণা মাঝে মাঝে তার সহকর্মী হয়। বীণাকে সঙ্গে না নিলে যে তার ভয় করে এমন নয়। উজ্জয়িনী মানুষকে ভয় করে না। কে তার কী করতে পারে? গায়ে হাত তুললে কান মলে দেবে। হাত চেপে ধরলে লাথি চালাবে। উজ্জয়িনী বীণার মতো সরলা অবলা নয়। পিতার সঙ্গে টেনিস খেলেছে, শিকার করেছে, তার কবজিতে পুরুষমানুষের কবজির সমান জোর। সে শাড়ী পরে শাড়ীকে খাটো করে নিয়ে। তাই তার পক্ষে দৌড়ানো অস্বচ্ছন্দ নয়, দৌড়ানোর অভ্যাসও তার আছে। সে হাঁটে পুরুষমানুষের মতো জোরে জোরে পা ফেলে। তার বাবার সঙ্গে সকালবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানোর দরুণ

সে সামরিক কায়দায় হাঁটতে অভ্যস্ত। বীণাটা নেহাৎ মেয়েমানুষ। হাঁটে যেন কেন্নোর মতো crawl করতে করতে। মাথায় কাপড় দিয়ে পুরুষ পদাতিকদের চোখে নিজেকে এত রহস্যাচ্ছন্ন করা কেন? ওরা প্রাণভরে চেয়ে দেখুক, দেখে হাসি পায় তো হাসুক, কান্না পায় তো কাঁদুক, পিছু ধরে তো ধরুক। যতক্ষণ না গায়ে হাত তুলেছে কিংবা পথের বাধা হয়েছে ততক্ষণ ওরা নিরাপদ। তারপরে কিন্তু ওদের অপরাধের মার্জনা নেই। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় ওদের খুন করে ফেলতে পারে। তার বৈষ্ণবধর্ম আততায়ীকে প্রশ্রয় দিতে বলে না, বললেও সে শুনবে না। শ্রীকৃষ্ণ যে কংসারি।

বীণাকে সঙ্গে নিয়ে যায় মনের বোঝা নামাতে। কিন্তু বীণাটা এমন নির্বোধ যে ঠিক জায়গাটিতে সাড়া দেয় না। কথা উঠল, "বিলেত দেশটা মজার। সেখানে যেই যায় সেই হয়ে যায় কাজের লোক।" এক্ষেত্রে বীণার বলা উচিত ছিল, "তাই নাকি, ভাই উজ্জয়িনী? বাদল-বাবু চিঠি লেখেন না প্রতি সপ্তাহে?" প্রশ্নটা শুনলে উজ্জয়িনী সুদীর্ঘ উত্তর দিত। তার উত্তর শুনে বীণা হয়তো বলত, "বল, বল উজ্জয়িনী, কেন এমন হল? তুমি তো কোনো অপরাধ কর নি? তুমি তো সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী ও তন্বী। বিলেতের মেয়ের না হয় রঙ্ সুন্দর, কিন্তু তোমার যে মন সুন্দর, উজ্জয়িনী।" উজ্জয়িনীর চোখের বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়ত। বীণা আঁচলের প্রান্ত দিয়ে ঝরা জল মুছে নিত, ঝরন্ত জলকে বাধা দিত। দুই সখীতে অনেকক্ষণ চুপ করে বাণীবিনিময় করা হলে বীণা বলত, "ভয় কী? বিরাট বিশ্ব, তারার মেলায় পৃথিবী একটা জোনাকি, সামান্য পার্থিব ব্যথা তোমাকে অভিভূত করতে পারে না, উজ্জয়িনী। তুমি বিশ্বদেবের পায়ে সুখদুঃখের পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হও।" কিংবা বলত, "স্বামী সব নয়। স্বামীর চেয়ে যিনি প্রিয় যিনি নিকট, তিনি তোমার উপায় করবেন। ভাবনা কিসের?"

কিন্তু বীণা উজ্জয়িনীর কাল্পনিক বীণা নয়, কাজেই মজার কথাটা শুনে বলে, "আমি জানি। আমার সেজকাকা যখন বিলেতে ছিলেন তখন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করতেন কিনা, তাই তাঁর চিঠি আসত দুমাসে একবার। তা বলে উদ্বিগ্ন হওয়া তোমার সাজে না, উজ্জয়িনী। এবারকার মেলে না আসে আসছে বারের মেলে আসবে, না এলে আমাকে বোলো।" তার ডাগর দুটো চোখে সরল বিশ্বাসের নিশ্চয়তা ব্যঞ্জিত হয়। উজ্জয়িনী মুগ্ধ হয়ে তাই দেখে, প্রসঙ্গটা চেপে যায়।

অন্য একদিন আমবাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বলে, "আচ্ছা, কে কার স্বামী কে কার স্ত্রী, এটা পূর্বজন্ম থেকেই স্থির হয়ে থাকে, না ?"—একথা শুনে বীণা যদি বলত, "নিশ্চয়। বাদলবাবুর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হল সেইদিন হঠাৎ তোমার ওকথা মনে হল। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যয় হল, কেমন ? ঠিক বলেছি কি না, ভাই উজ্জয়িনী।" এর উত্তরে উজ্জয়িনী বিয়ের রাত্রের একটা স্মৃতি-সুরভিত বর্ণনা দিত। তার পরের সেই কয়েকটি পরম মহার্ঘ দিন সেগুলিকে বিস্মৃতির বৈতরণীর ওপার থেকে এপারে আনত। বীণার প্রশ্নকে উপলক্ষ করে নিজে আর একবার সেই বিগত অবস্থার মধ্যে বাঁচবার স্বাদ পেত। বীণা তার বর্ণনা শুনে বলত, "এক জন্মে এর বেশী সুখ কেউ পায় না। তুমি যা পেলে তা অমৃত, তার স্মৃতিও অমৃত, তার চিন্তা তো অমৃতই, তার কল্পনাও অমৃত।" উজ্জয়িনীর সাধ যেত কাঁদতে। বীণার কাঁধে মাথা রেখে সে আমবাগানের নির্জনতার মধ্যে অলস চরণে চলতে চলতে দাঁড়াত। আর একবার অতীতের মধ্যে বাস করে নিত।

কিন্তু বীণা তো উজ্জয়িনীর মানসী সখী নয়, সে যা, সে তাই। সে অতি সরল গদ্য। সে বলল, "শুধু এ জন্মে নয়, পরজন্মেও সেই একই স্বামীস্ত্রী। জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ—যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।"

পলায়ন

১

বাদল হচ্ছে ভাবের মানুষ। এক একটা ভাবনা নিয়ে বিভোর থাকে, কখন রাত ভোর হয়ে যায় সে খবর রাখে তার এলার্ম টাইমপিস। খাচ্ছে, কিন্তু কী খাচ্ছে খেয়াল নেই, সঙ্গিনীর কথাগুলি মনোযোগীর মতো শুনছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বলছে, "ক্ষমা চাইছি, কেট্। কী বলছিলে ঠিক ধরতে পারিনি।" ট্রেনে কিংবা বাস্-এ চড়ে কোথাও যাচ্ছে, আপন মনে ফিক্ করে হাসছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, গাড়ী থেকে নামবার কথা ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে দয়া করে ক্লাসে উপস্থিত হয়, সেখানেও প্রোফেসারের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে তিনি মনে করেন ইনি তন্ময় হয়ে শুনছেন। বাদলের সৌভাগ্যক্রমে ছাত্রকে প্রশ্ন করার রীতি ইংলণ্ডের অধ্যাপক মহলে নেই, নতুবা বাদল পদে পদে অপদস্থ হত।

ইদানীং তার মাথায় কী এক ভাব চেপেছে, সে কিছু একটা দেখলেই ভাবে, বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরছি, ফিরে দেখছি দেশের তুমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেখানে ছিল Foundling Hospital সেখানে এখন ফাঁকা জমি, শুনছি সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের বাড়ী উঠবে। মন্দ প্রস্তাব নয়, কিন্তু funny! অত বড় একটা পুরাতন ইমারৎ আমি দেখতে পেলুম না, আমার আসার আগেই ভেঙে ফেলেছে। ১৯২৪ সালে ভাঙল Devonshire House; এখন সেখানে হোটেল আর ফ্ল্যাট। মন্দ নয়, কিন্তু funny! রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের চেহারা বদলে গেছে, Strand তো এখন বেশ চওড়া হয়েছে, পার্কলেন-এর অভিজাত্যগর্বিত প্রাসাদ এখন ধনগর্বিতদের রুচি অনুযায়ী

প্রথমে ধূলিসাৎ ও পরে পুনরায় নির্মিত হচ্ছে, Dorchester House নাকি হবে Dorchester Hotel। মন্দ নয়, যুগের দাবি মানতে হবেই তো, কিন্তু funny! আমার অনুপস্থিতিতে দেশটার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

বিশ বছর আগে মাটির নীচে এত রেল লাইন ছিল না, ইলেক-ট্রিসিটির দ্বারা চালিত হত না কোনো ট্রেন। রাস্তায় মোটরের ভিড় ছিল না, এত মোটর বাস্ কল্পনার অতীত ছিল, এই যে সব পথ-প্রান্তীয় গারাজ এগুলি অধুনাতন। ট্র্যাফিক একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিসের হাতে নিয়ন্ত্রণের ভার থাকা আর পোষাচ্ছে না দেখছি। রেলের মতো সিগ্ন্যাল চাই রাস্তায় রাস্তায়। অটোমেটিক সিগ্ন্যাল।

বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরতে বড় funny লাগে। সিটি অঞ্চলের শ্রী দেখ! ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড-এর সাবেক কালের বনেদী সৌধ নতুন ছাঁচে তৈরি হবে কেউ ভাবতে পারতে? আর লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক কিনা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। হা হা হা!

মহাযুদ্ধের চিহ্নাবশেষ বাদল লণ্ডনের সর্বত্র আবিষ্কার করছে। ধর, সন্ধ্যার আগে দোকান বাজার বন্ধ করা। এ নিয়ম তো প্রাগ্যুদ্ধীয় ইংলণ্ডে ছিল না। তখনকার রাস্তাগুলো অর্ধেক রাত্র অবধি আলো-ঝলমল করত। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আলো দেখলে বোমা ছুঁড়বে বলে D. O. R. A. (Defence of the Realm Act) সন্ধ্যার পর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল। ইস্, ছিল বটে সে একদিন! মাথার উপর সাঁই সাঁই করে এরোপ্লেন ছুটেছে, কানের কাছ দিয়ে গোলা বন্ বন্ করে ধাওয়া করেছে, জলের নিচে সাবমেরিন কিলবিল কিলবিল, ডাঙ্গার উপর "Tank" গড়গড় গড়গড়! তখন বাদল ছিল বহু দূরে,

এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল বাদলের অনুপস্থিতিতে, বাদলের বিনা সহযোগে।

২

অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মেয়েরা কেশ ও বেশ হ্রস্ব করেছে। তারা আর গজেন্দ্রগামিনী নয়। বাদলদের পাড়ার অনেক মেয়ের বাইসিক্‌ল্ আছে। কত মেয়ে মোটর সাইক্লিস্টদের পিছনে বসে প্রাণ হাতে করে বেড়াতে বেরয়। থিয়েটারে বেআব্রু মেয়ে শত শত। নাচের বাতিক সংক্রামক হয়েছে। মন্দ বাতিক নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাদল নাচ শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু কেট্ বিশেষ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, "তোমার সঙ্গীতের কান একেবারেই নেই, বার্ট্। তোমার পদক্ষেপ বেতালা হবে।" বাদল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ধারণা ছিল সে ইচ্ছা করলেই যে কোনো বিষয়ে কৃতী হতে পারবে। মানুষ কী না পারে? "What a man has done a man can do." ইচ্ছা করলে বাদল একজন বিচক্ষণ সেনাপতিও হতে পারত। বৈজ্ঞানিক কিংবা মেরু-আবিষ্কারক, সঙ্গীতকার কিংবা ফিল্‌ম্ স্টার, বণিক কিংবা ইঞ্জিনীয়ার যা খুশি তা হতে পারা কেবলমাত্র ইচ্ছা, উদ্যোগ, সময় ও সাধনা সাপেক্ষ! "অসম্ভব" বলে কোনো কথা নেপোলিয়নের অভিধানে ছিল না, বাদলের অভিধানেও নেই।

কেট্ এর উত্তরে বলেছিলেন, "নাচ তো খুব কঠিন্ বিষয় নয়, বার্ট্। চাও তো তোমাকে আজকেই শিখিয়ে দিতে পারি। কী জান, ও জিনিসটা আজকাল এত খেলো হয়ে উঠেছে যে কোনো ভদ্রলোকের ও জিনিস মানায় না।"

বাদল গম্ভীর ভাবে বলেছিল, "ওকথা আমারও মনে হয়েছিল,

কেট্। বাস্তবিক মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের স্ত্রী-চরিত্র থেকে dignity চলে যাচ্ছে। আমরা পুরুষরাও এর জন্যে বহু পরিমাণে দায়ী। সিরিয়াস্ মেয়ে দেখলে আমাদের গায়ে জর আসে।" এই বলে বাদল তার কলেজের সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের বর্ণনা দিয়েছিল। সহপাঠিনীরা সামনের সারিতে বসে। প্রোফেসারের প্রত্যেকটি আপ্তবাক্য খাতায় টুকে নেয়। সহপাঠীরা এই নিয়ে তাদের অসাক্ষাতে রসিকতা করে থাকে। কেউ কেউ তাদের কার্টুন আঁকে। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের একটি "সোশ্যাল"-এ বাদল নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা মিলে "There was a miner, Fortyniner" ইত্যাদি হাস্যসঙ্গীত গেয়েছিল। বাদলের কাছে যে মেয়েটি বসেছিল সে বলেছিল, "আপনি গাইছেন না যে।" বাদল বলেছিল, "গানটা জানা থাকলে তো?" মেয়েটি তার নিজের বইখানা বাদলের সঙ্গে ভাগ করে বাদলকে বলেছিল, "গলা ছেড়ে গান ধরুন। সকলেই আনাড়ি, কে কার ভুল ধরবে?" বাদল তাই করেছিল। কিন্তু সে কি জানত যে গানটা এত লঘু? আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে হঠাৎ শেষের দিকে এক নিঃশ্বাসে ও একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল—

"Then I kissed her little sister
And forgot my Clementine."

বাদলের তো লজ্জায় বাক্‌স্ফূর্তি হল না। দিনের বেলার ঐ সব লক্ষ্মী মেয়ে সন্ধ্যা বেলা এই সব গানে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? বাদল পরে ভেবে দেখেছিল। অন্যায়টা এমন কী হয়েছিল? চুম্বন করা তো কথা বলার মতোই একটা শারীর ক্রিয়া। এদেশে তো ভাই-বোন মা-বাবা সবাই সবাইকে চুম্বন করে। কিন্তু ওটা না হয় মাফ করা যায়। গানের পর সেই যে নাচটা হল সেটাতে বাদল যোগ দিতে না পেরে এক কোণে

চুপটি করে বসেছিল। পুরুষ সংখ্যা কম পড়ে যাওয়ায় মেয়েরা জোড়া জোড়া হয়ে নাচতে বাধ্য হচ্ছিল। তাদের কারুর কারুর হাতে ছেলেবেলাকার টেডি ভালুক কিংবা অন্য রকম পুতুল ছিল। ছেলেরা পাছে সিরিয়াস্ বলে পরিহাস করে সেই জন্যেই যে তারা অতিরিক্ত ছেলেমানুষী করছিল বাদল এক কোণে বসে এইরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। সেই সময় একটি ছেলে এসে তার সঙ্গে গল্প জমায়। ওয়েল্স্ থেকে এসেছে, জোন্স তার নাম। তার সঙ্গে যোগ দিতে এল তার বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকা আগত টম্‌লিন্‌সন্। মাঝে মাঝে একবার করে আসতে বসতে গল্প করতে ও পালাতে থাকল ভ্যান্ কোপেন। বাদল জিজ্ঞাসা করল, "ওলন্দাজ ?" ভ্যান্ কোপেন বিরক্তি চেপে বলল, "মা ইংরেজ, সুতরাং আমিও।" তাকে কেউ ওলন্দাজ বলে পর ভাববে এটা কি তার সহ্য হতে পারে! যাক্, ভ্যান্ কোপেন শৌখীন মানুষ। তার গোঁপ ছুঁচল। পোশাক পরিপাটী। জোন্স্, টম্‌লিন্‌সন ও ভ্যান্ কোপেন তিন-জনেই আইন পড়ছে। বাদলের সঙ্গে তিন মিনিটে ভাব হয়ে গেল।

জোন্স্ বলল, "ভ্যান্ কোপেন আজ বড় বেশী নাচছে।"

টম্‌লিন্‌সন বলল, "কাউকে বাদ দিচ্ছে না। প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে।"

জোন্স্ বলল, "লোকটা কেমন জোগাড়ে।"

টম্‌লিন্‌সন বলল, "মেয়েদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে জানে।"

বাদলের কেমন যেন মনে হল আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের তেমন সম্মান করে না। মেয়েরাও সম্মানপ্রার্থী নয়। অবশ্য বাদল অবাধ মিশ্রণের পরম পক্ষপাতী। অর্থহীন ও কৃত্রিম ব্যবধান স্ত্রী-পুরুষের মনে পরস্পরের প্রতি মোহ রচনা করে। মোহ সত্যের শত্রু, বাদলের চক্ষুঃশূল। কিন্তু সম্মানের চেয়ে কাম্য কী থাকতে পারে? পুরুষ

যেমন পুরুষের সঙ্গে অব্যাহতভাবে মিশেও সম্মান দাবি করে ও পায় নারীও তেমনি পুরুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশুক ও সম্মানের প্রতি কপর্দক আদায় করে নিক। ভিক্টোরীয় যুগে তাদের সম্মান ছিল, স্বাধীনতা ছিল না। আমাদের যুগে তাদের স্বাধীনতা আছে, বহিঃসম্মান আছে, কিন্তু আন্তরিক সম্মান নেই। বাদলের মর্মে পীড়া লাগছিল।

সেদিনকার গল্প কেট্‌কে বলায় তিনি কৌতুকহাস্য করলেন। বললেন, "তোমার একটুও humour-জ্ঞান নেই। কোথায় কী প্রত্যাশা করতে হয় জান না। পড়ার সময় পড়া, মেলার সময় মেলা, উৎসবের সময় উৎসব, কাজের সময় কাজ। এই আমাদের রীতি। আফিসের পোশাক পরে জলকেলি করিনে, জলকেলির পোশাক পরে টেনিস খেলিনে, টেনিসের পোশাক পরে থিয়েটারে যাইনে। যখন যেমন। তুমিও চাও আমরা শবানুগামীর পোশাক পরে পেচকের মতো গম্ভীর হয়ে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিই?"

বাদল বলে, "বা রে, তা কখন বললুম?"

কেট্‌ বলেন, "প্রকারান্তরে বললে। কিশোর ছেলে, কিশোরী মেয়ে। ওরা পরস্পরের সম্মান নিয়ে কী করবে শুনি? একেই তো দুঃখের জীবন ওদের সামনে। জীবন-সংগ্রামে কে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। প্রথম যৌবনের এই কটা দিন ওদের যা খুশি করতে দাও, বার্ট্‌। তোমার মতো মহাপুরুষ তো সকলে হবে না, হতে পারবে না, হতে চাইবে না।"

কিছুক্ষণ থেমে বললেন, "তোমার ভাই বোন না থাকায় তুমি একটা কিম্ভূত বালক হয়ে বেড়েছ। অল্পবয়সীরা ভাইবোনেরই মতো কিলাকিলি চুলাচুলি করবে, তারপর হাসি-তামাশায় দ্বেষ হিংসা ভুলে যাবে। তা নয় তো সকলে সব সময় ভালো ছেলে ভালো মেয়ে হয়ে এক মনে বড় বড়

বিষয় ভাববে, এমন সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তোমার মতো ক্ষ্যাপাদের মগজে গজায়।”

বাদল এর উপর কথাটি কইল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল (এই নিয়ে চতুর্থ বার) কেটের সঙ্গে নেহাৎ দরকারী সাংসারিক বিষয় ছাড়া বাক্যালাপ করবে না।

কেট্ তার ভাবটা আঁচতে পেরে বললেন, “অমনি রাগ হল? আচ্ছা, নাও এই দুধটুকু লক্ষী ছেলের মতো খেয়ে ফেল তো আগে। গায়ে জোর না হলে রাগ করবে কী দিয়ে?”

৩

সব চেয়ে বড় পরিবর্তন শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি। বিশ বছর আগে পার্লামেণ্টে শ্রমিক সদস্য ছিলেন নথাগ্রগণ্য। আজ লেবার পার্টি ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল। ইতিমধ্যে ট্রেড্স্ ইউনিয়ন কাউন্সিল পার্লামেণ্টের দোসর হয়ে উঠেছে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন ট্রেড্স্ ইউনিয়ন কাউন্সিল একচ্ছত্র হবে। বাদল ভারতবর্ষে থাকতে ইংলণ্ডের General Strike-এর খবর পেয়েছিল। ইংলণ্ডে এসে ধনিকে শ্রমিকে পথে ঘাটে মারামারি দেখতে পায়নি। তাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ছুটকো বিরোধ চোখে পড়ে না। কেউ কারুর প্রতি অভদ্রাচরণ করে না। বরঞ্চ বড়লোকের বেশী মান। বাদলের পোশাক থেকে তাকে বড়লোকের মতো মনে হয়। সেই জন্যে হোক কি সে বিদেশী বলেই হোক, বাদলকে বাস্ কণ্ডাক্টর, ট্রেনের টিকিট কলেক্টর, পোস্টম্যান, দুধওয়ালা, রেস্তোরাঁর লোক, দোকানের লোক, ইত্যাদি সকলেই সম্বোধন করে “সার্” বলে। ভিক্ষুকরা তার কাছে মন

খোলে, ফুটপাথের গায়ে রঙিন চক্‌খড়ি দিয়ে যে সব খোঁড়া বা কুঁজো ছবি আঁকে তারা বাদলের বাঁধা আলাপী।

এই সব বেকার মানুষের জন্যে কী যে করা যায় সে সম্বন্ধে বাদল ভাবুকদের লেখা পড়ে, নিজেও ভাবে। কিছুদিন থেকে লিবারল্ পার্টির প্রস্তাব নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। লিবারলরা বলেন ধনী লোকের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে সকল শ্রেণীর লোকের সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে আরো রাস্তা ও আরো খাল তৈরি করা হোক, পতিত জমি আবাদ করা হোক, জঙ্গল রোপণ করা হোক। দেশের ধনবৃদ্ধিও হবে, বেকার মানুষের কাজও জুটবে। লিবারলরা গবর্নমেণ্টকে দিয়ে এসব করাতে চান না। ধনিকে শ্রমিকে নিজেরাই একমত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব করুন। গবর্নমেণ্ট কেবল বাধা না দিলেই হল। লিবারলদের নালিশ এই যে কন্‌সারভেটিভ গবর্নমেণ্ট ছোট ছোট নিষেধের ডোরে দেশের লোকের হাত পা বেঁধে রেখেছেন। উক্ত গবর্নমেণ্ট সাহায্যও করছেন না, পরামর্শও দিচ্ছেন না, নতুবা কয়লার খনিকদের সঙ্গে মালিকদের ও ব্যবসায়ের শ্রমিকদের সঙ্গে অপরাপর ধনিকদের এতদিনে সন্ধি হয়ে যেত।

সার্ আলফ্রেড মণ্ড্-এর সঙ্গে শ্রমিক প্রতিভূদের কথাবার্তার বিবরণ বাদল মনোযোগ সহকারে পড়ছিল। কিন্তু অব্যাপারীর পক্ষে ওর পরিভাষায় দন্তস্ফুট করা দুর্ঘট। বাদলের বন্ধু কলিন্স্ অবশ্য দোভাষীর কাজ করে। তবু অর্থনীতির ভাষা বড় দুর্বোধ্য। বাদল যদি আজন্ম ইংলণ্ডে থাকত তা হলে মুখে মুখে সেই সব শব্দের সংজ্ঞা জেনে নিত যে সব শব্দ ইংরেজ সাধারণের পক্ষে সহজ এবং বাদলের পক্ষে দুরূহ। Safeguarding, derating প্রভৃতির উপর সবাই পাঁচ দশ মিনিট বক্তৃতা করতে পারে, একা বাদল কিছু বলতে ভয় পায়। তারপর Free

Trade ও Protection—এ নিয়ে এখনো ইংলণ্ডের লোক ঠিক তেমনি উত্তেজিত রয়েছে যেমনটি ছিল সত্তর আশী বছর আগে কবডেন্-এর যুগে। লিবারলদের অধিকাংশই Free Trade চায়, কন্সারভেটিভরা অধিকাংশেই চায় Protection। লেবার পার্টির লোক কোনটা যে চায় ওরাই জানে কিংবা ওরাও জানে না। ওদের এক কথা, সোস্থালিস্‌ম্ চাই। ছোট ছেলের মুখে যেমন একটি মাত্র দাবি, "খাব।" খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু করা বোঝে না, তুনিয়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় মুখগহ্বরের মধ্যস্থতায়।

ইংলণ্ডের পার্টি পলিটিক্স ইংলণ্ডের প্রধান জিনিস। প্রায় আড়াই শ বছর কোনো না কোনো আকারে ইংলণ্ডে পার্টি আছে। বংশানুক্রমে কোনো কোনো পরিবারের লোক টোরী কিম্বা হুইগ। ভারতবর্ষের মানুষ যেমন ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ হয়ে জন্মায় ইংলণ্ডে জন্মায় কন্সারভেটিভ কিংবা লিবারল্ হয়ে। বাদল কোন পার্টির লোক? গোড়ায় কনসার-ভেটিভদের প্রতি তার টান ছিল। কিন্তু ওরা সাধারণত হাই চার্চের সভ্য। বাদল নাস্তিক। নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, Non-Conformist, ইহুদী ইত্যাদি বাধ্য হয়ে লিবারল্ দলের দিকে ঝোঁকে। তারপর Free Tradeএর আদর্শ বাদলের মনের মতো। পৃথিবীর যাবতীয় দেশে বাণিজ্য অবাধ হোক, কোথাও শুল্ক না লাগে। যার যা খুশি বেচুক, যার যা খুশি কিনুক। বেচাকেনা অবাধ হলে এত মনকষাকষিও থাকবে না। ইস্, জ্বালাতন করে তুলেছে। মেছোহাটার মতো ব্যাপার। ফ্রান্স ও আমেরিকা তো একেবারে নির্লজ্জ।

বাদল 'টাইম্‌স্' বন্ধ করে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' নিতে আরম্ভ করল। কিন্তু সোজাসুজি নিজেকে লিবারল্ বলে ঘোষণা করল না। পীল, পামারস্টন, গ্লাডস্টোন রোস্‌বেরীর নামের কুহক তাকে লিবারল্ দলের

দিকে আকর্ষণ করছিল। কিন্তু যে দলের কেবল অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই, সে দলে যোগ দিয়ে বাদল কার কী উপকার করবে? কিন্তু ভবিষ্যৎ যে নেই তাই বা কেমন করে বলা যায়! লিবারল্ গবর্নমেণ্ট হয়তো অসম্ভাব্য, কিন্তু যতদূর মনে হয় ভাবীকালের ইংলণ্ডে দুই দলের বদলে তিন দল কায়েমী হবে। এক সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল সত্য মিথ্যা বলে পরস্পরবিরোধী দুটি মাত্র দিক আছে, এখন আরো একটা দিক মানুষের চোখে পড়ছে। লিবারল্ দল দেশের লোকের তৃতীয় চোখ ফুটিয়ে দেবে।

৪

বাদল ছিল হাড়ে হাড়ে ডেমক্রাট। তার ইউটোপিয়ায় সকলে স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে একজনের স্বাধীনতা যেন অপরের স্বাধীনতার সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধায় এটুকু দেখতে হবে। এটুকু দেখার জন্যে সকলের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডল এবং প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় জনকতক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা মন্ত্রী। রাষ্ট্র যার নাম সেটা আর কিছু নয়, সেটা তোমার আমার স্বাধীনতার সীমা-নির্দেশের জন্যে তোমার আমার কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার আমার হাতে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র। যন্ত্রের যন্ত্রী তুমি আমি।

তাই ফাসিস্‌ম্ ও বোলশেভিস্‌ম্ বাদলের চোখের বিষ। আমি যন্ত্রী নই, আমি যন্ত্রের অঙ্গ কিংবা অধীন, যন্ত্রই ভগবান আমি তার পূজারী— ওঃ। বাদলের নাস্তিক মন যুদ্ধং দেহি বলে চীৎকার করে ওঠে। চাইনে শান্তি চাইনে আরাম, অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছল্য যাদের কাম্য তারা ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করুক। কিন্তু আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আমার

প্রতিবেশীর খাতিরে আমার অধিকারের খানিকটা আমি ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু সবটা ত্যাগ করতে আমি কস্মিন্‌কালে পারব না।

ডেমক্রেসী রাজাদের সমাজ। আমরা সবাই রাজা। কেবল নিজ নিজ রাজ-অধিকারকে সংঘর্ষমুক্ত করবার জন্যে আমাদেরি কতক অধিকার আমরা ডান হাত থেকে নিয়ে বাঁ হাতে রেখেছি, ঘর থেকে সরিয়ে সভায় ন্যস্ত করেছি। আর ফাসিস্‌ম্‌-বোলশেভিস্‌মের সমাজ দাসের সমাজ। কিছু আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতা অস্বীকার করেছি, যা নিজেদেরি রচনা তার ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিইনি, পরন্তু ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বলছি, আহা রাষ্ট্র! সে কি যে-সে জিনিস! সে যদি হয় জগন্নাথের রথ তবে আমরা সামান্য পোকা মাকড়। সে হচ্ছে অব্যক্ত, অব্যয়, সর্বক্ষম, পরম রহস্যময়। ভাগবত বিভূতি বিশিষ্ট অথবা অতিমানুষিক শক্তিসম্পন্ন। আমরা কেবল তাকে মান্য করতে পারি, তার সেবা করতে পারি, তার জন্যে মরতে ও মারতে পারি।

ইংলণ্ডের প্রতি বাদলের পক্ষপাত প্রধানত ইংরেজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দরুণ। রাষ্ট্র যেদিন রাজার মধ্যে মূর্ত ছিল সেদিন সে রাষ্ট্রের অধিকার সঙ্কুচিত করেছে, প্রজার অধিকার প্রসারিত করেছে। Magna Carta-র অনুরূপ অন্য কোনো ইতিহাসে আছে কি? রাজাকে ক্রমশ ডেমক্রাট করে আনা হয়েছে। নাম ছাড়া রাজা-প্রজায় প্রভেদ বড় কিছু নেই। ফ্রান্সও ডেমক্রেসীর দেশ। কিন্তু তার ডেমক্রেসী ভুঁইফোঁড়। ফরাসী বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং উক্ত আন্দোলন ইংলণ্ডত্যাগী ইংরেজেরই কীর্তি (কিংবা কুকীর্তি। বাদলের মনে হয় আমেরিকা ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেই ভালো করত। অবশ্য অধীনের মতো নয়, সমানের মতো)। ফরাসী যে লিবার্টি মন্ত্রের উপাসক সে বিষয়ে বাদলের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু লিবার্টির চেয়ে ইকুয়ালিটির

উপর ফরাসীর বেশী ঝোঁক। ফরাসী যদি সাম্য পায় তবে স্বাধীনতা ছাড়তে রাজী। কিন্তু ইংরেজ মোটের উপর উঁচু নিচু ভালোবাসে, তার সমাজে অনেক ধাপ, কিন্তু বাক্যের ও কর্মের স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে, তার চেয়ে যা দামী—চিন্তার স্বাধীনতা—তা ক্যাথলিক ফরাসীর নেই, প্রোটেস্টাণ্ট ইংরেজের আছে।

বাদল সাম্যের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যকে কাম্য মনে করে। সে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলতে চায়, কেউ যদি তাকে ঠেকাতে আসে তবে তার বিরক্তির সীমা থাকে না। ইংলণ্ডে এসে অবধি সে প্রতি সন্ধ্যায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, অন্ধকার গলির ভিতর ঘুরেছে, কেউ তাকে বাধা দেয়নি, সন্দেহ করে তার পিছু নেয়নি। ইংলণ্ডের পুলিস ভদ্র। তার কারণ পুলিসের কাজই হল ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা—প্রত্যেক ব্যক্তির। যখনি পুলিসের দ্বারা ব্যক্তির অমর্যাদা ঘটেছে তখনি তার প্রতিকারের জন্যে লোকমত জাগ্রত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বের একটি ঘটনা বাদলের মনে পড়ে। হাইড পার্কে একজন স্বনামধন্য বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে একটি শ্রমিক-শ্রেণীর অনূঢ়া তরুণীকে কুরুচিকর অবস্থায় পুলিসে দেখতে পায় এবং ধরে নিয়ে থানায় আটকে রেখে মেয়ে পুলিসের বিনা সহায়তায় তাকে প্রশ্নবাণে জর্জর করে। পার্লামেণ্টে এ নিয়ে কথা উঠল, অনুসন্ধানের জন্যে কমিশন বসল। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ!

স্বাধীনতা যদি থাকে তবে সাম্যের কী যে প্রয়োজন বাদল বুঝতে পারে না। সে তো কারুর সঙ্গে সমান হতে চায় না। সে নিজেই একটা দিক্‌পাল, একটা গৌরীশঙ্কর কি কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপরে তার সমান হতে সাধনা করতে চায় তো করুক, কিন্তু বাদল করবে সাম্যের কামনা! তবে আইনের চোখে সবাই সমান হোক; যথা ডিউক অব ইয়র্ক তথা জন স্মিথ্‌ কয়লার খনির মজুর। পার্লামেণ্টের নির্বাচক হবার অধিকার

সকলকে দেওয়া হোক। সকলের প্রাণের দাম সমান হোক, একটা বুড়ো ভিখারীকে খুন করলে যে অপরাধ একজন ধনকুবেরকে হত্যা করলে তার চেয়ে বেশী অপরাধ যেন না হয়। এগুলো সাম্যবাদের অঙ্গ নয়, এগুলো স্বাতন্ত্র্যবাদেরই সামিল। কাজেই বাদল সাম্যবাদের কাম্যতা দেখতে পায় না।

প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করুক, অনবরত করতে থাকুক। প্রত্যেকে ক্রমাগত এগিয়ে যাক, ধনে মানে জ্ঞানে কর্মে চিন্তায়। সমাজ তো একটা শোভাযাত্রার মতো। পিছনে জায়গা পাওয়া লজ্জার কথা নয়, পেছিয়ে পড়াটাই লজ্জার। বাদল তো ক্লাসে সকলের শেষ সারিতে বসত ও বসে।

বাদলের মতবাদ অবিকল লিবারল্ দলের মতবাদ। কন্‌সারভেটিভরা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের শত্রু, সোশ্যালিস্টরাও তাই। দু'পক্ষেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়ে ঐ ক্ষমতার দ্বারা ব্যক্তির উপর জবরদস্তি করতে কৃতসংকল্প। এক পক্ষ গাঁথবে উঁচু tariff দেয়াল। বিদেশী পণ্যের উপর চড়া শুল্কের হার উশুল করবে। অপর পক্ষ চায় বড়লোকের উপর বিপুল ট্যাক্স চাপিয়ে সেই টাকায় বেকারকে অলসকে প্রতিপালন করতে। কেলেঙ্কারী! **Dole**-এর টাকায় ওরা বিয়ে করে, সন্তান সন্ততির জনক জননী হয়। ধনীর চাঁদায় চলতে-থাকা হাসপাতালে চিকিৎসা পায়, ধনীর চাঁদায় সমুদ্রকূলে হাওয়া বদলাতে যায়। ছিঃ ছিঃ ওদের আত্মসম্মান নেই!

৫

পলিটিক্স নিয়ে মিসেস উইল্‌স্ তর্ক করেন না। মিস্টার উইল্‌স্ বাদলের সঙ্গে খুব ভদ্রভাবেই বাক্য বিনিময় করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারেন না। ভদ্রলোক খেটে খুটে অনেক দূর

থেকে আসেন। পেট ভরে রোস্ট বীফ খান, আস্ত জন বুলের মতো চেহারা। প্রথম যৌবনে নাকি বক্সার ছিলেন, এখনো তার পরিচয় দিয়ে থাকেন স্ত্রীর উপর রেগে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে। (বাদল ক্রমশ জানতে পেরেছে যে তিনি স্ত্রীকে মুষ্ট্যাঘাত করতে একদা ভালোবাসতেন, কিন্তু স্ত্রী যেদিন থেকে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন সেদিন থেকে তিনি স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ সশ্রদ্ধ হয়েছেন।) তারপরে একে একে নানা ব্যবসায় লোকসান দিয়ে অবশেষে করছেন ডক্-এর ম্যানেজারী। অদ্যাপি তাঁর ভূতপূর্ব দোকানের পুরোনো ছাপানো কাগজপত্র বাড়ীতে পাওয়া যায়, গিন্নী তাতে বাজার-হিসাব লেখেন।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে মিস্টারের সঙ্গে বাদলের তেমন বনছে না। মিস্টার হচ্ছেন গোঁড়া সোশ্যালিস্ট। সান্ধ্য সংবাদপত্রখানা হাতে করেই বাড়ী ফেরেন, বাদলের মতো ট্রেনে কিংবা বাস্-এ ফেলে আসেন না। এসেই গজ গজ করেন, কন্সারভেটিভরা arn't playing the game। কিংবা থেকে থেকে একটু হি হি করেন, বাই-ইলেকশনগুলোতে লেবার পার্টির লোক জিতে চলেছে। এই বলে আওড়ে যান :—Darlington, Stockfort, East Ham, Hammersmith, Northampton, না, না—Stourbridge, Northampton, Hull, বাদলের দিকে চেয়ে বলেন, "Now what do you say to that ?"

আগামীবার জেনারেল ইলেকশনে লেবার পার্টিই যে পার্লামেন্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল হবে এ বিষয়ে মিস্টার উইল্‌সের সংশয় দিন দিন অপসৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সংশয়াত্মক শ্লেষ তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। স্ত্রী বলেন, "আর দেরি নেই, জর্জ। 'Jerusalem in England's green and pleasant isle'—এর আর দেরি নেই।"

বাদল বলে, "কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত মিস্টার উইল্‌স্।

লেবার পার্টি এবার পার্লামেণ্টে লট বহর নিয়ে ঢুকবেই।" বাদল কথাটা গম্ভীরভাবে বলে, তবু মিস্টার উইল্‌সের বিশ্বাস হয় না যে বাদল ব্যঙ্গ করছে না। তিনি বাদলের দিকে কটমট করে তাকান।

বাদল যেন মস্ত রাজনীতিবিশারদ। বলে, "আমার ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে এই যে লেবার যদিও কন্‌সারভেটিভদের থেকে সংখ্যায় গুরু হবে এবং লিবারলদের থেকে তো হবেই, তবু অন্য দুই দল যোগ দিলে হবে সংখ্যায় লঘু।"

মিস্টার উইল্‌স্ চটে গিয়ে বললেন, "Damn the Liberals". তাঁর মনে ১৯২৪ সালের সেই Zinovieff letter-এর স্মৃতি হুল ফোটাতে থাকল।

বাদলও ক্ষেপে গেল। বলল, "আমি আপনাকে বলে রাখছি দুপক্ষের কোনো পক্ষকেই এবার লিবারলরা সাহায্য করবে না। নেমকহারাম লেবার, চিরশত্রু কন্‌সারভেটিভ কোনো পক্ষকে এবার মন্ত্রিত্ব করতে দেওয়া যাবে না। লিবারলরা নিজেরাই গবর্নমেণ্ট চালাবে।"

উত্তেজনার মুখে বাদল ওকথা বলল বটে, কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সে কি সম্ভব? কোনো একটা বিল পাস না হলেই তো পদত্যাগ করে লজ্জা পরিপাক করতে হয়।

সে মুখ তুলে দেখল যে মিস্টার ও মিসেস দুজনে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। হয়তো ভাবছেন ছোকরা বদ্ধ পাগল!

অবশেষে মিস্টার বললেন, "ভারতবর্ষে বুঝি তাই হয়?"

বাদল আহত বোধ করল। তর্কের মাঝখানে দেশ তুলে অপমান করা কেন? তা ছাড়া বাদলকে যে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয় মনে করে, তাকে বাদল ক্ষমা করে না। সেদিন মিসেস উইল্‌স্ জিজ্ঞাসা করছিলেন, "বার্ট, তোমাদের ভাষায় scissorsকে কী বলে?"

বাদল বলেছিল, "কী জানি, কেট্, আমি ও ভাষা ভুলে গেছি।" তিনি এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন সে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। আর সেও তাঁর উপর তেমনি রাগ করেছিল যেমন রাগ করেছিল কুম্ভকর্ণ, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে দেওয়ায়। মনে মনে একটা ভাব নিয়ে তার দিন কাটছিল, সে ইংলণ্ডে আছে, সে ইংরেজ, ইংলণ্ডের বাইরে তার অতীত ছিল না। হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ করা হল।

তথাপি এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার চিন্তা তার মনে উদিত হয়নি। হল, যখন মিঃ উইল্‌সের সঙ্গে তার ক্ষণস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ ঘটতে লাগল। একদিন সে বলছিল, "আজ এক পাদ্রী এক মজার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু রাস্তার কোণের nasty flapperরা যেভাবে করে সেভাবে, না, St. Joseph, St. Ethelreda ইত্যাদি যেভাবে করতেন সেভাবে?"

মিসেস উইল্‌স্ খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, "পাদ্রা-সাহেবের রসবোধ আছে।"

বাদল বলতে লাগল, "কিন্তু মজা সেখানে নয়, কেট্। একটু পরেই পাদ্রীপুঙ্গব বলছেন, ক্যাথলিকদের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, নিগ্রোদের সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে। আমরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে নিজের সংখ্যা কমাই ও বলবীর্য হারাই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ থাকে না। পরিশেষে তিনি দ্বাদশ সন্তানের জনক কোনো এক ব্যক্তিকে আদর্শ বলে রচনা শেষ করেছেন।"

জর্জ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে আহার করছিলেন। আহার্য অবশিষ্ট রেখে তিনি কথাবার্তায় যোগ দেন না। পরিতৃপ্তির ভার সংবরণের জন্যে তিনি ভালো করে ঠেস দিয়ে বসলেন ও বিনাবাক্যব্যয়ে পাইপ

ধরালেন। দাঁতের ভিতর দিয়ে কথা বেরিয়ে এল, "তোমরা আমাকে মাফ করবে, কেমন ?"

তিনি বাদলকে জেরা করলেন। "কেন ? কী দরকার ? জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজে কী ক্ষতি ঘটছে ?"

বাদল হতাশ হয়ে বলল, "আপনি নিজেই এর উত্তর দিন, মিস্টার উইল্‌স্। কেননা আপনার দলের লোকই ভুক্তভোগী।"

মিসেস উইল্‌স্ কপট গাম্ভীর্যের সহিত বললেন, "বার্টের কাণ্ডজ্ঞান নেই। কীটপতঙ্গের মতো সন্তান বৃদ্ধি না করলে লেবার দলের ভোটার সংখ্যা বাড়বে কী করে শুনি ? তোমার অত সাধের ডেমক্রেসীর পরিচালন-ভার তো সেই দলের হাতে যাদের পিছনে ভোট বেশী ?"

মিস্টার উইল্‌স্ যেন ধরা পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বক্র দৃষ্টিতে শাসন করলেন। বাদলকে বললেন, "ক্যাপিটালিস্টদের হাতে আছে ধন। আমাদের হাতে আছে জন। আমরা যদি আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করি তবে অনায়াসে হটে যাব। ওরা আগে ওদের অস্ত্র সমর্পণ করুক, তার পরে আমরাও আমাদের করব।"

৬

এমন বাড়ীতে টিঁকে থাকা বাদলের পক্ষে দুষ্কর হচ্ছিল। কেট্ সব কথাতেই সবাইকে ব্যঙ্গ করেন, কখনো জর্জকে কখনো বাদলকে কখনো আমন্ত্রিত অতিথিদের। তাঁর নিজস্ব মতবাদ যে কী তা বাদল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আবিষ্কার করতে পারল না। বাদলের ধারণা প্রত্যেকেরই একটা সুস্পষ্ট সুবোধগম্য মতবাদ থাকা আবশ্যক। যার নেই সে অমানুষ। তাই কেটের প্রতি সে বিমুখ হয়ে উঠছিল। বাদলের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত তবে সে এই তিন মাসে নিশ্চয়ই টের পেত যে কেটের

প্রধান দুঃখ তিনি নিঃসন্তান এবং অর্থাভাববশত নিঃসন্তান। পলিটিক্স ইত্যাদিতে তাঁর মন নেই, তবে স্বামীর যখন ওতেই মন বেশী তখন ওবিষয়ে উৎসাহের ভান করতে হয়।

জর্জের উপর বাদলের বিরূপ ভাব প্রথম থেকেই। তিনি কথায় কথায় ভারতবর্ষের মহারাজাদের টেনে আনতেন, তাঁর বিশ্বাস বাদল রাজবংশীয় হবে। তিনি কোথায় শুনেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ওদেশের সর্বত্র। কাজেই বাদলও ব্রাহ্মণবংশীয় হওয়া সম্ভব। তারপর বেনিয়াদের ধনের সংবাদ যে ইংলণ্ডে পৌছায়নি তা নয়। "The wicked bania"! অতএব বাদল বেনিয়াবংশীয়ও বটে। একাধারে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য। ভদ্রলোকের অমন বিশ্বাসের কারণ ছিল। বাদল খরচ করত রাজার ছেলের মতো। তার নিজের লাইব্রেরীর পিছনেই মাসে চার পাঁচ পাউণ্ড বাঁধা খরচ। প্রতিদিন একে খাওয়ায় তাকে খাওয়ায় এবং বাড়ী ফিরে এসে গল্প করে। ময়লা কাপড় বলে ফরসা কাপড়কেও সে ধোপার বস্তায় দেয়। রোজই কিছু না কিছু কিনে আনছে। কেট্‌কে উপহার দিচ্ছে। একটা সুন্দর রিস্ট্‌ওয়াচ, এক তাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, হাত ব্যাগ, কাপড়ের ফুল।

জর্জের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাদল স্থির করল এবাড়ী ছেড়ে দেবে। কোনো বাড়ীতে তিন মাসের বেশী থাকবে না, এ সঙ্কল্প তার মনে পড়ে গেল। তখন সে কেট্‌কে না জানিয়ে অন্যত্র থাকবার জায়গা খুঁজল। কলিন্স্‌কে বলল, "ওয়াই-এম্-সি-এ'তে হবে?" কলিন্স্ বলল, "উহুঁ। এক বছর আগে যারা আবেদন করেছে তারা এখনো পায়নি।" বাদল ক্ষুণ্ণ হল। তার ভারি ইচ্ছা ছিল যুবকদের সঙ্গে সর্বক্ষণ থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতে। হৈ হৈ করবে, টো টো করবে, লণ্ডনের মধ্যস্থলীয় হট্টগোল কেমন লাগে সেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করবে। তার ফলে হয়তো এমন অনিদ্রায় ভুগবে যে হাসপাতালে ঢুকবে। সেও ভালো, হাসপাতালের অভিজ্ঞতাও তার দরকার। সেখানে রোগীদের নার্সদের সঙ্গে ডাক্তারদের সঙ্গে ভাব করবে। কী মজা!

ব্লুমস্‌বেরীতে দেদার ইণ্ডিয়ান। রাসেল স্কোয়ারেও ইণ্ডিয়ান দেখা যায়। ওদিকে নয়। হাম্পস্টেড তো ইণ্ডিয়ানদের পাড়া হয়ে উঠেছে। ওদিকে নয়। সিটিতে রাত্রে মানুষ থাকে না, ওদিকে নয়। সাবার্ব-এ থাকলে লণ্ডনের জনসংঘাতমদিরা পান করা যায় না। ওদিকে নয়। বাদল হাইড্ পার্ক ও কেনসিংটন পার্কের সংলগ্ন অঞ্চল পায়ে চষে বেড়াল। এবার তার খেয়াল হল হোটেলে ঘর নেবে। পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক ভাড়া। এত ভাড়া দিলে বইপত্র কেনার জন্যে বড় বেশী বাকী থাকে না। বাদল সপ্তাহে চার পাউণ্ড অবধি খাওয়া ও থাকার জন্যে খরচ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অত সস্তায় ওসব অঞ্চলের হোটেলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। বেচারা বাদলকে ঐ সব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হল। সকাল বেলা পার্কে বেড়ানোর আশা রইল না। কত বড় ফ্যাশানেব্‌ল্ জিনিস সে হারাল। স্বয়ং বার্নার্ড শ সেখানে পায়ে হেঁটে বেড়ান। বাদলের অভিলাষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। পার্কের বাতাস গায়ে লাগলে রাত্রে তার ভালো ঘুম হতে পারে। যাতে ঘুম ভালো হয় সে জন্যে সে কত ওষুধ পথ্য খেয়েছে, কিছুতে কিছু হয়নি।

চেল্‌সীর এক রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে বাদল আশ্রয় পেল। চেল্‌সীতে চিরদিন সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বাস করে এসেছে। সুইফ্‌ট্, স্টীল্, স্মলেট, লি হাণ্ট, কারলাইল, টার্নার, হুইস্‌লার, রসেটী, এঁরা বাদলের পূর্বাধিবাসী। ম্যানেজার বাদলকে একটি খালি ঘর দেখাতেই বাদলের অমনি পছন্দ হয়ে গেল; বাদল কথা দিল এবং কথার সঙ্গে অগ্রিম টাকা দিল।

মিসেস উইল্‌স্ যখন সমস্ত শুনলেন তখন শুধু বললেন, "আচ্ছা।" তাঁর মন-কেমন করতে থাকল, কিন্তু মুখে তেমনি কৌতুক হাস্য। বাদল ভাবল, যাক্, তিনিও ছাড়া পেয়ে বাঁচলেন। আমি কী কম জ্বালিয়েছি তাঁকে। সাড়ে বারোটা অবধি আমার কোকো তৈরি করে দেবার জন্যে বসে থাকা, এই কষ্ট স্বীকার করার কী মূল্য আমি তাঁকে দিতে পেরেছি। ডিয়ার ওল্ড্ কেট্। বিদায়কালে তাঁকে সে কী উপহার দিয়ে যাবে ভাবল।

জর্জ প্রমাদ গণলেন। বাদলকে পেয়ীং গেস্ট্‌রূপে পেয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে কিছু জমাতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে কিছু বলেছ টলেছ নাকি?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "ওটা একটা পাগল। বলে তিন মাসের বেশী কোথাও থাকব না।" জর্জ লক্ষ্মী-পেঁচার মতো মুখ করে থাকলেন। কী ভাবলেন, হঠাৎ বললেন, "বার্ট্, শুনেছ? লিবারল্‌রা ল্যাঙ্কাস্টার বাই-ইলেকশন জিতেছে? তোমাকে আমার অভিনন্দন করা উচিত।" কিন্তু ভবী ভোলে না। বাদল বলে, "ধন্যবাদ, মিস্টার উইল্‌স্। আর একটা কথা শুনেছেন? আমি চেল্‌সীতে উঠে যাচ্ছি? বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে দেখা হবে।"

বেগতিক দেখে জর্জ প্রস্তাব করলেন, বাদল যদি তার বন্ধুকে ঐ বাড়ীতে পেয়ীং গেস্ট্ করে দেয়! ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐ বাড়ীতে কোনো প্রেজুডিস্ নেই! মিস্ মেয়ো যে কত বড় মিথ্যাবাদিনী সেটা ঐ বাড়ীর মানুষ যেমন বুঝেছে—বিশেষত বাদলের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়ে—তেমন আর কেউ এ দেশে বোঝেনি। বাড়ীর ছেলের মতো থাকা একমাত্র ঐ বাড়ীতেই সম্ভব।

বাদল বলল, "কিন্তু আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু তো দুটি তিনটির বেশী

নেই। তাঁরা যেখানে আছেন সেখান থেকে নড়বেন বলে তো মনে হয় না। আপনারা একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন। লণ্ডনে দুহাজার ভারতীয় ছাত্র আছে, মিস্টার উইল্‌স্।"

মিসেস উইল্‌স্ রঙ্গ করে বললেন কি সত্যি সত্যি বললেন বোঝা গেল না—বললেন, "কিন্তু আর একটিও বার্ট্ নেই, মিস্টার উইল্‌স্।"

পরদিন বাদল অতি সহজভাবে বিদায় নিল। যেন এক রাত্রির অতিথি। একবার পিছু ফিরে চাইল পর্যন্ত না। ফিরে চাইলে দেখতে পেত মিসেস উইল্‌স্ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। তাঁর দৃষ্টি বাষ্পান্ধ। তবু তাঁর অধরে কৌতুকের আভা।

৭

হোটেলের জীবন বাদলকে প্রমত্ত করল। কোলাহলবিরল বৃহৎ ভোজনাগার, এক একটি টেবিলের চারিধারে দলে দলে সুসজ্জিত নরনারী। করিডর পদশব্দমুখর, মেয়েদের জুতোর খট্ খট্, পুরুষদের জুতোর গুম্ গুম্। কোন ঘরে কে থাকে বাদল জানে না, কিন্তু একটু সকাল সকাল উঠলে দেখতে পায় বন্ধ দরজার বাইরে জোড়া জোড়া মেয়েলি জুতো, পুরুষালি জুতো কিংবা বুট। বাদলের দুই পাশের দুই ঘরে থাকেন দুজন মহিলা, সামনের ঘরে একজন ভদ্রলোক। একটু দূরে কয়েকটি দম্পতি। ওঁদের কারুকেই বাদল দেখেনি, কিন্তু ওঁদের জুতো দেখেছে। রাত্রে বাদল সকাল সকাল ঘুমতে যায়, ওঁরা দেরি করে ফেরেন। আবার যেদিন বাদল দেরি করে ফেরে সেদিন হয়তো ওঁরা আগেই ফিরেছেন। সন্ধ্যাবেলা ভোজনাগারে বসে বাদল প্রায়ই অনুমান করার খেলা খেলে; অপরিচিত অপরিচিতাদের মধ্য থেকে নিজের

প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীদের নিশানা করে। একদিন যাদের নিশানা করে পরদিন তাদের পছন্দ হয় না, অন্যদের নিশানা করে।

হোটেলের ঘরগুলো ছোট ছোট। ঘরে বসে পড়াশুনা করা যায় না। অবশ্য পড়াশুনার জন্যে যদি না আলাদা ঘর নেওয়া হয়। চিত্রকরদের জন্যে স্টুডিওর বন্দোবস্ত এ হোটেলে নেই, কিন্তু এর আশে পাশে স্টুডিও ভাড়া পাওয়া যায়। বাদল তার বইপত্র নিয়ে নীচে নেমে এসে লাউঞ্জ-এ বসে। বাদলের শৈত্যবোধ কিছু বেশী। তুলোর এবং পশমের একজোড়া গেঞ্জির উপরে শার্ট এবং পুলোভার এবং তার উপর কোট চাপিয়ে তবু বাদলের গরম বোধ হয় না, সে ঠিক আগুনের কাছটিতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আগুনের লক্‌লকে শিখা তার দিকে এগিয়ে আসে, তার ব্রাউন মুখ রাঙা আলোয় দীপ্তিমান দেখায়। ক্রমশ লাউঞ্জ থেকে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ কাজে চলে যায়। বাদলের কাজ থাকলেও কাজে মন নেই; বাইরে বড় ঠাণ্ডা, বিশ্রী টিপ টিপ বৃষ্টি, আকাশ ঘোলাটে। এই লণ্ডনে দুহাজার বছর অর্ধসভ্য, সভ্য ও অতি-সভ্য মানুষ বাস করে কাজ করে সৃষ্টি করে আসছে। তবু এমন ওয়েদার কিছুতেই বাদলের বরদাস্ত হচ্ছে না, যতই কেন সে বলুক, "এই তো আমাদের খাঁটি স্বদেশী শীত, খাঁটি স্বদেশী বৃষ্টি! আহা! কী পুলক জাগছে!"

প্রতিদিন নূতন লোক আসে, পুরোনো লোক যায়। বাদলের পাশের ঘরের দরজার বাইরে ভৃত্যকর্তৃক সাফ করবার জন্যে রাখা জুতোর আকার প্রকার থেকে বোঝা যায় প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়েছে। মনটা প্রথমে একটু উদাস হয়ে যায়—আহা, কে লোকটা ছিল, তার সঙ্গে একবার চোখের দেখাটাও হল না। পরমুহূর্তে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। কে এসেছে একবার দেখতে হচ্ছে কিন্তু। কিছুদিন পরে জন্মায় ঔদাসীন্য।

শুধু যাওয়া, শুধু আসা। কী হবে কারুর চেহারা দেখে। দেখলে তো মনে থাকবে না? এই ছমাসে বাদল লাখ লাখ মানুষ দেখেছে লণ্ডনের পথে পথে। চোখ বুজলে কারুর চেহারা স্মৃতির নিকষে ফুটে ওঠে না তো?

তার কারণ বাদল অন্যমনস্ক মানুষ। দেখেও দেখে না কিছু। তবু তার দেখার সাধটি আছে, সকলের যেমন থাকে। লণ্ডনে আছি, অথচ সেণ্ট পল্‌স্ দেখি নি? অমনি চলল বাদল সেণ্ট পল্‌স্ দেখতে। কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে তার বাস কখন ব্যাঙ্কপাড়ায় পৌঁছেছে। যাক্ গে, পরে কোনোদিন দেখা যাবে এখন। সেণ্ট পল্‌স্ তো পালিয়ে যাচ্ছে না, আমিও এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দে। আসল কথা, তার চোখের কৌতূহলের চাইতে মনের কৌতূহল বেশী। মন নিত্য নতুন সত্যের সোপান বেয়ে কোন ঊর্ধ্বে চলেছে। যেটাকে অতিক্রম করছে সেটাকে ভুলে যাচ্ছে, সেটা একটা "না", সেটা একটা অসত্য। অতীত অসত্য, বর্তমান সত্য, ভবিষ্যৎ বহুগুণ সত্য।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়া কিংবা কিছু ভাবা, মাঝে মাঝে হাই তুলে গত রাত্রের অনিদ্রা ঘোষণা করা, হঠাৎ মগজে একটা আইডিয়ার আবির্ভাব হলে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করা, পায়চারি করতে করতে দুই হাত দিয়ে চুলগুলোকে জড়িয়ে ধরা (তাতে মাথা ব্যথা কিছু কমে), এবং পরিশেষে চেয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখ বুজে অসাড় হয়ে থাকা, বাদল তার এই সমস্ত মুদ্রাদোষের জন্যে অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তার হোটেলে খেয়ালী শিল্পীদের পদার্পণ ঘটত অহরহ। তাদের মুদ্রাদোষের তুলনায় বাদলের ওগুলো অতি শাদাশিদে, অতীব আর্টশূন্য। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে দুই একবার পাগলা গারদ ঘুরে এসেছে। কাজেই বাদলের মুদ্রাদোষ তাদের চোখ কাড়ে না।

তবে এই বিদেশী মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে তাদের আগ্রহ জন্মায়। তাদেরি সমধর্মা, যদিও রঙটা অন্য রকম বলে দলে টেনে নিতে দ্বিধা বোধ হয়। বাদল চোখ না তুলে বুঝতে পারে অনেকে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। শোনবার জন্যে কান পেতে রাখে ওরা তার কথা বলাবলি করছে কি না। কিন্তু ওরা তো মুখে বলে না, চাউনিতে বলে। কখনো কদাচ চোখ তুলে বাদল টের পায় ঘরের লোক বিনি কথায় বলাবলি করছে বিদেশীটি ইংরেজী ভাষার এত বড় বড় দুরূহ বই পড়ে বুঝতে পারে কী করে? পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলেছে দুই তিন মিনিট পর পর। মনোযোগ ও চিন্তাকুলতা থেকে বোঝা যায়, চাল দিচ্ছে না, সত্যিই পড়ছে ও পড়ে বুঝছে। পড়তে পড়তে মুচকে হাসছে এক আধ বার, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে।

বাদলের সঙ্গে আলাপ করতে তাদের ভারি কৌতূহল, কিন্তু ইংরেজ যতই বোহিমিয়ান বা খেয়ালী হোক, গায়ে পড়ে আলাপ করতে জানে না। বাদলও লাজুক মানুষ। বিলেতে আসা অবধি কতক সপ্রতিভ হয়েছে বটে তবু সুলভ হবার ভয়টি তার যায়নি। কারুর সঙ্গে কথা বলার আগে মহলা দেয় কী কী বলবে ও কী ভাবে বলবে। বাক্যের গড়ন শব্দের যোজনা উচ্চারণের ঝোঁক ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে এক কথা আরেক হয়ে দাঁড়ায়, তবু বাদলের জেদ—সে যা বলবে তা distinguished হওয়া চাই। কে বলছে? না, বাদল বলছে। যে-সে লোক নয়। বক্তব্যের চেয়ে বক্তার ব্যক্তিত্ব বড়। একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যাবার পরে বাদল নিজের উক্তির রোমন্থন করতে লেগে যায়। যা বলল তাই অন্য কত রকম ভাবে ভঙ্গীতে ও ভাষায় বলতে পারত, বললে হয়তো তার যোগ্য হত, একথা ভাবতে ভাবতে সে সঙ্কল্প করে—যেচে কারুর সঙ্গে কথা কইবে না, গায়ে পড়া প্রশ্নের উত্তর দিতে

বাধ্য হলে এমন কিছু বলবে যার থেকে আবার প্রশ্ন না ওঠে। কিন্তু কার্যত তা ঘটে না। বাদল তর্কশিরোমণি। সামান্য বিষয়েও তর্কের গন্ধ পেয়ে দ্বন্দ্ব বাধায়।

৮

জাহাজে কুবেরভাইয়ের কাছে বাদল দাবা খেলা শিখেছিল। অতি আনাড়ির মতো খেলত, চর্চার অভাবে একাগ্রতার অভাবে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনি। প্রায় ভুলে গেছল বললে চলে।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়ার ফাঁকে বাদল লক্ষ্য করত কুঁজো মতন একটি যুবক, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে, প্রতিদিন দাবা খেলেন। তাঁর খেলার সাথী কিন্তু প্রতিদিন এক নয়। কোনো দিন প্রৌঢ়া, কোনো দিন কিশোরী, কোনো দিন বৃদ্ধ, কোনো দিন যুবক। পরম নিঃশব্দে খেলা চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রতিপক্ষকে কাঁচা খেলোয়াড় দেখলে তিনি নিজেই প্রতিপক্ষের চাল বাৎলে দেন। প্রতিপক্ষকে কোনোমতে খেলার আসরে টেনে রাখবার জন্যে তিনি সুবিধের পর সুবিধে করে দেন, নিজের ঘুঁটিগুলিকে একে একে মারতে দেন। তাঁর মতো ধৈর্য তো সকলের নয়।

বাদল পায়চারি করতে করতে এক একবার খেলার কাছে দাঁড়ায়। মনে মনে উভয় পক্ষের চাল দেয়। অন্যথাচারণ দেখলে বিরক্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। আকর্ষণ এড়াতে না পেরে আবার কিছুকাল পরে পা বাড়ায়। ততক্ষণে হয়তো খেলার ছক্ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। যুবকটির এক একটা বোড়ে এক একটা মন্ত্রী (Queen) হয়ে পুনর্জন্ম পেল বলে। প্রতিপক্ষের অন্তরাত্মা খেলায় ইস্তফা দিয়ে পলায়নের জন্যে উন্মুখ। কিন্তু যুবকটি তা হতে দেবেন না। পলাতককে খোরাক দিয়ে বেঁধে

রাখবেন বলে তাঁর অশ্বের আড়াই চালের ঘরে নিজের একটি বোড়েকে নিঃসহায় অবস্থায় এগিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল হাতের বইখানাকে মাথার উপর ঘোড়সওয়ার করে চোখ বুজে কী একটা ভাবছে, তার সামনের চেয়ারে কে একজন এসে নিঃশব্দে বসলেন। বাদল চোখ চেয়ে দেখল সেই দাবা-খোর যুবক। বাদল ইতিমধ্যে তাঁর নাম জানতে পেরেছিল। মিস্টার ওয়েলী।

বাদল একটু ভদ্রতা করে বলল, "আজ দাবা খেলছেন না যে, মিস্টার ওয়েলী ?"

মিস্টার ওয়েলীর চোখ ফিকে নীল, মুখ ফ্যাকাশে। তিনি কখনো হাসেন না। তাঁর মুখের মাংসপেশীগুলো নিথর, ভাবের আবেশে কাঁপে না। অথবা তাঁর মনের ভাব সব সময় একই রকম। তাঁর চোখের পাতা পড়ে, কিন্তু চোখের তারা নড়ে না। তাঁর সেই স্থিরদৃষ্টিকে তিনি বাদলের অভিমুখীন করলেন, যেন তার উপর সার্চলাইটের আলোক ক্ষেপ করলেন।

আত ধীর ও স্পষ্ট উচ্চারণ, যেন কামানে গোলা দাগছেন।— "আপনি কি আজ আমার খেলার সাথী হবেন ?"

বাদল প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠল।—"অল্ রাইট।"

সার্চলাইট তার মুখের থেকে অপস্থত হয়ে দাবার ছকের উপর নিবদ্ধ হলে পরে বাদল স্বস্তি বোধ করল। কাঁচা খেলোয়াড়ের যা দোষ, বাদল একধার থেকে যাকে হাতের কাছে পেল তাকে মেরে সাবাড় করল। তবু শেষকালে চালমাৎ হয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ওয়েলী লোকটা যাদুকর। বাদল শ্রদ্ধার সঙ্গে ওয়েলীর করমর্দন করল।

দিন কয়েক পরে ওয়েলীর সঙ্গে বাদলের আলাপ দাবার ছক ডিঙিয়ে দার্শনিক মতবাদে উপনীত হল। ওয়েলী হচ্ছেন বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিস্ট।

সব জিনিসের উৎপত্তি উপাদান প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসন্ধান করেন। মায়ের কবর খুঁড়ে botanise করতে ভয় পান না। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা হয় physicsএর, নয় biologyর, নয় psychologyর অধিকারভুক্ত।

ওয়েলী কোনো জিনিসকে ভালো বা মন্দ বলেন না, কারুর ভালো বা মন্দ চান না। তাঁর জিজীবিষা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া আর অন্য কিছু করতে পারেন না, করবার ইচ্ছা যে নেই। আত্মহত্যা করলে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবার বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই? তাঁর মৃত্যুভয় নেই, মৃত্যু যখন আসে আসুক। মৃত্যু যখন আসবে তখন বোঝা যাবে যে, মোটর গাড়ীর ড্রাইভার বেঁহুশিয়ার কিংবা ব্যাধিবীজরা শরীর যন্ত্রকে অচল করেছে।

"আমরা যে এত 'আমি' 'আমি' করি, এই 'আমি'টা কে বলতে পার, সেন? একটা cell অসংখ্য হয়েছে, একত্র রয়েছে। তারা আপন প্রণালীতে কাজ করে যাচ্ছে, যেমন একদল পিপীলিকা করে থাকে। তাদের আশ্রয় করে অসংখ্য ব্যাক্‌টিরিয়া বাস করছে। আমি কিছুই টের পাইনে। আমি প্রত্যক্ষ করিনি যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত ছুটছে। আমি স্বচক্ষে দেখিনি আমার পাকস্থলী কিংবা যকৃৎ। নিজের ঘর সংসার সম্বন্ধে এই তো আমার জ্ঞান। তবু বলতে হবে এসব নিজের?

বাদল কোনোদিন এদিক থেকে ভাবেনি। ওয়েলীকে সে বিশেষ সমীহ করতে লাগল।

"'ইচ্ছা' কাকে বলবে, সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষ্যটা কী? আরও কিছুকাল জীবনধারণ? দুদিন কম বেশীতে কী আসে যায়? জীবন যদি যায়ও,

তবে এমন কী আসে যায়? Cell-গুলো বাড়তে পাবে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত atom-গুলো তো থাকবে? Personal immortalityর কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality তো স্বতঃসিদ্ধ।"

বাদল চিন্তা করে। তার মতবাদের থেকে ওয়েলীর মতবাদ উত্তর মেরুর থেকে দক্ষিণ মেরুর মতো স্বতন্ত্র। তবু দুই মেরুতে কী যেন সাদৃশ্য আছে। বাদল থেকে থেকে ওয়েলীর কাছে ছুটে যায়। "আচ্ছা, মিস্টার ওয়েলী, এ বিষয়ে আপনার আইডিয়া কী?" ওয়েলীর উত্তরের উপর কথা বলতে পারে না। অত বড় তার্কিক মূক হয়ে যায়। ওয়েলী যেন যাদু জানেন। ওয়েলীকে বাদল ভয় করে। লোকটা যেন মানুষ নন। উত্তাপশূন্য, আবেগশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, রিপুজিৎ। তাঁর সুখের আশা কিংবা দুঃখের আশঙ্কা নেই। না নিজের জন্যে, না পরের জন্যে। মানবজাতি থাক্ বা লুপ্ত হয়ে যাক, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। দেশের গৌরব, জাতির প্রগতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি তাঁকে মাতায় না, ভাবায় না। নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজকে ঢেলে সাজবার অভিলাষটি বহু র‍্যাশনালিস্টের আছে, যদিও তার প্রয়োজন যে কী তা তাঁরা বলতে পারবেন না। পৃথিবীই বা থাকবে কদিন! মানবজাতিই বা থাকবে কদিন! ব্যক্তিবিশেষ তো বীজ বপন করে ফল ভোগ করবার আগে মরবে। তবে কেন বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিস্‌ম্ ফেলে ফলের পশ্চাদ্ধাবন?

ভালো মন্দ বলে কিছু নেই। আজ যেটাকে ভালো বলে তার পিছু নিচ্ছি কাল সেটাকে মন্দ বলে নিজের বুদ্ধিকেই বিদ্রূপ করব। না, সেন, কোনো কিছুই ভালো কিংবা মন্দ নয়। Nothing matters in the last analysis."—একটু থেমে বলেন, "তোমাদের একালের ইউটোপিয়া আর কিছু নয়, সেকালের স্বর্গের নামান্তর ও রূপান্তর। তার

মূল হচ্ছে বর্তমানের প্রতি অসন্তোষ, বর্তমানে অতৃপ্তি। তার ফুল হচ্ছে ভবিষ্যতের সম্পূর্ণতা, কাল-সাপেক্ষ perfection."

ওয়েলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। বাদল তাঁকে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলল। রাত্রে তার ঘুম হয় না বিশ্বের ভাবনা ভেবে। সুধীদার নাম করে বলল সুধীদা ইন্‌টুইশনের ও বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ অবলম্বন করেছে। সুধীদা রোজ এগিয়ে যাচ্ছে, বাদল পারছে না। বাদল যেন একটা বৃত্তের চারিদিকে (?) ঘুরছে, ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় আসছে। তার একমাত্র আনন্দ সে ইন্‌টেলেক্‌টের লীলাভূমিতে ঘর করেছে, ইউরোপ তার মহাদেশ, ইংলণ্ড তার দেশ।

ওয়েলী অনবরত পাইপ টানেন। টানতে টানতে বাদলের কথা এক মনে শুনে যান। নিজের কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে চান না, কিন্তু বাদল যখন পীড়াপীড়ি করে তখন বলেন, "আমি নিজে এই মুহূর্তে এই স্থানে আছি কি না তার প্রমাণ পাচ্ছিনে, সেন। আমি একেবারে আছি কি না তুমিই বলতে পার। ওরা বলে, 'I think, therefore I am." কিন্তু সেটা হচ্ছে begging the question, কারণ 'I think' এই বাক্যের যে 'I' শব্দটি সেইটির অস্তিত্ব নিয়ে তো যত প্রশ্ন। না, সেন, আমার নিজের কোনো কথা নেই।"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভগবান মানে না, কিন্তু আত্মা মানে। ওয়েলীর কথা শুনে তার সন্দেহ জন্মায়। তাই তো, আত্মা কি নেই ? আত্মা যদি না থাকে তো চিন্তার কী প্রয়োজন ? অকারণ এত অনিদ্রা। অর্থহীন ঐ ইন্‌টুইশন ও ইন্‌টেলেক্‌ট্। না, না, এ হতেই পারে না। আত্মা আছে। অন্তত অহং আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদল নাস্তিক, অহং সম্বন্ধে আস্তিক।

ওয়েলীকে যেই একথা বলা অমনি উনি বলেন, "Illogical."—বাদল মূক হয়ে যায়। দিগ্বিজয়ীর নিঃশব্দ পরাজয়।

৯

রাত্রে বাদল স্বপ্ন দেখল শয্যা শূন্য পড়ে আছে, সে নেই। ঘরে নেই, বাইরে নেই, আকাশে কিংবা বাতাসে নেই। সে নেই। তার বিছানার উপর এক মুঠো ছাই পড়ে আছে।

বাদল ককিয়ে কেঁদে উঠল। তার ঘুম ভেঙে গেল। তবু বিশ্বাস হল না যে সে আছে। লাফ দিয়ে উঠে সুইচ্ টিপে আলো জালাল। আহ্লাদের বেগ সবেরণ না করতে পেরে মিস্টার ও মিসেস উইল্‌স্‌কে ডেকে তুলবে কিনা ভাবতেই তার মনে পড়ল এটা হোটেল।

বিছানায় ফিরে যেতে তার সাহস হচ্ছিল না, যদি আবার তেমন স্বপ্ন দেখে। তখন ভোর হয়ে আসছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না। বাদল চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসল। সামনের দিকে ঝুলে-পড়া টুপি মাথায় গোঁপওয়ালা ক্ষুদে গাড়োয়ান আপাদবক্ষ চটের থলে মুড়ি দিয়ে পশুবোধ্য ধ্বনিবিশেষ উচ্চারণ করতে করতে চলেছে। লোমশপাদ অশ্বের খুর থেকে খট খট আওয়াজ উঠছে।

বাদল রাত্রের দুঃস্বপ্ন ভুলল। নিজের ও অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার সহজ প্রত্যয় তাকে আনন্দে আপ্লুত করল। ওয়েলী মানুষটা পাগল। এত বড় একটা স্বতঃসিদ্ধকে কিনা সন্দেহ করেন। ইণ্ডিয়াতে একদল মানুষ আছে, তাদেরকে বলে মায়াবাদী। বাদল তাদের উপর সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অপ্রসন্ন। তাদের অপরাধ তাদের সঙ্গে বাদল তর্ক করতে পারে না, তারা আগাগোড়া সব উড়িয়ে দেয়।

যার সঙ্গে তর্ক করতে পারে না তাকে বাদল নিজের ব্যক্তিগত শত্রু জ্ঞান করে। তার মুখ দর্শন করে না। তার নাম বাদলের অশ্রাব্য। শুধু মায়াবাদী না, যারা কর্মফলবাদী তারাও বাদলের শত্রু। বাদলের ইচ্ছা করে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে বলতে, "এও তোমাদের কর্মফল।"

ইংলণ্ডে এসে নব্যতন্ত্রের মায়াবাদী দেখে বাদলের বিস্ময় এবং বিতৃষ্ণা জাগছিল। ইংলণ্ড এমনতর মানুষের দেশ নয়। একে ইণ্ডিয়ায় চালান দেওয়া আবশ্যক। গিয়ে আলমোড়ায় মঠ করুন কিংবা পণ্ডিচেরীতে আশ্রম। এখানে বলে রাখা দরকার আলমোড়া কিংবা পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে বাদলের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না! এবং সন্ন্যাসীদেরকে বাদল outlaw জ্ঞান করত বলে তাদের দিক থেকে যে বলবার কিছু থাকতে পারে সে বিষয়ে তার খোঁজ ছিল না, হুঁশ ছিল না।

একটু পরে ওয়েলীর সঙ্গে ব্রেকফাস্টের সময় দেখা হবে তখন তাঁকে বাদল বলবে কী? মনে মনে একটা বক্তৃতা তৈরি করতে গিয়ে বাদল সেই ঘোর শীতকালেও ঘেমে উঠল। এমন কিছু বলা চাই যার উত্তরে ওয়েলী একটা কথাও বলতে পারবেন না। তেমন যুক্তি কই? ওয়েলী যদি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ আবার কী? বর্বরের কাছে বেড়াল যে বাঘের মাসী এও তো একটা স্বতঃসিদ্ধ।

বাদল অবশেষে স্থির করল সুধীদার কাছে বুদ্ধি ধার করব। যেই চিন্তা সেই কাজ। ছুটল টেলিফোন করতে।

"হ্যালো।"

"মিস্টার চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

সুজেৎ সুধীর সন্ধানে সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ল। সুধী নেমে এল।
"কে ?"

"আমি বাদল। ভয়ানক মুশকিলে পড়েছি।"

"সে কী রে! বাসা ছেড়ে কোথায় চলে গেছিস, মিসেস উইল্‌স্‌ ঠিকানা দিতে পারলেন না। কী হয়েছে!"

"আত্মা আছে, তার স্বপক্ষে কী যুক্তি দেওয়া যেতে পারে ?"

সুধী অবাক হয়ে রইল।

বাদল বলল, "এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে হেরে গেছি। ভীষণ মন খারাপ।"

সুধী বলল, "আয় না, তোর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, উপলব্ধি বিনিময় করা যাক।"

বাদল বলল, "না, সুধীদা। আমার অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন আছে।"

বাদলের প্রশ্নের উত্তরে সুধী বলল, "আত্মা আছে, এর স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি—আত্মা আছে। ওর বেশী আমি জানিনে। এবং নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে আমি লজ্জিত নই, বাদল।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বললে, "আমি তোমার মতো defeatist হতে পারব না। আমি পরাজিত হয়েছি বলে লজ্জায় মৃতপ্রায়। তবু জেতবার জন্যে প্রাণপণ করব।"

বাদল ভাবল, নিরামিষ খেয়ে খেয়ে সুধীদাটা একটা vegetable বনে গেছে। আমি কিন্তু বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দেব না। বাদল টেলিফোনের রিসিভার স্বস্থানে ন্যস্ত করতে যাচ্ছিল, কী ভেবে আবার তুলে নিল। সুধী বলল, "বাদল, শোন্‌। একদিন মিউজিয়ামে আয়।"

বাদল বলল, "কী দরকার? তোমার ও আমার সাধনমার্গ এক নয়। দুজনে দুই পথে চলতে চলতে যদি কোনোদিন কোনো এক চৌমাথায় মিলিত হই তবে সেই দিন কাফেতে বসে পথের গল্প করা যাবে। আমাকে নিজের মতো চলতে দাও, প্রভাবিত কোরো না।"

সুধী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকল। বাদল ডাকল, "সুধীদা!"

"কী?"

"তোমাকে defeatist বলেছি বলে ক্ষমা চাইছি। আসলে তুমিই সুখী। তোমার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ নেই, তুমি যা বিশ্বাস কর তার প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হও না, তাকে প্রমাণ করতে যাওই না।"

সুধী বলল, "বাদল, পরের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা প্রকারান্তরে নিজের কাছেই প্রমাণ করবার প্রয়াস। ওটাতে নিজের দুর্বল প্রত্যয়ের পরিচয় দেয়। তা ছাড়া ওটাতে পরকে অনাবশ্যক প্রাধান্য অর্পণ করে বিচারকের সিংহাসনে বসিয়ে। যা শাদা চোখে দেখছিস তাকে বিশ্বাস করে তার থেকে রস সংগ্রহ কর। শাদাকে শাদা বলে প্রমাণ করে তর্কে জেতবার নাম commonsense-শূন্যতা।"

বাদল তো ভারি চটে গেল। ফোন ফেলে দিয়ে দিগ্বিদিক ভুলে যে ঘরে ঢুকল সে ঘরে ওয়েলী বসে পাইপ টানছিলেন। বাদল পালাবার পথ পেল না। ওয়েলীর নিঃশব্দ নিশ্চেষ্ট আকর্ষণ তাকে চলৎশক্তিরহিত করল। সে মূঢ়ের মতো কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বলল, "গুড্ মর্নিং।" ওয়েলী মাথাটা ঈষৎ নেড়ে গুড্ মর্নিং জানালেন, বাদল আশ্বস্ত হল। তার কেমন যেন ভয় ওয়েলীর কণ্ঠস্বরকে, স্বল্পসংখ্যক শব্দকে। ওয়েলী যখন একটিও কথা কইলেন না তখন বাদলের শঙ্কা দূর হল। সে ধীরে ধীরে পিছু হটতে হটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১০

পরদিন সকালবেলা ওয়েলীর মুখ দেখে বাদল ঠিক করে ফেলল এ হোটেলে থাকা পোষাবে না। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছে, তবু পালাতেই হবে। তার বয়স অল্প, প্রাণে অনন্ত অভিলাষ, সে যে হতে হতে কী হয়ে উঠবে কল্পনা করতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়, জগতের যত মহাপুরুষ তাঁদের সকলের সঙ্গে এক সারিতে বসবার যোগ্যতা অর্জন করবে সে। তার কল্পলোকে পদে পদে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও করমর্দন তাঁরা কলিন্স, মিলফোর্ড দে সরকার নন, আত্ম-অবিশ্বাসী ওয়েলী নন, তাঁরা দান্তে গ্যয়টে শেক্সপীয়ার প্লেটো য়্যারিস্টট্‌ল গৌতম বুদ্ধ। তাঁরা অতি পুরাতন হয়েও অতীব নবীন। আপনার উপর তাঁদের অটল বিশ্বাস। আপনাকে তাঁরা যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করেছেন সেই পরিমাণে শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। বাদল দুবেলা জপমন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে—আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করি, আমি নিজেকে আরো শ্রদ্ধা করতে চাই। আমি শ্রদ্ধেয় বলেই আমি আছি, আমি শ্রদ্ধার যোগ্য না হয়ে থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকত না।

পলায়ন করাতে শক্তির পরিচয় দেয় না, কাজটা শ্রদ্ধাযোগ্য তো নয়ই। তবু বাদল পালাবে স্থির করল। ভেবে চিন্তে স্থির করল এমন নয়। হঠাৎ পাগলা কুকুর কিংবা ষাঁড় দেখলে যেমন দৌড় দেওয়া সাব্যস্ত করতে হয় এক্ষেত্রেও তেমনি। বাদলের মন দ্বিধা করলেও প্রবৃত্তি অস্থির হল। অতএব বাদল আর দেরী করল না। জিনিসগুলো একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে ম্যানেজারকে বলল, "টাকা ফেরত চাইনে। হোটেলের ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইনি। অন্য কারণে অন্যত্র যাচ্ছি।" ম্যানেজার হাসির ভান করে বলল, "আশা করি আবার কোনোদিন শুভাগমন করবেন।"

বাদলের মনটা এক নিমিষে হালকা হয়ে গেল। অকস্মাৎ তার মনে হল তার কেউ নেই কিছু নেই কোনো ভাবনা নেই কোনো দায়িত্ব নেই। দিনটি পরিষ্কার ছিল। কোনো পার্কের কাছ দিয়ে যখন মোটর চলে যায় রাশি রাশি almond-মুকুল বাদলের চোখে অরুণ রঙের নেশা লাগিয়ে দেয়। অকবি বাদল উপমা খোঁজে। অতি মূল্যবান যার সময় সে খানিকটা সময়ের অপব্যয় করে। ভারতবর্ষে এই তো হোলি খেলার দিন। এদেশেও গাছে গাছে ডালে ডালে হোলি খেলা চলেছে।

বাদলের বিশেষ কোনো ঠিকানায় যাবার কথা ছিল না। খুব সম্ভব ওয়াই এম সি এ'তে গিয়ে উঠত। কিন্তু সেখানেও তিন চার দিনের বেশী রাখে না, যদি না অনেক আগে থেকে আবেদন করে স্থায়ী বোর্ডার হওয়া যায়।

সোফারকে বলল, "ভিক্টোরিয়া।"

যাক, কিছুদিনের মতো লণ্ডনের বাইরে গিয়ে অজ্ঞাতবাস করা যাক। মন স্বীকার না করলেও আত্মারাম জানেন কী শীত! কী বৃষ্টি! কী কুয়াশা! কী ধোঁয়া! কুয়াশা আর ধোঁয়া মিলে কী ফগ! কি অন্ধকার। —

ভিক্টোরিয়া স্টেশন। একপ্রান্তে ইউরোপ-অভিমুখী ও ইউরোপ-আগত ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম। অপর প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ ইংলণ্ডের ট্রেন সমাবেশ।

যে গতি-হিল্লোল মোটরে আসবার সময় বাদলকে মাতিয়ে রেখেছিল মোটর থেকে নেমেও বাদল তার প্রভাব সর্বাঙ্গে অনুভব করছিল। বিলম্ব করল না। আইল অব ওয়াইটের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। বাদলকে কোলে নিয়ে এমন দৌড় দিল যে পোর্টস্‌মাথ-এ পৌছতে ঘণ্টা দুয়েকও লাগল না।

সমস্ত পথ বাদল নিজের দেশকে প্রবল আগ্রহের সহিত চক্ষুসাৎ করছিল। লণ্ডনের আশে পাশে ফ্যাক্টরী। লণ্ডনের আওতা অতিক্রম করলে ছোট ছোট গ্রাম। মাঠে ঘোড়ায় টানা লাঙল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। বন্ধুর অনুর্বর ভূমির উপর সবুজ রঙের বার্নিশ করা। গাছে গাছে নতুন পাতা ও নতুন পাখী। গাছ কিংবা পাখী কারুর নাম বাদল জানে না, ওদের সম্বন্ধে বাদলের কোনোদিন কৌতূহল বোধ হয়নি।

বাদল কখনো ভাবছিল, আচ্ছা, গাছের সঙ্গে পাখীর এমন মিতালি কেন ও কবে থেকে? গাছ মাটি ছেড়ে নড়তে পারে না, পাখী আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায়। স্থিতির সঙ্গে গতির পরিণয় অদ্ভুত নয় কি?

কখনো ভাবছিল, এখনো ঘোড়ায় টানা লাঙল? এরা tractor কেনে না কেন? বাণিজ্যে আমাদের দেশ যেমন অগ্রসর কৃষিতে তেমন নয়, এ বড় আফসোসের কথা।

এক একবার ওয়েলীকে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বাদলের সাজানো বাগান শুকিয়ে যেত যদি ওয়েলীর 'লু' বাতাস প্রতিদিন তার উপর দিয়ে ছুটে যাবার পথ পেত। ইচ্ছার স্বাধীনতা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানুষের উদারমতি গবর্নমেণ্ট, অবাধ বাণিজ্য, উন্নত শিল্প, জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার, যানের উৎকর্ষ ও দ্রুতগতি, জাতিতে জাতিতে অক্ষতিকর প্রতিযোগিতা, কচিৎ এক আধটা যুদ্ধ—যা কিছু বাদল সমস্ত জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করে ওয়েলী এক ফুৎকারে নিবিয়ে দেন।

ওয়েলীর কাছ থেকে পালাতে হল, এ লজ্জা বাদল ভুলতে পারছিল না। নিজের পরাভবের জন্যে বাদল ওয়েলীকে দোষ দিল। দিয়ে ভারী আত্মপ্রসাদ বোধ করল।

তারপর তার মনে পড়ে গেল সুধীদাকে। কী মজা! সুধীদা

টের পাবে না বাদল কোথায়। কেউ জানতে পাবে না সে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। শুধু জানবে তার ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোক একজনকে অপর জনের ঠিকানা জানায় না। ওটা ওদের নীতি-বিরুদ্ধ। কাজেই সুধীদা জব্দ।

ব্যাঙ্কে বাদলের শ'দুই পাউণ্ড জমা রয়েছে। ছমাসের মতো সে নিশ্চিন্ত। এই ছমাস কাল সে নিভৃত চিন্তা করবে। মননের মতো আনন্দ কিছুতে নেই। দুনিয়ায় এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা নিয়ে বাদল মন খাটাবে না। মনের মতো দেশ, মনের মতো ঋতু, একটু নিরিবিলি একটি কুটীর, দুবেলা লঘুপাক আহার্য, সারাবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানো কিংবা মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা—অবশ্য ওয়েদার যদি আজকের মতো প্রসন্ন হয়। কী আনন্দ! কী মুক্তি!

পোর্টস্‌মাথ। খেয়া জাহাজ অপেক্ষা করছিল। ওপারে ওয়াইট দ্বীপ। দূর থেকে তার বনবীথি দেখা যায়।

বাদল ভাবছিল, আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, দাদা নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। আছে নিজের উপর শ্রদ্ধা। তাই থেকে অনুমান হয় নিজে আছি। আমি আছি, আর আছে আমার মন। আমরা দুটি সঙ্গী।

পলায়নের পরে

১

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট-এর সঙ্গে সুধীর পরিচয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে। উক্ত গৃহে দিনের পর দিন পাশাপাশি বসতে বসতে কত পাঠক পাঠিকার মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়ে পরিণয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে, পরিচয় তো সামান্য বিষয়। প্রথমে হয় গুড মর্নিং বলাবলি। তারপরে দৈবক্রমে একদিন দুজনের লাঞ্চ খাওয়া হয় একই রেস্তোরাঁর একই টেবিলে। তখন একটু আবহচর্চা হয়। "এ বছর বৃষ্টিটা কিছু বেশী বলে মনে হয়।" "আমি তো আগস্ট মাস থেকে বৃষ্টির বিরাম দেখছিনে।" "ওঃ, আপনি গ্রীষ্মকালে এদেশে ছিলেন না! সারা গ্রীষ্মকালটা ভিজে রয়েছিল।" সেদিন ঐ পর্যন্ত। পরেও একদিন দৈবাৎ ঐ টেবিলেই দুজনের সাক্ষাৎ। সুধীকে দেখে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট বললেন, "এই যে আপনি আজও এখানে। এখানকার খাওয়া আপনার পছন্দ হয় দেখছি।" সুধী বলল, "অনেক ঘুরে শেষে এইখানে ভিড়ে গেছি। এরা নিরামিষটা বাস্তবিকই ভালো রাঁধে।" মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট পরিহাস করে বললেন, "নিরামিষ যে রাঁধে এইটাই হচ্ছে half the battle. তারপর ভালো রাঁধে সেটা তো রীতিমত দিগ্বিজয়।" সুধী বলল, "ভালো রান্নার জন্যে আমি এক মাইল হাঁটতে রাজি আছি।" মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট এর উত্তরে বললেন, "ভালো রান্নার অঙ্গীকার দিতে পারব না, কিন্তু নিরামিষ যদি ভালোবাসেন তবে আমাদের ওখানে একদিন আপনার নিমন্ত্রণ রইল, মিস্টার—।" সুধী তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করে দিল।

রিম্‌লেস চশমার পিছনে তাঁর ঈষৎ নিমীলিত চক্ষু পরিহাসকালে প্রায় নিমীলিত দেখায়। বয়স ষাটের এদিকে কিংবা ওদিকে। চুল এখনো সেকেলে ধরনে বাঁধা, সব পেকে গেছে। গাল বেশ ফুলকো, স্বাস্থ্যের বর্ণচ্ছটায় রঙিন। ভরাট গড়ন, দীর্ঘ ঋজু আকার। সুধী এলেন টেরীর সঙ্গে তুলনা করল। পোশাক মসৃণ কালো সার্টিনের। বাম হাতের একটি আঙুলে একটি আংটি, দেখে মনে হয় বাগ্‌দানের।

রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের সময় ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট সুধীকে দেখে বললেন, "One more unfortunate! এলেনর, তুমি এঁকে কবে ভজালে?"

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট নিরামিষ turtle soup পরিবেশন করে নিরামিষ lamb cutlets-এর ঢাকা খুলতে যাচ্ছিলেন। ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তীকে কনভার্ট করা যেন নিউকাস্‌লে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া। আচ্ছা মিস্টার চক্রবর্তী, মিসেস বেসাণ্টের সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে?

সুধী বলল, "আমি থিয়সফিস্ট নই।"

এলেনর বললেন, "নন্? তবে কেমন করে নিরামিষাশী হলেন?"

সুধীকে ভারতবর্ষের সাত্ত্বিক আদর্শের প্রসঙ্গ পাড়তে হল। শেষে সুধী বলল, "জৈনদের নাম শুনেছেন?"

এলেনর বললেন, "শুনেছি বৈ কি। সেই যাদের শব শকুনে খায়। উঃ!" (শিউরে উঠলেন।)

সুধী হেসে বলল, "আপনি যাদের কথা ভাবছেন তাদের বলে পার্শী।"

"ওঃ পার্শী! How dreadful! শুনলে আর্থার? তোমার গ্রীকদের পরম শত্রু সেই যে পার্শিয়ানরা, তারাই—মানে তাদের বংশধররাই—ওঃ How dreadful!"

সুধী জানত না যে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটের দুই নম্বর রাতিক ইংলণ্ডে শবদাহ প্রচলিত করা। এজন্যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা একটি সমিতি করেছেন। যাঁরা চাঁদা দিয়ে সভ্য হবেন তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের শব সমিতি কর্তৃক দাহ করা হবে। শবদাহ-কার্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সমগ্র দেশের মধ্যে হয়তো একটি কি দুটি Crematorium আছে।

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট সুধীকে সভ্য হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। সুধী প্রথমটা আশ্চর্য ও পরে কৌতুক বোধ করে বলল, "আমি তো পার্শী নই। আমি হিন্দু। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্য সকলে তাকে ঘাড়ে করে শ্মশানে নিয়ে যায়, ঝড় বৃষ্টির রাত্রেও; একটি পেনী মজুরি নেয় না।"

ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট গম্ভীরভাবে বললেন, "প্রাচীন গ্রীকরা শব দাহ করত, না, শবকে গোর দিত সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।" অন্যমনস্ক অধ্যাপককে দাবড়ি দিয়ে তাঁর ভগিনী বললেন, "কিন্তু আধুনিক পার্শীদেরকে আমাদের সমিতির সভ্য করতে হবে, আর্থার।"

মেলবোর্ন-হোয়াইট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে সুধী জানতে পারল এঁদের পূর্বপুরুষ কেউ রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্নের আত্মীয় ছিলেন। লর্ড মেলবোর্নের একখানি প্রতিকৃতি এঁদের বসবার ঘর অলঙ্কৃত করছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট বলছিলেন, "the Melbourne grit" তাঁদের পরিবারের বিশেষত্ব। তাঁর বিষয়ে সুধীর সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর ভাইটি বড় বেচারা মানুষ। বয়সেও তাঁর বড়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মস্ত ক্লাসিকাল স্কলার, গিল্‌বার্ট মারের মতো প্রখ্যাত না হলেও তেমনি বিদ্বান। ভাইবোন দুজনেই অনূঢ়, তবে ভাইয়ের জীবনে

কখনো কোনো রোমান্স ঘটেছিল কিনা তার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর আঙুলে অঙ্গুরীয় নেই। আকারে আয়তনে ভাইটি খর্ব ও ক্ষীণ, কিন্তু তাঁর দাড়ির বহর তাঁকে বাড়িয়ে দেখায়। বোনের অতি-সজাগ চক্ষু তাঁর পরিচ্ছদকে মলিন কিংবা কুঞ্চিত হতে দেয় না। অন্যান্য বিষয়েও তাঁর উপর বোনের অত্যাচার অবিরত লেগে রয়েছে। বোনটি এতটা পটু না হলে ভাইটিও বোধ করি এতটা অপটু হতেন না। আক্ষেপ করে বলছিলেন, "হতে চেয়েছিলুম ক্লাসিকাল নায়ক, হয়ে দাঁড়ালুম ক্লাসিক্সের অধ্যাপক। কাজের মধ্যে পড়া আর পড়ানো।"

সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ছাত্র ?"

সুধী উত্তর দিয়েছিল, "হাঁ, সার।" প্রবীণ ব্যক্তিকে সার বলে সম্মান দেখিয়ে সুধী সম্মান বোধ করে। বাদলের মতে সকলেই সমান। সমানে সমানে সহজ ভদ্রতা চলুক, উচ্চতা নীচতার ভান কেন ?

ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট বলেছিলেন, "কিসের ছাত্র ?"

সুধী বলেছিল, "জীবনশিল্পের।"

"তা হলে প্রাচীন গ্রীকদের দ্বারস্থ হতে হয়।"

"কিন্তু তারা কি বেঁচে আছে ?"

"আছে বৈ কি। যে একবার বেঁচেছে সে চিরকাল বেঁচেছে। মরে তারাই যারা জন্ম থেকে মরা। প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতবৎসা, মিস্টার চক্রবর্তী।"

সুধী সবিনয়ে বলেছিল, "মৃতের জন্যে কি আপনি শোক করেন না, সার? এই যে গত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বীর—"

কেন? যুদ্ধে কি মানুষ এই প্রথম মরল? ট্রয়ের যুদ্ধে বছরের পর বছর কি তখনকার অনুপাতে কম মানুষ মরেছে? যদি বল ট্রয়ের যুদ্ধ অন্‌ঐতিহাসিক, তবে Peloponnesian War ?"

কোন কথা থেকে কোন কথা এসে পড়ল। সুধী ভাবছিল সেদিনকার মতো উঠবে কি না। ডক্টর মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট বললেন, "কী নাম?—বাবগড্ গীটা, না, কী যেন বইখানার নাম? আমি পড়েছি।"

সুধী বলল, "শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা।"

"ওতে লিখেছে যারা মরে রয়েছে তারাই মরে, কাজেই মারা সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ করা কাপুরুষতা। সংস্কৃত আমি জানিনে, কিন্তু গ্রীকের সঙ্গে তার ভাষার ও ভাবের বহু সাদৃশ্য তারা আবিষ্কার করেছে যারা দুটোই জানে। তুমি দুটোই জান?"

"আমি সংস্কৃত সামান্য জানি। গ্রীক একেবারেই না।"

"একেবারেই না? এ-কে-বা-রেই না!"

সুধী লজ্জিত হয়ে নিঃশব্দ রইল।

ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট তাকে খানকয়েক বইয়ের তালিকা দিয়ে তারপরে বলেছিলেন, "রবিবারগুলোতে আমার কাছে এসো, সংস্কৃত ও গ্রীক চর্চা করা যাবে।"

ক্রমশ যখন ঘনিষ্ঠতা হল তখন ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট সুধীকে তাঁর জীবনের ব্যর্থতার কথা বললেন। তাঁর বোন তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। কোথাও যেতে দেন না। ১৯০৯ সালে Roosevelt যখন আফ্রিকায় শিকার করতে যান তখন তাঁর দলের মধ্যে আমাদের ডক্টরেরও নাম ছিল, কিন্তু এলেনর তাঁকে যেতে দিলেন না। ১৯১২ সালে তিনি স্কটের সঙ্গে দক্ষিণ মেরু যাত্রা করবেন ঠিক হয়ে গেছল, কিন্তু সে বারেও এলেনর দিলেন বাধা। ১৯১৪ সালে তিনি বয়স ভাঁড়িয়ে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন, কিন্তু এলেনর জানতে পেরে পণ্ড করে দিলেন। গ্রীক হবার একটাও সুযোগ তিনি পেলেন

না। যে বিদ্যা জীবনে রূপান্তরিত হতে পারে না সে যেন অচল স্বর্ণমুদ্রা, তাকে বাজারে ভাঙানো যায় না, লকেট করে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ানো ছাড়া তার অন্য সদ্ব্যবহার নেই! হিউম্যানিটারিয়ান বোনের উৎপাতে তিনি মাংসাহার তো ত্যাগ করেছেনই। তাঁর দাড়ি কামানোরও হুকুম নেই, পাছে অসাবধান হয়ে মাংস কেটে ফেলেন।

২

পাঁচ শত ডিম চাই!

কোনো এক অনাথাশ্রমের জন্যে ঈস্টার মহোৎসবের দরুন পাঁচ শত ডিম চাঁদা করার ভার মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটের উপর পড়েছে। তিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন কে কটা ডিমের মূল্য ভিক্ষা দিতে পারবে। সুধীকে পাকড়াও করে বললেন, "এই যে মিস্টার চক্রবর্তী। আপনার নামে কত লিখব বলুন। একশোটা? সুধী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল, বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী।

মিস্ তাঁর চশমার ওপার থেকে মিটি মিটি চাউনি ক্ষেপণ করে মিষ্টি হেসে বললেন, "ওদের তো কেউ আপনার লোক নেই। আমরা না দিলে কে দেবে বলুন। মোটে পাঁচশোটা ডিম। আর্থার একশোটা দিতে দয়া করে রাজি হয়েছেন। না আর্থার?"

ডক্টর বললেন, "কই? না।"

মিস্ বেশ জোরে জোরে অথচ ধীরে ধীরে বললেন, বলবার সময় তর্জনীর দ্বারা তাল দিতে দিতে।—"আর্থার, গেল বছর তুমি একশোটা দিয়েছিলে। তার আগের বছরও একশোটা। অনাথাশ্রমের ছেলে-মেয়েরা তাদের আর্থার কাকার নাম মনে রেখেছে। তুমি কি এ বছর তাদের নিরাশ করতে চাও?"

ডক্টর সুধীর সঙ্গে এমনভাবে চোখাচোখি করলেন যেন তার অর্থ, "দেখলে তো! আমি বলেছিলুম কি না।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলালেন। তার পর সান্ত্বনার সুরে বললেন, "গ্রীকদের মধ্যে যোগ্যের পুরস্কার ছিল, কিন্তু অযোগ্যের প্রতি সকরুণ ভিক্ষা ছিল না। এটা আমাদের হৃদয়বৃত্তির শৌখিনতা।"

মিস্ তখন নিবিষ্টমনে একশোটা ডিমের বাজারদর কষছিলেন। কান দিলেন না। সুধী বলল, "দানশীলতা আমার দেশে চিরদিন অযোগ্য পাত্রের অপেক্ষা রেখেছে; কারণ যোগ্য পাত্র তো দান চায় না।"

ডক্টর বললেন, "কিন্তু দানশীলতাই যে একটা দুর্বলতা। ভারতবর্ষ ওটাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন ও কবে থেকে?"

সুধী বলল, "পুরাণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। তিনি স্ত্রীকে বিক্রয় করে সাম্রাজ্যদানের দক্ষিণা জুটিয়েছিলেন। ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের সম্বন্ধে পড়েছি, তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যথাসর্বস্ব দান করে নিঃসম্বল হতেন। অসংখ্য উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এর অর্থ নিহিত আছে। কতকগুলো লোক বলবান বিদ্বান ধনবান ও অন্য কতকগুলো লোক নিরাশ্রয় মূর্খ ও দরিদ্র হয়েই থাকে। সমাজ এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সর্বদা সচেষ্ট না থাকলে দক্ষিণ অঙ্গের অতি বৃদ্ধি ও বাম অঙ্গের অতি ক্ষয় ঘটবে এবং পরিশেষে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমাজ ডিগবাজি খাবে। এই চেয়ারখানার একটা পায়া ভাঙলে যে দশা হয় সেই দশা। সেই জন্যে দান করাটা দাতার গরজ। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দান করতে হয় এবং দানের সঙ্গে দিতে হয় দক্ষিণা।"

মিস্ যে সব কথা শুনছিলেন তা কাউকে জানতে দেননি। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "শুনলে তো, আর্থার? সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার সংকেত?

তোমার গ্রীকরা অপঘাতে ম'ল ক্রীতদাস পুষে। রোমানরা ম'ল ক্রীত-দাসকে সিংহের খাঁচায় পূরে মজা দেখতে দেখতে। তুমি কি তোমার স্বজাতির তেমনি মৃত্যু চাও? আমি জানি তুমি বলবে মৃত্যু যার ঘটে রয়েছে তারই ঘটবে। কিন্তু আমি গ্রীক নই, আমি Destiny মানিনে। যাকে প্রতিরোধ করতে পারি তাকে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ যতদূর সাধ্য ততদূর প্রতিরোধ করব। যা ঘটা উচিত নয় তাকে ঘটতে দেব না।"

সুধীর দিকে ফিরে বললেন, "দেখুন দেখি মিস্টার চক্রবর্তী, যুদ্ধ একটা জিনিস যা সভ্য মানুষের কলঙ্ক। নির্বোধে লড়াই করে তিল তিল করে মরে—ওঃ সে কী অকথ্য যন্ত্রণা! বুদ্ধিমানেরা মিথ্যাকথায় খবরের কাগজ ভরিয়ে মনের মধ্যে নরক নিয়ে বাঁচে এবং বেশ দুপয়সা করে খায়। আমরা নারীরা চিরকাল ঠাকুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করে চোখের জলে ভেসে অনাহারে অল্পাহারে দিন কাটিয়ে প্রিয়জনকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখলুম ফল হয় না। আগুন একবার যদি লাগে তবে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ না করা অবধি নেবে না। আগুন যাতে না লাগে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমাদের এই No More War Movement. কিন্তু আর্থার কিছুতেই এতে যোগ দেবে না।"

সুধী বলল, "অমন করে কি যুদ্ধ নিবারণ করা যায়, মিস্ মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট? অবশ্য আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করবার অনুমতি দেন।"

মিস্ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। ধরে রেখেছিলেন সুধীও তাঁদের দলে। বললেন, "বিশ্বের লোকমত যদি আমাদের দিকে হয় তবে যুদ্ধ করবে কারা ও কার সাহায্যে?"

সুধী সবিনয়ে বলল, "ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইটের মতো যুদ্ধকে আমি কাম্য মনে করিনে, বরঞ্চ আপনারই মতো দূষণীয় জ্ঞান করি। কিন্তু যুদ্ধের জড় আমাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রে উহ্য থেকে আমাদের চিন্তায়

বাক্যে ও কার্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অতি নগণ্য কোণে অতি সামান্য একজন মানুষ যদি একটিমাত্র মিথ্যা কথা বলে তবে সেই ছিদ্র দিয়ে মহাযুদ্ধের মহামারী পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়। যদি একটি মুহূর্ত মন্দ চিন্তা করে তবেও সেই কথা। যদি অন্যায় কাজ করে কিংবা কর্মবিমুখ হয় কিংবা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তবেও সেই কথা। স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কোনো সম্ভাবনা কোনো দেশে দেখতে পারছিনে, মিস্ মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট। কোনো জাতির ধর্মে ত্রুটি আছে, কোনো জাতির ফিলসফিতে, কোনো জাতির প্রকৃতিতে খাদ আছে, কোনো জাতির শিক্ষাদীক্ষাতে। আপনারা শেষোক্তটার—শিক্ষাদীক্ষার—উপর ঝোঁক দিয়েছেন। আপনাদের উদ্যমের প্রশংসা করি।"

মিস্ মনোযোগপূর্বক সমস্ত শুনছিলেন। কাগজপত্র ব্যাগে পূরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি বোধ করি পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত না দেখে কার্যক্ষেত্রে নামবেন না, মিস্টার চক্রবর্তী। কিন্তু কথায় কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না যে আপনার কাছে আমার অনাথ বালকবালিকারা একশোটি ডিমের আশা রাখে।"

সুধী তাঁর দিকে একখানি পাউণ্ড নোট বাড়িয়ে দিল।

ডক্টর বললেন, "আসুন কঠোপনিষৎ পড়া যাক।"

৩

Bayswater অঞ্চলে মেল্‌বোর্ন-হোয়াইটদের বাগান-বেষ্টিত বাড়ী। দুজন মানুষের পক্ষে বেশ বড় বলতে হবে। বেস্‌মেণ্ট নেই। নিচের তলায় বসবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর। উপর তলায় আর্থার এলেনর ও প্রৌঢ়া পাচিকা মিস্ ডব্‌সনের তিনটি স্যুইট্ (suite)। তেতালায় আর্থারের মস্ত লাইব্রেরী। তিনি থাকেন বেশীর ভাগ সময়

সেইখানে কিংবা কলেজে, আর তাঁর ভগিনী থাকেন নিচের তলায় বসবার ঘরে—যার একদিকে একটি গ্র্যাণ্ড পিআনো এবং অপর দিকে একটি ডেস্ক—কিংবা সভা-সমিতিতে।

ভাই বোন উভয়ের আমন্ত্রণে সুধীকে এ বাড়ীতে ঘন ঘন আসতে হয়। একদিন আর্থার বলেন, "চক্রবর্তী, ট্র্যাজেডীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই যে প্রশ্ন আজ তুললে এর উত্তর চিন্তা করতে আমার দু'একদিন লাগবে অথচ শ্রোতার জন্যে সাত দিন অপেক্ষা করলে সমস্ত ভুলে যাব। কাজেই তুমি পরশু আমার সঙ্গে কলেজে দেখা কোরো, একসঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ী আসা ও চা খাওয়া যাবে।" অন্যদিন এলেনর বলেন, "সুধী, অন্ধ কারুশিল্পীদের দেখতে চেয়েছিলে, কাল সুইস কটেজ স্টেশনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। কেমন? সেখান থেকে বাড়ী ফেরা যাবে। তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে জন কয়েক বন্ধুকে চা খেতে ডেকেছি।"

ভাইবোনের মধ্যে ভাবসংক্রান্ত বিবাদে সুধী মধ্যস্থ হয় ও শেষ পর্যন্ত একটা সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়কেই খুশি করে। ওঁরা ভাবেন, তাই তো, আমাদের মতবাদে মিল যত আছে অমিল তত নেই তো। তাঁরা একদিন প্রস্তাব করেছিলেন সুধী তাঁদের বাড়ী স্থায়ী অতিথি হলে তার জন্যে জায়গা করে দিতে পারবেন। সুধী বলেছিল, মার্সেলকে ছেড়ে কোথাও নড়তে পারবে না। বাস্তবিক ঐ মেয়েটার প্রতি সুধীর মায়া পড়ে গেছল। দেশে ফেরবার সময় তাকে কেমন করে ছেড়ে যাবে ভাবতে তার এখন থেকেই মন কেমন করে। বিদেশে আসার এই এক কষ্ট, বিদেশী মানুষের সঙ্গে স্নেহ মমতার জোড় লোহার সঙ্গে চুম্বকের মতো যত সহজে লাগে তত সহজে ভাঙে না।

আর্থার তাঁর প্রকাণ্ড পুস্তকাগারের এক কোণে হারিয়ে যান।

আত্মগোপনের দ্বারা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কোনো কোনো পশুপক্ষীর বর্ণকে বনজঙ্গল গাছপাতা বালুমাটির সমান করে তোলে, শিকারী যেন তাদের সন্ধান না পায়। ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইটের দাড়িতে তাঁকে ধরা পড়িয়ে দেয়, নতুবা চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নি। তাঁর পোশাক তাঁর লাইব্রেরী ঘরের ওয়ালপেপারের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এবং তিনি যেখানে বসে পড়েন সেখানে এত বই গাদা করেন যে তাঁর শ্মশ্রুবহুল মুখ ঢাকা পড়ে যায়। বিবরের ভিতরে বীভার নামক প্রাণীর মতো প্রবেশ না করলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। যতক্ষণ না অন্তত চল্লিশখানা মোটা মোটা কেতাব তাঁর টেবিলের উপর পাররনাসাসের মতো উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে ততক্ষণ তিনি স্নায়ুতাড়িত ভাবে ছুটাছুটি করতে থাকেন।

তাঁর লাইব্রেরীতে তাঁকে চা দিয়ে আসতে হয়, যেদিন তিনি চায়ের সময় বাড়ী থাকেন। লাইব্রেরীর পাশে ছাদের খানিকটা খোলা। সেখানে তিনি পায়চারি করতে ভালোবাসেন। কোনো কোনো দিন তাঁর প্রিয় শিষ্য বা প্রিয় বয়স্য সমাগত হলে তিনি ডেক্ টেনিস খেলেন সেখানে।

এদিকে তাঁর ভগিনীর দৃষ্টি নিম্নগামী। মালীকে খাটিয়ে ও নিজে খেটে তিনি তাঁর বাগানে যে মাসের যে ফুল সে মাসে সে ফুল ফুটিয়ে থাকেন। একটি কোণে একটি কুঞ্জের মতো আছে। সেখানে একটি ফোয়ারা আছে, সেটি তাঁর বিশেষ প্রিয়বস্তু। তার মূলদেশে রাজ্যের ঝিনুক জড় করা, কেবল ঝিনুক নয়—শাঁখ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা। এগুলি তাঁর নিজের সংগ্রহ। বসবার ঘরের যে দিকটাতে বাগান সেই দিকে একটি বারান্দা আছে। সেখানে বসে তিনি বাগানের শোভা দেখতে দেখতে জামা তৈরি করেন। কাছেই একটি লতা দেয়াল বেয়ে দোতালায় তাঁর শোবার ঘরের জানালা পর্যন্ত উঠে গেছে।

রান্নাঘর ও ভাঁড়ারঘর হল মিস্ ডব্‌সনের রাজ্য। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট সেখানে পদার্পণ করেন না, যদি না মিস্ ডব্‌সন আহ্বান করেন। মিস্ ডব্‌সন ভদ্রঘরের মেয়ে। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তাঁর হাতে রান্না ও বাজার ছেড়ে না দিলে তিনি হয়তো কাজ ছেড়ে দিতেন। তাঁর নিরামিষ রান্নার হাত ভালো, স্বভাব চরিত্র ধাত ভালো। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট ঠিকা ঝি রাখতে পারতেন, কিন্তু আজকালকার দিনে এমন ঝি পাওয়া যায় না যার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ আছে। তাঁর প্যান্ট্রিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর Old China (চীনে মাটির বাসন) যা আছে তার দাম এখনকার বাজারে হাজার পঁচিশ টাকা। বাড়ীখানার চাইতেও সেগুলিকে তিনি প্রিয় মনে করেন। পাছে সেগুলি চুরি যায় সেজন্যে তিনি প্যান্টিতে ডবল চাবীর ব্যবস্থা করেছেন। মিস্ ডব্‌সনও এ বাড়ীতে আছেন প্রায় ষোল সতের বছর। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটকে "ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করেন না, বলেন "মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট।"

সুধীর পাগড়ী ও গায়ের রঙ মিস্ ডব্‌সনকে প্রথমটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তিনি দরজা খুলে দু' পা পিছিয়ে যেতেন। সুধী ইংরেজী বলতে পারে জেনে তিনি আশ্চর্য হলেও আশ্বস্ত হন। ক্রমশ সুধীর ভক্ত হয়ে পড়লেন। একদিন হাত পেতে বলেছিলেন ভাগ্যগণনা করতে। সুধী পরিহাস করে বলেছিল, নিকটেই আপনার বিবাহের সম্ভাবনা দেখছি, মিস্ ডব্‌সন। মিস্ ডব্‌সন লজ্জায় সেই থেকে আর হাত পাতেন নি, তবে সপ্তাহে একদিনের বদলে দুদিন হাফ ছুটী নিতে আরম্ভ করলেন দেখে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটের আশঙ্কা হতে লাগল পাছে মিস্ ডব্‌সন সত্যিই বিয়ে করে কাজ ছেড়ে দেন।

৪

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট বাড়ী ছিলেন না। ডক্টর সুধীকে লাইব্রেরীতে বসিয়ে মিস্ ডব্‌সনকে ডেকে বললেন দুজনের মতো চা দিতে।

সুধীকে বললেন, "বলছিলুম ট্র্যাজেডী কথাটার অপপ্রয়োগ দৈনিক কাগজে প্রতিদিন দেখতে পাই, তাই তোমাকে গোড়াতেই সাবধান করে দিচ্ছি যে অমন ট্র্যাজেডীর ব্যাখ্যা আমার কাছে প্রত্যাশা কোরো না, চক্রবর্তী।"

সুধী বলল, "না সার্, আমি যার কথা পেড়েছিলুম সেটা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের মুখে শুনতে পাওয়া ট্র্যাজেডী।"

তিনি বললেন, "সেটাতে পরিণামের কথাই বলে, যে পরিণাম শোকাবহ তার কথা। আরম্ভ হল হয়তো সুখ সম্পদের মধ্যে, শেষ হল দুঃখ দারিদ্র্যে অকাল মৃত্যুতে, এই আমাদের ইংলণ্ডীয় ট্র্যাজেডী। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডী অমন নয়, চক্রবর্তী। তুমি যে বলছিলে সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডী নেই সেটা বোধ করি তুমি ইংরেজী অর্থে বলছিলে।"

সুধী বলল, "গ্রীক অর্থ টা কী তাই আগে শুনি।"

ডক্টর চা ঢেলে দিতে দিতে বললেন, "ক' টুকরা চিনি খাও?"

তারপর হেসে বললেন, "গ্রীক অর্থ হচ্ছে ছাগলের গান। এর উপর টীকা করা হয়েছে, ডাইওনিসাসের মন্দিরে ছাগবলি দেবার পরে নিহত ছাগলের উদ্দেশে যে গান করা হত সেই গান। হা হা হা। তোমার কি তাই মনে হয়?"

সুধী উত্তর দিল না। মৃদু হাসল।

তিনি বললেন, "সেকালে কোরাসদের নামকরণ হত পশু পাখীর নামে। যথা ব্যাঙের কোরাস, ভীমরুলের কোরাস, রামছাগলের কোরাস।

রামছাগলের কোরাস যে একটা গম্ভীর ভাবাত্মক ও করুণ রসাত্মক ব্যাপার হবে তার আর আশ্চর্য কী? কোনো কোনো টীকাকার বলেন, য়্যারিস্টফেনিসের 'ব্যাঙ' নামক কমেডী যেমন ব্যাঙের কোরাস থেকে, সর্বপ্রাচীন ট্র্যাজেডী তেমনি রামছাগলের কোরাস থেকে।"

সুধীও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে হাসল।

তিনি শান্ত হয়ে বললেন, "আড়াই হাজার বছর পরে শব্দের ধাতুগত অর্থ দিয়ে তার সংজ্ঞা বা প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায় না। গ্রন্থগুলি পড়ে তাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে তোমার আমার যা ধারণা তাই তাদের তাৎপর্য। সদৃশতাৎপর্যবিশিষ্ট নাটকগুলিকে ট্র্যাজেডী আখ্যা দিয়ে তারপর ট্র্যাজেডীর অর্থ করলে মোটের উপর সেইটেই হবে যথার্থ অর্থ। আমি জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের ও বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে অতীতের বিচার করে থাকি, চক্রবর্তী। যারা কেবলমাত্র পণ্ডিত তাদের সঙ্গে আমার সেই কারণে বনে না।"

তিনি সুধীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন সুধী সম্প্রতি সফক্লিসের "রাজা ঈডিপাস" পড়েছে। ঈডিপাসের পিতা পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনলেন যে সে একদিন পিতৃহত্যা করে নিজের জননীকে বিবাহ করবে। তিনি তার জন্মের অল্পদিন পরে তাকে বধ করবার জন্যে এক রাখালকে দিলেন। রাখাল দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক বিদেশী পথিকের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। বিদেশী রাজা ছিলেন অপুত্রক। পথিকের কাছে তিনি এই শিশুকে পেয়ে অতি যত্নে লালন করলেন। বড় হয়ে সে তার পালক পিতাকে আপন পিতা বলে জানল। হঠাৎ একদিন উপরোক্ত প্রকার দৈববাণী শুনে পাছে পিতৃঘাতী হতে হয় সেই ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রথের সারথি তাকে পথ থেকে হটে যেতে বলল। বাক্‌বিতণ্ডার ফলে সারথি ও রথী উভয়েই হলেন

তার দ্বারা নিহত। সে পালাতে পালাতে শেষকালে যে দেশে উপনীত হল সে দেশের লোক তাকে তাদের মৃত রাজার স্থলে অভিষিক্ত করল ও বিধবা রাণীর সঙ্গে বিবাহ দিল। কালক্রমে তাদের সন্তান হল। অকস্মাৎ দেশে এল মহামারী। খোঁজ, খোঁজ, কোন মহাপাপে এমন ঘটল। সব প্রকাশ হয়ে পড়ল। রাণী দিলেন গলায় দড়ি। ঈডিপাস আপন হাতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করে আপন ইচ্ছায় নির্বাসিত হলেন।

সুধী বলল, "সফক্লিসের রচনার গুণে গল্পটি এমন ঘোরালো আর কথোপকথন এমন জোরালো হয়েছে যে আড়াই হাজার বছরে কোনো নাট্যকার ঐ দুই দিকে উন্নতি দেখাতে পারেননি। তবে চরিত্রচিত্রণ বড় মোটা তুলিতে মূল রঙের সাহায্যে হয়েছে।"

ডক্টর সুধীর সঙ্গে একমত হলেন। সফক্লিস তাঁর প্রিয় নাট্যকার। তিনি বললেন, "সমস্যাসংক্রান্ত নাটক আধুনিক যুগে রাশি রাশি লেখা হচ্ছে, কিন্তু হতভাগ্য ঈডিপাসের সমস্যাকে কোনো সমস্যাই অতিক্রম করতে পারছে না। পিতামাতার জন্যে, পুত্রকন্যার জন্যে, আপনার জন্যে কী খেদ কী লজ্জা কী গ্লানি ঐ একটা মানুষের। কিন্তু ট্র্যাজেডী আমি সেইটুকুকে বলব না। ট্র্যাজেডী হচ্ছে তাই যার কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই, যা অবশ্যম্ভাবী, যাকে চুপ করে ঘটতে দেওয়া ও অসহায় ভাবে সয়ে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। এই যেমন গত মহাযুদ্ধ। ঐ নরকের ভিতর দিয়ে যেতেই হল আমাদের সবাইকে, কেউ প্রাণে মরে সকলের থেকে এগিয়ে গেল, কেউ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করল, কেউ আমার মতো অকর্মণ্য হয়ে সকলের থেকে বেশী ভুগল।"

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। বলল, "ঈডিপাস যা করেছিলেন তা না জেনে করেছিলেন, তার দরুণ অনুশোচনার আবেগে আত্মপীড়ন করা

তাঁর উচিত হয় নি। নিজের দুর্ভাগ্যকে সাধ্যমতো খণ্ডন করাতেই মনুষ্যত্বের জয়।”

ডক্টর বাধা পেয়ে বিরক্তি দমন করে বললেন, “কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এরূপ ক্ষেত্রে অখণ্ডনীয়, মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড্। হয় বিধাতার নয় প্রকৃতির নয় অপরাপর মানবের stern necessity আমাদের দুর্ভাগ্যের মূলে। যেমন এক একটা ঝড় বা ভূমিকম্প তেমনি মানব সংসারের এক একটা ট্র্যাজেডী। ঝড়ের পরে যেমন আকাশ নির্মল হয়, বাতাস ঝির ঝির করে বয়, নব জীবনের উল্লাস অনুভূত হয়, তেমনি ট্র্যাজেডীর পরে। A stern necessity works itself out. দুই আর দুই মিলে চার হয়। তারপর আমরা বুঝি যা হয়ে গেছে তা মঙ্গলের জন্যে। ঈডিপাসকে দিয়ে দেবতারা প্রমাণ করলেন যে মানুষ যতই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যের অধিকারী হোক অহংকারে আত্মহারা হোক তার পতনের বীজ তার উত্থানের মধ্যে গুপ্ত আছেই, সে বীজ অঙ্কুরিত হতে বিলম্ব করলেও ক্রমায়িত হয়ে দশদিক আচ্ছন্ন করবেই।”

সুধী তাঁকে স্তব্ধ হতে দেখে ভরসা করে বলল, “বুঝেছি, আপনি যাকে ট্র্যাজেডী বলেন তাকে আমরা বলি কর্মফল।”

সুধী তাঁকে বোঝাল। তিনি বললেন, “আমি আমার অজ্ঞাতসারে যা করছি, তার ফল কি আমাকে ভোগ করতে হবে? তা কি কর্মের ও কর্মফলের সামিল?”

সুধী বলল, “নিশ্চয়। আইন জানিনে বলে বিধাতার আদালত আমাকে মাফ করবে না। সেইজন্যেই তো জ্ঞানার্জন করা আমাদের নিত্যকালীন কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞান মানুষকে আত্মহননের প্রেরণা দিতে পারে না। ঈডিপাসের জীবনে কী প্রমাণ হল? প্রমাণ হল এই যে সে যেন অত্যুচ্চ গম্বুজের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে মাটির থেকে পাঁচশো হাত দূরে; তাই দেখে

তার মাথা গেল ঘুরে; সে দিল লাফ। এটা তো কর্মফল নয়, নূতন কর্ম।”

ডক্টর মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, “তোমার দেখা ও আমার দেখা দুই স্বতন্ত্র ভূমি থেকে। আমি দেবতাদের স্বর্গ থেকে ঈডিপাস নামক একটি মানব ম্যারিয়নেটকে দেখছি। তাকে দিয়ে একরকম খেলা দেখানো হল। খেলার থেকে শিক্ষা—Wait to see life's ending ere thou count one mortal blest. সব ট্র্যাজেডীই খেলা এবং প্রত্যেক খেলার পিছনে শিক্ষা উহ্য আছে। তা বলে আমি বলছিনে যে সকলের জীবনে ট্র্যাজেডী ঘটে। না, ও জিনিস অত সস্তা নয়, চক্রবর্তী। যাদের জীবন মহৎ উপাদানে তৈরি কেবলমাত্র তারাই ট্র্যাজেডীর নায়ক হয়ে থাকে। ঈডিপাস এই হিসাবে ভাগ্যবান।”

সুধী কী বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর চা ঢেলে টেবিলটাকে নোংরা করে রেখেছিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে হাতের ঘা লাগিয়ে একটা পেয়ালাকে দিলেন মেজের উপর কাত করে। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট ঘরে ঢুকতেই দেখেন এই ট্র্যাজেডী। তাঁর বিরাট বপু শ্রমক্লান্তিতে ঘন ঘন আকুঞ্চিত প্রসারিত হচ্ছিল। তিনি কথাটি না বলে এক গাদা বইয়ের উপর ধপ্ করে বসে পড়লেন। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। সুধী আলোর সুইচটা টিপে দিল। আলোর আকস্মিকতা সইতে না পেরে মিস্ হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন।

৫

“এই যে সুধী, এ বেলা এইখানেই খেয়ো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।”

“সে কী করে হবে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট? আমার মাদাম যে

খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। আর মার্সেল গল্প না শুনে কিছুতেই ঘুমতে যাবে না।"

"আঃ, মার্সেল!"

"ওকে আজকাল ভগবানের গল্প বলি, মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট। ভগবান কে, কোথায় থাকেন, কী করেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ, তাঁর জন্যে আমরা কী করতে পারি। এই সব।"

"চমৎকার। তোমার মার্সেলকে দেখতে হবে একবার। তাকে নিয়ে আসতে পার না?"

"উহুঁ। গাড়িতে চড়লে তার অসুখ করে।"

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট সামান্য একজন শ্রমিকশ্রেণীর লোকের বাড়ী যাবেন মার্সেলকে দেখতে, এটা আশা করা অন্যায়। কাজেই সুধী তাঁকে আমন্ত্রণ করতে পারল না। তিনিও প্রসঙ্গটা চাপা দিলেন। সুধীকে ছেড়ে আর্থারকে নিয়ে পড়লেন।

"তারপর আর্থার, কতক্ষণ বাড়ী এসেছ? চা খাওয়া হয়েছে? ভুলে যাওনি? কই, তোমার পেয়ালা কোথায়? সর্বনাশ! এতক্ষণ টুকরাগুলো উঠিয়ে রাখনি? অধ্যাপক হলে কি এমনি ভোলানাথ হতে হয়? দেখেছ সুধী, আমার সেই পুরানো হলাণ্ডদেশীয় টী-সেট্-এর একটি পেয়ালা। হায় হায়! মিস্ ডব্‌সনকে আমি হাজারবার বারণ করেছি। বিয়ে-পাগলী হয়ে তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

পেয়ালার ভাঙা অংশগুলি একত্র করে ধরে তিনি আস্ত পেয়ালার অনুসরণ করলেন। লোহার শিক দিয়ে ওগুলিকে ফুঁড়ে লোহার তার দিয়ে ওগুলিকে বেঁধে জোড়া যায়। সেজন্যে কালকেই তিনি বণ্ড স্ট্রীটের এক দোকানে যাবেন সংকল্প করলেন।

আর্থার প্রথমটা অপদস্থের মতো অধোবদনে ছিলেন। কিন্তু সুধীর

সামনে এতখানি উচ্ছ্বাস দেখানো এলেনরের পক্ষে অশোভন হয়েছে মনে করে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বোনকে রীতিমতো ভয় করে চলতেন। সুধীর সামনে একটা কাণ্ড বাধাতেও তাঁর অপ্রবৃত্তি। সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন।

সুধী ভাবল এই সুযোগে বিদায় নেওয়া যাক। বলল, "মিস্ মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট—"

"এত বড় একটা গালভরা নামে নাই বা ডাকলে সুধী। বোলো আণ্ট এলেনর। আমি তো কবে থেকে তোমাকে সুধী বলে ডেকে আসছি। কিন্তু দেখ দেখি আর্থারের পাগলামি! বিয়ে করে থাকলে বৌটাকে ক্ষেপিয়ে তুলে ছাড়ত। আমি বলে সহ্য করি। অন্য কোনো বোন তাও পারত না। তুমিই বল না কেন, সুধী।"

"কিন্তু আণ্ট এলেনর, বয়ঃকনিষ্ঠের উপস্থিতিতে ওঁকে অমন কথা শোনানো ঠিক হয়নি আপনার। আমাকে বিদায় দিয়ে আপনি যান ওঁকে প্রসন্ন করুন।"

"সে কী! তুমি খেয়ে যাবে না? তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা ছিল। আমি একটা দোকান আবিষ্কার করেছি যেখানে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়, তোমরা যাকে 'কাডার' বল। কিছু কিনেও এনেছি। কাল পোশাক তৈরি করব বসে।"

অগত্যা সুধীকে প্রস্তাব করতে হল, "আচ্ছা, তবে কাল এসে দেখে যাব।"

পরদিন আণ্ট এলেনর বাগানের দিকের বারান্দায় বসে রঙীন পশমের খদ্দরের উপর কাঁচি চালাচ্ছিলেন, সুধীকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "ভিতর থেকে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বস।...পেয়ালাটা নিয়ে বণ্ড স্ট্রীটে যাব ভাবছিলুম। তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে এক সঙ্গে

যাওয়া যাবে।···তোমার সেই ঈস্টার ডিমের কথা মনে আছে? লেডী হেনরিয়েটা ব্লুমফিল্ড তোমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন। যদি তোমার কোনো দিন সময় হয় তবে আমার সঙ্গে তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করে আসা মন্দ নয়।···ও কী? আমার জন্যে ফুল এনেছ? কী ফুল? স্নোড্রপ্। বহু ধন্যবাদ!"

সুধী বলল, "একটি বুড়ো ভিখারী পথে পাকড়াও করে এইটি হাতে গুঁজে দিল। ভাবলুম নতুন আণ্টকে উপহার দিয়ে সম্বন্ধটার সম্বর্ধনা করি।"

আণ্ট এলেনর শুধু বলতে থাকলেন, "Too nice of you, too nice of you." উঠে গিয়ে একটি ফুলদানীতে যত্ন করে স্নোড্রপ্ গুচ্ছটি রাখলেন। বাগান থেকে ভায়োলেট ফুল তুলে একটি ছোট্ট তোড়া বেঁধে সুধীর বাটনহোলে পরিয়ে দিতে গিয়ে দেখেন তার বাটনহোল নেই।

"তাই তো সুধী। অতটা লক্ষ করিনি। মিছি মিছি ফুলগুলিকে কষ্ট দিয়ে তুললুম। এখন কী করি! আচ্ছা, নিয়ে তোমার মার্সেলকে দিয়ো।"

"ধন্যবাদ, আণ্ট এলেনর। মার্সেল খুব খুশি হবে।"

আণ্ট এলেনরের কী যে বলবার ছিল বলতে ত্বরা দেখা গেল না। সুধীর একটু কাজ ছিল। কিংস্ ক্রস্ স্টেশনে গিয়ে দেশ থেকে আসতে থাকা একটি ছেলেকে অভ্যর্থনা করতে হবে। ছেলেটিকে সুধী চেনে না, যোগানন্দের পরিচয়লিপি থেকে তার নাম জেনেছে এবং তার নিজের টেলিগ্রাম থেকে তার পৌঁছানোর তারিখ, সময় ও স্থান।

বহুকাল উজ্জয়িনীর সংবাদ না পেয়ে তার উৎকণ্ঠা সঞ্চার হয়েছিল। এদিকে বাদলও নিরুদ্দেশ। কাকামশাই যথেষ্ট বড় চিঠি লেখেন না, কেবলমাত্র বাদলের কুশল জিজ্ঞাসা করে ও সুধীর কুশল আশা করে ইতি

করেন। নবাগত যুবকটি হয়তো দেশের ও দশের খবর দিতে পারবে। যুবকটির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুধী ব্যগ্র হয়ে রয়েছিল। আণ্ট এলেনরের সঙ্গে আলাপ জমছিল না।

আধ ঘণ্টাকাল বাগানের দিকে চেয়ে থেকে সুধী বলল, "দেশ থেকে একটি ছেলের পৌছানোর কথা আছে আজ, আণ্ট এলেনর।"

"বটে? তোমার বন্ধু বুঝি?"

"না, আণ্ট এলেনর। বন্ধু আমার একটিমাত্র। সে আজ মাস খানেক নিরুদ্দেশ।"

"নিরুদ্দেশ! অসম্ভব। স্থির জান নিরুদ্দেশ?"

সুধী চিন্তামৌন থাকল। চিন্তার কিছুটা দুশ্চিন্তাও বটে। মনটা কেমন করে উঠছিল। আণ্ট এলেনর হাতের কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর দিয়েছ? দাওনি? চল আজই দিয়ে আসি। বিদেশী ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোথায় যেন একটা সমিতি ছিল। খুঁজে বার করতে হবে সেটাকে। আচ্ছা, একটু বস, আমি কোটটা নিয়ে আসি, ছাতাটাও। ইস্, বৃষ্টিটা জোর নামল।"

এপ্রিল মাস। এই বৃষ্টি, এই রোদ। উইলিয়াম ওয়াটসন তার বর্ণনা করেছেন:—

"April, April,
Laugh thy girlish laughter
Then a moment after
Weep thy girlish tears."

সুধীর সেই কথা মনে পড়ল। অমনি বাদলের চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সৌন্দর্যের আকর্ষণ সুধীকে সব ভোলায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আহার নিদ্রার গণ্ডী লঙ্ঘন করে।

তার প্রাণ শীতল হয় হৃদয় স্নিগ্ধ হয় অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও আত্মা পরিপূর্ণ হয়। আবেশ কিংবা উত্তেজনা, মূর্ছা কিংবা গদগদভাব তাকে মত্ত কিংবা মূঢ় করে না। বেগবিহীন বর্ষাধারা সবুজ তৃণের উপর এমন ভাবে পড়ছিল যেন ঘুম পাড়ানোর সময় শিশুর মাথার উপর মায়ের হাতের চাপড়। জোরে নয়, পাছে শিশুর ঘুম না আসে। অথচ আস্তেও নয়, পাছে শিশু আদরের অস্বচ্ছলতা অনুভব করে থেকে থেকে চোখ মেলে চায়।

৬

আণ্ট এলেনর তাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সুধী বলল, "আগে তার ব্যাঙ্কে একখানা চিঠি লিখে দেখি।"

আণ্ট বললেন, "তবে চল কিংস্ ক্রস্।"

চায়ের পেয়ালা সারাবার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে সুধী বলল, "ওকে একদিন এখানে নিয়ে আসব, আণ্ট এলেনর। আগে ও কোথাও উঠে বিশ্রাম করুক।"

একসঙ্গে খানিকটা পথ গিয়ে সুধী বিদায় নিল। কিংস্ ক্রস্ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গাড়ি এলে দেখতে পেল একটি কামরায় চার পাঁচ জন ভারতীয় যুবক। কোনটি বিভূতিভূষণ নাগ—সুধীর মনে প্রশ্ন উঠল। সুধী একজনকে একটু নেপথ্যে ডেকে প্রশ্ন করতেই উত্তর পেল, "আমিই বিভূতি। আপনি কি—"

"হাঁ, আমিই। আপনার সঙ্গের জিনিসগুলি কোথায়?"

বিভূতিকে সুধী দে সরকারের ওখানে নিয়ে তুলল। দে সরকার বাসায় ছিল না, তার বাড়ীওয়ালী সুধীকে চিনত। একটি ঘরে জায়গা করে দিল। সুধী বলল, "এইবার আপনি বিশ্রাম করুন, বিভূতিবাবু, আমি ওবেলা আসব।"

বিভূতির বয়স সুধীর থেকে দু-এক বছর বেশী। নাদুস নুদুস গড়ন। গায়ের রঙ মিশ কালো। তার চেহারার বৈশিষ্ট্য তার চোখে ও গোঁফে। ডাগর কালো চোখ, পদ্মপলাশাকৃতি। সূক্ষ্ম কোমল গোঁফ, চিত্রার্পিতের মতো। তার চলন শান্ত মন্থর, ভাষা জড়ানো, টান বাঙাল।

বলল, "একটু বসুন। আচ্ছা, বাথ রুমটা কোন দিকে?"

সুস্থ হয়ে সে যখন ফিরল তখন সুধী বলল, "উঠি তা হলে?"

বিভূতি অসহায়ভাবে বলল, "উঠবেন? ভাবছিলুম একবার সার্ নিকোলাস বিটসন বেলের সঙ্গে দেখা করতে যাব, বাবাকে বড় ভালোবাসতেন। পথ হারিয়ে ফেলব না?"

সুধী বলল, "সে কী, মশাই? স্নানাহার করে বাকী ঘুমটা ঘুমিয়ে নিন। দে সরকার ফিরুক। আমিও ফিরি। গল্পগুজব চলুক। ইংলণ্ডের জলহাওয়া সহ্য হোক। তারপর সার্ নিকোলাসের পালা।"

বিভূতি এক তাড়া কাগজ সুধীর সামনে ফেলে দিল। সাহেবদের সুপারিশ পত্র। বিভূতির বাবা শ্যামাচরণবাবুকে দেওয়া। Certified that Babu Shyama Charan Nag is a Sub Deputy Collector of rare ability......

সুধীর চেয়ারের পেছন থেকে ঝুঁকে পড়ে পিতৃ-গরিত পুত্র টিপ্পনি করল, "বেল সাহেব বাবাকে কানুনগো থেকে সাবডেপুটি করল। অকালে পেনশন না নিয়ে থাকলে এতদিনে ডেপুটি না করে ছাড়ত না, মিস্টার চক্রবর্তী। দেখি যদি বেল সাহেবকে ধরে মোবার্লি সাহেবকে চিঠি লেখাতে পারি।"

একটু পরে দে সরকার ফিরল। কাজেই সুধীর ওঠা হল না। দে সরকার সম্পূর্ণ পরিচিতের মতো হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হাউ ডু ইউ ডু।" পেশাদার চালিয়াতের হাতের ঝাঁকানি খেয়ে বেচারা

বিভূতির অন্তরাত্মা বুঝল দে সরকারের তুলনায় সে একটা গেঁয়ো ভূত। আমতা আমতা করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

অসহায় মানুষ দেখলে দে সরকার তাকে নিয়ে তামাশা করতে ভালোবাসে। জিজ্ঞাসা করল, "ওয়েল, মিস্টার ঠ্যাগ, ঠ্যাগিনীটিকে কি এই দেশে সংগ্রহ করবেন, না, দেশে রেখে এসেছেন?"

বিভূতি প্রথমটা বুঝতে পারল না। যখন বুঝল তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, "দেখবেন? এই দেখুন। সর্বক্ষণ বুকে করে রেখেছি।" পকেট থেকে একখানি ফোটো বার করে বিভূতি দে সরকারের চোখের সামনে ধরল। একটি অতি রুগ্না কৃশকায়া তরুণী, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও বাঙালী মেয়ের পক্ষে যারপরনাই ফরসা। টিকল নাক, পাতলা ঠোঁট, ছুঁচল চিবুক, কাতর চাউনি।

দে সরকার ফস্ করে চারটে পকেট থেকে চারখানি ফোটো বার করে টেবিলের উপর চারখানা তাসের মতো ফেলে দিল। প্রথমটা বিভূতির মুখ থেকে তার মনের ভাব অধ্যয়ন করল। বিভূতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দে সরকার বলল, "ইস্কাবনের বিবি, চিড়িতনের বিবি, হরতনের বিবি, রুহিতনের বিবি। বলুন দেখি এরা আমার কে হয়?"

বিভূতি স্থধীর দিকে চাইল। স্থধী মুচকে হাসছিল। দে সরকার ফোটোগুলো গুটিয়ে যথাস্থানে ন্যস্ত করল। তারপর বলল, "অসময়ে এলেন যে? ইংলণ্ডে যারা পড়তে আসে তারা অক্টোবরের আগে আসে।"

বিভূতির এবার মুখ ফুটল। সে ফস্ করে বলল, "আসছে আগস্টে আই সি-এস্ দেব।"

দে সরকার বলল, "বয়স আছে তো?"

বিভূতি সখেদে বলল, "একবার দেবার বয়স আছে, দুবার দেবার নেই। কী করি বলুন, শ্বশুর মশাই পাঠাতে চান না, তাঁর ঐ একটি মেয়ে কিনা—"

"বুঝেছি। পাছে বিধবা হয়!"

"ছি। আপনি যা তা বলবেন না। আমার ছেলে দুটি—"

"ইতিমধ্যেই? ভালো করেছেন, মশাই। বেশ করেছেন। বিদেশে এসে স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু কিছু খেয়েছেন টেয়েছেন? না? দেশী খাবার পছন্দ করেন তো রাঁধতে লেগে যাই।"

বিভূতির মুখভাব থেকে মনে হল তার বিলম্ব সইবে না। অগত্যা দে সরকার তাকে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চলল। তাকে এক হাতে ও সুধীকে অন্য হাতে। এ পাড়ার লোক বোহিমিয়ান হোক না হোক বোহিমিয়ানের কদর বোঝে। তিনটি কালো মানুষ দল বেঁধে চলেছে, দুজনের বগলে একজনের দুই হাত ভরা, কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না। একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় তিনজনে টুমাটোর সঙ্গে Spaghettiর ফরমাস দিল।

৭

দে সরকারের কোথায় যেন এন্‌গেজমেন্ট ছিল। সে সুধীকে ও বিভূতিকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ছুটি নিল।

সুধী বলল, "বিভূতিবাবু, ক্যাপ্‌টেন গুপ্তরা কেমন আছেন?"

বিভূতি বলল, "শুনছিলুম তিনি বেলুচিস্থান বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আগে খুব মিশতেন। আজকাল কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তবে বাবাকে বড় ভালোবাসেন। দেখা করতে গেলে দোতলায় ডেকে পাঠান। বলেন, খবর কী শ্যামাচরণ, তোমার নাতিরা কেমন

আছে? বাবা বলেন, ছেলেটিকে এবার বিলেত পাঠাচ্ছেন তার শ্বশুর। আমার সাধ্য কী বলুন, যে আপনাদের সঙ্গে পাল্লা দিই। যদি একখানা চিঠি লেখেন আপনার জামাইকে—! গুপ্ত সাহেব বলেন, দুঃখের কথা কেন বল, ভাই। মেয়ে কিংবা জামাই কেউ আমার খোঁজ নেয় না। King Lear-এর মতো সবাই আমাকে ছেড়েছে।···বাবার চোখে জল এল তাঁর দশা দেখে।"

সুধী উজ্জয়িনীর সংবাদ জানতে চাইল।

বিভূতি বলল, "ওটা একটা পাগলী। ওর বিয়ের আগে প্রায়ই দেখা যেত ধোপাদের একটা ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। অবিশ্যি সে ছেলেটাও ভদ্রলোকের ছেলের মতো স্মার্ট। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, তোর নাম কী রে? ও বলবে, মাই নেম ইস শ্রীহারাধন রজক। হা হা হা। ব্যাটা একদিন করেছে কী আমার ছোট ভাই কান্তির একটা শার্ট গায়ে দিয়ে টেরি কেটে এসেন্স মেখে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আট কী দশ তার বয়স, তবু চাল দেয় যেন বিলেতফেরতের মতো। আমি বললুম, দাঁড়া, আমি বিলেত থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরি। ব্যাটাকে Reformatoryতে পাঠাব। হা হা হা। আপনি স্মোক করেন না? ধন্য। আমি, মশাই, ঐ ধোপার ছেলের মুখে সিগরেট দেখে অবধি স্মোক করা ছেড়ে দিয়েছি।"

উজ্জয়িনীর পাটনা প্রয়াণের সংবাদ দিয়ে বিভূতি বলল, "আশ্চর্য হবেন, মশাই, শুনে। হাসতে হাসতে শ্বশুরবাড়ী গেল। আর দেখতেন যদি গুপ্ত সাহেবের চেহারা! কী বলে—ইসের মতো! না, মনে পড়ছে না কিসের মতো।"

হেসে উঠে বিভূতি বক্তব্যের জের টেনে চলল। "আর সেই ছোঁড়াটা, যে বলত আই য়্যাম এ ওয়াশারম্যান, সার্, সেও গেছল

স্টেশনে। তার যা কান্না! কিন্তু কাঁদবার সময়ও চাল দিতে ছাড়ে না। বলে, ফরগেট মি নট্। খুকী বাবা, ফরগেট মি নট্।"

সুধী বলল, "সে এখন কী করে?"

বিভূতি বলল, "যার যা স্বভাব। তেমনি টেরি কাটে, সিগরেট খায়, গাধাগুলোকে পিটাতে পিটাতে মাঠ থেকে বাড়ী নিয়ে যায়। Reformatoryতে না গেলে শোধরাবে না। ইংরেজী যা শিখেছিল বেবাক ভুল বকছে। মাই নেম ইস্ ওয়াশারম্যান, সার্। কখনো কখনো বলে, ওয়াশারওম্যান, সার্। হা হা হা। কে নাকি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, ম্যান নয়, ওম্যান। মধ্যে মধ্যে বলে, আই য়্যাম এ ডাঙ্কি—আমার একটি গাধা আছে।"

সুধী এই সরল মানুষটির প্রাণ-খোলা কথাবার্তায় বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ করছিল। কিন্তু যা জানতে চাচ্ছিল তা শুনতে পাচ্ছিল না। উজ্জয়িনী কেমন আছে? খুব ভজন পূজন করছে নাকি? পার্থিব ব্যাপারে একান্ত উদাসীন? চিঠির উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করে না? কিন্তু বিভূতি ওদিক দিয়ে যায়ই না। ধোপার ছেলের গল্প শেষ করে সে তার নিজের ছেলের গল্প শুরু করেছে। "বড়টির বয়স সবে তিন বছর। এরি মধ্যে ইংরেজী বলতে পারে, মশাই! দেখবেন ও বড় হলে আই-সি-এস্ হবেই। ছোটটা শয়তান। কথা বলতে পারে না। কিন্তু ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে, হাতে ছোবল মারে। বড় হলে স্যাণ্ডহার্স্টে ঢুকে সৈনিক হবে, দেখবেন। আমি এসেছি, সমস্ত খোঁজ খবর না নিয়ে ফিরছিনে।"

এমন সময় বিভূতির একটি জাহাজী বন্ধু এসে সুধীকে অব্যাহতি দিল। সুধী বলল, "আজ তবে উঠি, বিভূতিবাবু। আমার ঠিকানা

তো জানেন, কখনো দরকার হলে ফোন করবেন। দে সরকার রইল, কোনো অসুবিধা হবে না। নমস্কার। গুড বাই মিস্টার—"

"ডোঙ্গরে।" (মারাঠা যুবক।)

উজ্জয়িনীকে সুধী সেই রাত্রেই চিঠি লিখল। বাদল যে হারিয়ে গেছে সে কথা প্রকাশ করল না, কিন্তু মিথ্যা কুশলসংবাদও দিল না। চিঠিতে থাকল শুধু উজ্জয়িনীরই কথা। সে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অংশ সুধীকে কেন দেয় না! তার আভ্যন্তরীণ বিকাশ সম্বন্ধে সুধী সশ্রদ্ধ ও সুকৌতূহলী। তার বাবার সঙ্গে তার মতবিরোধ যেন তাকে নির্মম ও রূঢ় করে না, যুক্তি-মাধুর্যের দ্বারা উক্ত বিরোধ ভঞ্জন করা বিধেয়। সুধী জানতে পেরেছে তিনি অতি মর্মাহতভাবে দিন যাপন করছেন। মতবিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুতা সম্ভব তার সাক্ষী সুধী ও বাদল। অল্পবয়স্কদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে অধিকবয়স্করা সেটাকে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞান করে ভগ্ন-হৃদয় হন। অতএব মত ভিন্ন হলেও তার সঙ্গে বিনয়, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা সংযুক্ত করতে হয়। মতবিরোধ পথবিরোধ উপলব্ধিবিরোধ সত্য। সত্যকে প্রিয় করা আমাদের কর্তব্য। নতুবা চরম অকল্যাণ যে প্রিয়-বিরোধ তাই ঘটে।

৮

ব্যাঙ্কের ঠিকানায় বাদলকে চিঠি লেখবার তিন দিন পরে সুধীর অবর্তমানে সুজেৎ টেলিফোন ধরল। বাদল বলল, "কোনখান থেকে কথা বলছি জিজ্ঞাসা করো না, প্রত্যেক বুধবারে টাইমস্ কাগজের Personal স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

সুধী বুধবার অবধি উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করল। বাদলের

এক লাইন বিজ্ঞাপন। "BADAL TO SUDHIDA.—ALL'S WELL.

দেশে চিঠি লেখবার সময় ঐটুকু খবর সুধীর কাজে লাগল। বাদল কোথায় আছে সেটা সুধী চেপে গেল। কেমন আছে সেইটে জানাল। বাদল যে কেন তাকে চিঠি লিখে জবাব দিল না এর কারণ অনুধাবন করতে সুধীর বিলম্ব হল না, পাছে চিঠির পোস্ট মার্ক থেকে তার ঠিকানা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু কেন এ সতর্কতা? ছেলেমানুষী—বাদলটা চিরকাল ছেলেমানুষ। সুধীর সঙ্গে এই বয়সে লুকোচুরি খেলতে চায়। সুধীর আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের লোক ঐ তামাশার মর্ম বুঝবে না। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করবে, কোথায় আছে সে! তার সঙ্গে দেখাশুনা হয় কি না! দেখা হলে কী বলে! তার পড়াশুনা কেমন চলছে ইত্যাদি। মহিম, যোগানন্দ, উজ্জয়িনী তিন জন মানুষ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছেন, সুধীর চিঠির দূরবীন দিয়ে তার গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন, সুধীর চিঠির যা কিছু মূল্য তা বাদলের খাতিরে। "বাদল ভালো আছে"—কেবলমাত্র এইটুকু শুনে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। মহিমচন্দ্র জানতে চাইবেন কোন কোন সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ হল, যোগানন্দ জানতে চাইবেন তার চিন্তার হাওয়া কোন দিকে বইছে, উজ্জয়িনী জানতে চাইবে সে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে নতুন কিছু বলে কিনা। বাদল তাঁদের সম্বন্ধে যেমন উদাসীন তাঁরাও বাদল সম্বন্ধে তেমনি সপ্রতীক্ষ।

যা হোক বাদল যখন অজ্ঞাতবাস করতে দৃঢ়সংকল্প তখন সুধী তার সহায়তা করতে বন্ধুতার খাতিরে বাধ্য। তার খোঁজ করে তার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করা সুধীর পক্ষে পীড়াকর। সুধী বাদলকে লিখল,

"আচ্ছা। কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে কুশলবার্তা চাই।" বাদল এর উত্তরে বিজ্ঞাপন দিল, "SUDHIDA—I AM ALL RIGHT."

সুধী কিংবা বাদল কারুর খেয়াল ছিল না যে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন অন্য কারুর চোখে পড়তে পারে। তারা কেমন করে জানবে যে যোগানন্দ ইতিমধ্যে Quettaয় বদলি হয়েছেন ও সেখানকার ক্লাবে টাইম্‌স্ কাগজের দৈনিক সংস্করণ নিয়ে থাকে? কিন্তু সে কথা যথাসময়ে।

বাদলের যাতে ধ্যানভঙ্গ না হয় তাই সুধীর লক্ষ্য। বাদলের আত্মীয়দেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুৎসুক রাখবার ভার সুধী নিল। লিখল, "বাদল ভালোই আছে। চোখে দেখা না পেলেও লেখায় দেখা পাই।"

এদিকে দে সরকার বিজ্ঞাপনটা পড়ে বিভূতিকে দেখিয়েছে। দুজনেই সুধীকে চেপে ধরল। দে সরকার বলল, "Ariel to Miranda : Take…। কী হে ব্যাপার কী? খবরের কাগজে তো তারাই বিজ্ঞাপন দেয় জানি যারা ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে কিংবা যাদের চিঠি পরের হাতে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যথা অল্পবয়সী আইবুড় মেয়েকে লেখা চিঠি তার মায়ের হাতে।"

বিভূতি বলল, "আই সে চাকরবাটী, হোয়াট্‌স্ দ' ম্যাটার?" এই কদিনে বিভূতি দে সরকারের নকল করতে করতে দারুণ স্মার্ট হয়েছে। ধার করে ম্যানার্স পেয়েছে, ধার করে পেটেণ্ট লেদারের জুতো থেকে আরম্ভ করে বোলার হ্যাট পর্যন্ত কিনেছে। নিজের এক ডজন ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে দেশে রপ্তানি করতে যাচ্ছে।

সুধী খুলে বলল না। বলল, "ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে সপ্তাহে একবার কুশল সংবাদ জানাবে।"

দে সরকার মাথা হেলিয়ে ভঙ্গী বিস্তার করে বলল, "বুঝেছি। পোস্ট কার্ড লিখলে এক পেনি খরচ হয়, ওটা আমাদের মতো গরীব ছাত্রদের জন্য। টাকা আছে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো চাই তো।"

বিভূতি বলল, "হায়! আমার যদি টাকা থাকত আমি দিনে একবার cable করতুম।"

দে সরকার তার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, "বল ও টাকা যদি আমার হত। ও টাকার উপর বাদলের কী অধিকার আছে? কমিউনিস্‌ম্ চাই।"

বিভূতি অমনি বলল, "কমিউনিস্‌ম্ চাই। গিভ্ মি কমিউনিস্‌ম্ অর গিভ্ মি ডেথ্।"

দে সরকার স্বর নামিয়ে বলল, "চুপ চুপ চুপ। ও ঘরে স্পাই আছে। ঐ যে আহ্লাদী মেয়েটা—"

বিভূতি তোৎলাতে তোৎলাতে বসে পড়ল। তার কালো মুখ কালি হয়ে গেল। আহ্লাদীর সঙ্গে যে সে আজ সিনেমায় যাবে ঠিক হয়ে গেছে।

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটও জিজ্ঞাসা করছিলেন, "সুধী, তোমার বন্ধুর খোঁজ পেলে?"

"না, আণ্ট এলেনর। সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ভালো আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কী ভাবছে, কবে দেখা হবে, কেন আত্মগোপন করেছে—কিছু জানায় নি।"

আণ্ট এলেনর কিছুমাত্র সংকোচ না বোধ করে বললেন, "এই ব্যাপারের পিছনে কোনো গার্ল নেই তো?"

সুধী মৃদু হেসে বলল, "না। আমার বন্ধুকে আমি ভালো করেই চিনি।"

বাদলের জীবনকাহিনী, তার সাধনমার্গ, তার অসাধারণ মনীষা ও একাগ্র সংকল্প বক্তা ও শ্রোত্রী উভয়কে প্রীতি দিল। আণ্ট এলেনর আবেগের সঙ্গে বললেন, "আমি যদি তোমাদের দুজনের মা হয়ে থাকতুম।" তাঁর বাগ্‌দানের আংটি এক মুহূর্তের জন্যে ঝকমক করে উঠল।

বাদলের গল্প শেষ করে সুধী পাড়ল উজ্জয়িনীর গল্প। সে উজ্জয়িনীকে চাক্ষুষ না চিনলেও আন্তরিক চিনত। প্রতিদিন উজ্জয়িনীর কথা চিন্তা করতে করতে তার চিঠিপত্রের কাঠামোকে ঘিরে সুধী নির্মাণ করেছিল একটি সজীব প্রতিমূর্তি। লোকে তার যে পরিচয় পেয়েছে সেই তার একমাত্র পরিচয় না হলেও সেও তার সত্য পরিচয়। তাতে যদি কিছু বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটুকু সুধীর নিজের স্বভাব কিংবা বয়স থেকে লব্ধ। সাক্ষাৎকার সেই বাহুল্যের প্রতিষেধক কিংবা প্রতিকার নয়।

উজ্জয়িনীর সমস্যা আণ্ট এলেনরকে বিচলিত করল। তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "Men must work and women must weep."

৯

মে মাস এল। মে মাসের মায়ামন্ত্র সুধীকে সব ভোলাল। আকাশ মেঘবর্জিত অনাবৃত গাঢ় নীল। দৃষ্টি সেই গভীর সরোবরে ডুব দিয়ে তলিয়ে গিয়ে আরাম পায়, সাঁতার দিয়ে কূল পায় না, স্নান করে উঠে যাই দেখে তাই সুন্দর। ঘাসের সবুজ মখমলকে পটভূমি করে ফুলের আলপনা আঁকা। মরি মরি কত নক্‌শা, কত রঙ, কত আকার, কত প্রকার! টুলিপ ডাফোডিল প্রিমরোজ ব্লুবেল হায়াসিন্থ সুইট পী স্ন্যাপড্রাগন ড্যাণ্ডিলায়ন মারগেরিট ডেসি—একশ নাম, হাজার নাম, একশ রূপ,

হাজার রূপ। কেউ আপনা হতেই গজায়, কারুর আবাদ করতে হয়। কিন্তু সকলেই অমূল্য, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। সুধী বিস্মিত হয়ে ভাবে, আকাশের রামধনু কি টুকরা টুকরা হয়ে মিহি গুঁড়া হয়ে বাতাসে উড়ে এসে মাটিতে ছড়িয়ে গেল? প্রতিদিন সূর্যের সাতরঙা আলো বৃষ্টির জলের মতো মৃত্তিকা ভেদ করে পাতালে হারিয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে উৎসের মতো উত্থিত হয়ে ভূমিপটে চারিয়ে গেল। আলোর রঙ ভেঙে ও জুড়ে ফুলের রঙ; আলোর রূপের আদল আলোর ছেলে ফুলের মুখে, ফুলের স্বভাবে আলোর মৌন চঞ্চল স্বভাব।

গরম বোধ হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে বলে এদানীং সুধী টিউবে চড়া ছেড়ে দিয়েছে। সময় যত লাগে লাগুক বাস্-এর মাথায় বসে দু ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে আসা যাওয়া করে। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়, দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থাকে। নানা দিগ্দেশাগত পাখীর সাময়িক নীড় নির্মাণের ব্যস্ততা তাকে আমোদ দেয়। তাদের একো জনের একো রকম রঙ্গ তাকে মুগ্ধ করে। তাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বর শুনে সে আশ্চর্য হয়ে ভাবে, একটি অদৃশ্য অর্গ্যানের সুর কি এগুলি, কার আঙুলের স্পর্শ এদের খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, সন্ধ্যার আগে থামতে দেবে না! নাইটিঙ্গেলের গান শোনবার জন্যে সুধী লণ্ডন ছেড়ে দিন কয়েকের জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাবে স্থির করেছে। ওরা নিস্তব্ধ রাত্রি ও নির্জন পল্লী না হলে গান করে না। লার্কের ও থ্রাসের গান শুনবে বলে সুধী ভোরে ওঠে। হ্যামস্টেড হীথ কিংবা কেনউড্-এ গেলে তার মনে হয় পাখীদের দেশে এসে পৌঁছেছে। মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর নেই তাদের, তারা গলা ছেড়ে তান ধরেছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, কখনো ঘাসের উপর পায়চারি করছে, কখনো গাছের আগডালে দুই পা জোড়া অবস্থায় চুপটি করে বসে নিচের দিকে তাকাচ্ছে আর মাথা নাড়ছে। সুধী যতক্ষণ তাদের সঙ্গ পাচ্ছে

ততক্ষণ যেন কী একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করল কিংবা নূতন রাজ্যে পদার্পণ করল এইরূপ বোধ করে উৎফুল্ল হয়।

শাখায় শাখায় অগুনতি মুকুল, চেরীর শাখায় পেয়ারের শাখায় মে-গাছের শাখায়। শীতের দিনের শাদা বরফের কুচি যেন গলে যাবার সুযোগ পায় নি, দানা বেঁধে বোঁটায় বোঁটায় আটকে রয়েছে। ওক পাইন ফার বীচ বার্চ ইত্যাদি বনস্পতির সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সুধী যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। মানুষের চেয়ে এদের আয়ু, এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ, এদের প্রাণ ও এদের ধৈর্য কত বেশী! আহারের জন্যে ছুটাছুটি করে চোখে আঁধার দেখাটা কিছু নয়, পরকে মেরে নিজের পথ্য করা তো বর্বরতা। দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ উদ্বেগে আন্দোলিত সুখে শফরীর মতো ফরফরায়িত, অধিকাংশ মানুষের জীবন তো এই। এই সমস্ত বনস্পতি তাদের তুলনায় সব দিক দিয়ে বৃহৎ। সুধীর মনে হয় এভল্যুশন থিওরীর দ্বারা জীবসৃষ্টির কিনারা হয় না। সুধী ভাবে মানুষ বানর বিড়াল বাঘ কোকিল কাক তাল তমাল সকলেই সৃষ্টির আদিতে ছিল, আদি থেকে আছে, অবসান পর্যন্ত থাকবে—অবশ্য আদি ও অবসান কেবল কথার কথা, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তার মতো সৃষ্টিও অনাদ্যন্ত। মানুষের রূপের এভল্যুশন সুধী মানে, মানুষ যুগে যুগে বিভিন্নরূপী। কিন্তু অ-মানুষ বা অবমানুষ থেকে মানুষ? অসম্ভব।

মে মাস এল। সুধী তার পড়াশুনা কমিয়ে দিল। এমন দিনে ঘরে বন্ধ থাকা মূর্খতা। সুধী মিউজিয়াম থেকে সকাল সকাল ফেরে, সকাল সকাল খেয়ে মর্সেলকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে বেরয়। তার বাসার অনতিদূরে মস্ত খোলা মাঠ। মাঠ বেয়ে দুজনে অনেক দূর হাঁটে। যেদিন সুধী একলা বেরয় সেদিন হাঁটতে হাঁটতে গোল্ডার্স গ্রীনের উত্তরাংশ ছাড়িয়ে হাইগেট অবধি চলে যায়। ফেরবার সময় বাস্‌-এ

করে হ্যাম্পস্টেড হীথ চিরে স্প্যানিয়ার্ডস্ রোড বেয়ে গোল্ডার্স গ্রীন স্টেশনে বাস বাদল করে বাসায় ফিরে আসে। এক একটি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা যাপন করে তার যে আনন্দ ও মুক্তি, তাকে বাদল কিংবা উজ্জয়িনীর হাতে চিঠির পাতায় পৌঁছে দিতে পারলে তাকে দ্বিগুণ উপভোগ করত, কিন্তু একজন নিরুদ্দেশ, অপরজন নীরব। হাতের কাছে আছে মার্সেল। ভাবনার ভাগ তাকে দেওয়া চলে না, সেদিক থেকে তার বয়স অল্প, কিন্তু সূর্যাস্তকালীন আভা যখন ঘন সবুজ ঘাসের উপর শেষবার তুলি বুলিয়ে যায় তখন সুধীর চিত্তে যে ভাব জাগে মার্সেলকে সহজেই সেই ভাবের ভাগী করা যায়। উদার উন্মুক্ত আকাশের নিঃসীম নীলিমা উভয়ের দৃষ্টিকে হাতছানি দেয়; উভয়ের বাহু হঠাৎ ডানা হয়ে ওঠবার তাড়না অনুভব করে, উড়ে যাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ও সেই প্রয়াসের নিশ্চিত নিষ্ফলতা উভয়ের অন্তরকে অবমর্দিত করতে থাকে। মার্সেল মুখ ফুটে বলে, "দাদা, ঐ দেখ, ওরা কেমন উড়ে যাচ্ছে।" সুধী বলে, "তোর বুঝি উড়তে ইচ্ছা করছে রে, মার্সেল?" মার্সেল উত্তর দেয় না, সোয়ালো বলাকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

বৃষ্টি কদাচ হয়। ইংলণ্ডের বৃষ্টির যা স্বভাব, হুড়মুড় করে হাজির হয় বিনা খবরেই। মাঠের মধ্যখানে বৃষ্টি নামে। সুধী ও মার্সেল দৌড়াদৌড়ি করে ভিজতে ভিজতে গাছতলায় আশ্রয় নেয়। একদিন এক পথিক মোটরকারে দয়া করে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল। তবু তাদের শিক্ষা হয় না, তারা ছাতা না নিয়ে বেরয়। যখন বেরয় তখন তাদের কি কোনো খেয়াল থাকে? শুনতে পেয়েছে কুকু-পাখীর ডাক। মার্সেল বায়না ধরেছে, "দাদা, চল আমরা কুকু দেখতে যাই।" সুধী বলে, "আচ্ছা। আগে তোর খাওয়া শেষ হোক।" মার্সেলকে একবার নিয়ে চললে ফিরিয়ে আনা শক্ত। সে কুকু দেখতে হয়তো দেখল

কাদের কুকুর কিংবা দেখল তার চেয়ে বয়সে কিছু বড় কতকগুলি ছেলে একটা খালের মধ্যে নেমে বাঁধ দেবার উদ্যোগ করছে, অমনি তার চোখ আটকে গেল, চোখের ব্রেক কষা হলে পায়ের গতিরোধ।

মে মাসের মায়াজালে বাঁধা পড়ে আণ্ট এলেনর ও ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইটকেও সুধী ভুলল। তা বলে তাঁরা তাকে ভুললেন না। কিন্তু তাকে ক্রমাগত অন্যমনস্ক লক্ষ করে ঘন ঘন স্মরণ করলেন না। আর্থারকে এলেনর বলছিলেন, "ওর বন্ধুটি নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে।" এলেনরকে আর্থার বলছিলেন, "তা হলে ওকে ও দুঃখ ভোলবার নিরিবিলি দাও।" সুধীর কাছে ওঁরা কোনোদিন বাদলের কথা পাড়েন না। ওকে পরিচিত করে দেবার জন্যে পার্টিতে নিয়ে যাওয়া কিংবা পার্টি দেওয়া আণ্ট এলেনর থামিয়ে দিলেন। তবে প্রতি রবিবারে তাকে চায়ে ডাকেন। তখন তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তাঁর মন উস্‌খুস্‌ করে, কিন্তু জিভ জড়িয়ে যায়। তিনি আশা করেন হয়তো সুধী নিজেই কথাটা পাড়বে। কিন্তু সুধী সম্প্রতি নক্ষত্রবীক্ষণে বিভোর আছে। সন্ধ্যা হলে কোন তারা কোন দিকে উঠবে সেই তার আপরাহ্নিক ধ্যান। ইংলণ্ডের নৈশ আকাশ এতকাল প্রায়ই মেঘগুণ্ঠিত থাকত। সেই রহস্যময়ী আবরণ উন্মোচন করেছে। তার চোখের তারার সঙ্গে নিজের চোখের তারা মিলিয়ে সুধী কী যে বিস্ময় বোধ করছে, চিরন্তনকে নূতন করে চিনতে পারবার বিস্ময়। দেশ পরের হতে পারে, কিন্তু আকাশ তো সেই আকাশ, সুধীর আশৈশবের তারকাচিহ্নিত নভোমণ্ডল। সে যখন পুরাতন নক্ষত্র-বন্ধুদের পরিচয় নিতে নিতে আনন্দে আপ্লুত হয় তখন তার মনে থাকে না যে সে ইংলণ্ডের মাটিতে বসে আছে। নক্ষত্র-বন্ধুরা তাকে মনে করিয়ে দেয়, সে গণনাকল্পনাতীত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী, ভারতবর্ষ তার ঘর, পৃথিবী তার পাড়া। মন তার

কাল-পারাবারের পার পায় না। এক একটি নক্ষত্রের আয়ু যদি অমেয় হয়, যদি এক একটি রশ্মির ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসকে লজ্জা দেয়, তবে আমাদের যাঁহা জীবন তাঁহা মৃত্যু, বাহান্ন আর তিপান্ন। এই জীবন নিয়ে এত ভাবনা! সুধী মাঠের হাওয়া প্রাণ ভরে সেবন করে, ঘ্রাণ ভরে শোষণ করে। আকাশের আলো অন্ধকার দুই চক্ষু ভরে লুট করে নেয়। সে আছে বিশ্বের মধ্যে, বিশ্ব আসুক তার মধ্যে, বিশ্ব হোক তার অধিবাসী। চিরন্তনকে সে স্বীকার করলে চিরন্তন করবে তাকে স্বীকার।

এতদিন রাত্রের মেঘাস্তরণ প্রায়ই সুধীর দৃষ্টিকে ঠুলি পরিয়ে রাখত। দিনের ধূমগুণ্ঠিত মুখ দেখতে পারত না বলে সুধী গ্রন্থ খুলে মনোজগতের রূপ দেখত। যে মাস এসেছে, তাপহীন রৌদ্র দীর্ঘদিনব্যাপী, বায়ু পুষ্পগন্ধমধুর বিহঙ্গগীতিমন্থর, রাত্রি শান্ত গম্ভীর দূরাতিদূর। সুধী আজকাল বাগানের দোলনায় ঘুমায়, দুটো গাছের শাখায় দোলনা খাটিয়ে।

১০

দেশ থেকে যেদিন চিঠি আসে, অর্থাৎ শনিবারের রাত্রে, সুধী পিয়নের পদশব্দ গোণে। আশ্চর্যের বিষয় কয়েক সপ্তাহ থেকে বাদলের বাবার চিঠি বন্ধ। বাদলের শ্বশুরের চিঠি তো মার্চের পরে আসেনি, যদিও সুধী প্রত্যেক বার ভেবেছে এইবার আসবে। চিঠি আসুক বা না আসুক চিঠির জবাব দিতে সুধীর কসুর হয়নি, কিন্তু এইবার হল। বাদলের খবর তাঁরা জানতে উদ্গ্রীব ছিলেন, এতদিনে বোধ করি বাদলের বিদায়স্মৃতি তাঁদের মনে ম্লান হয়ে এসেছে কিংবা ম্লান হয়েছে বহুদিন, শুধু অভ্যাসের জের চলছিল। সুধীর দিক থেকেও ওটা ছিল কতক

কর্তব্যবোধ কতক অভ্যাস। এক সপ্তাহ কাজে ফাঁকি দিয়ে সুধী দেখল এই ভালো। চিঠি পেলে চিঠির উত্তর লিখব। ওঁরা যে আমার চিঠির প্রত্যাশা করছেন তার প্রমাণ তো আগে পাই।

দিন কয়েক বাদে সুধীর নামে এল এক cable, যোগানন্দ পাঠিয়েছেন কোয়েটা থেকে। "Where is Badal ? Why Times advertisement ?"

সুধী এর কী জবাব দেবে চিন্তা করে স্থির করতে পারল না। অথচ টেলিগ্রামের উত্তর টেলিগ্রামে না দিলে যোগানন্দের প্রতীক্ষা পীড়াবহ হবে। বাদলটা যে মানুষকে এমন বিপদে ফেলবে কে জানত! সুধী বাদলের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাদের ঠিকানা জানত সবাইকে ফোন করল, বাড়ীতে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করল। মিসেস উইল্‌স্ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সুধীকে প্রার্থনা করলেন বাদলের সংবাদ পেলে জানাতে। কলিন্স্ বলল, "ওর জন্যে একখানা নতুন বই আনিয়ে রেখেছি, ও এসে নিয়ে যায় না কেন তাই দিন কয়েক থেকে ভাবছি।" মিলফোর্ড বললেন, "ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবার পর থেকে ওর খবর রাখিনি। ওকে আমার আফসোস জানাবেন।" মিথিলেশকুমারী বললেন, "কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেনি তো ?"

অগত্যা সুধী যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা একখানা খামে ভর্তি করে বাদলের ব্যাঙ্কের ঠিকানায় রওনা করে দিল। এবং যোগানন্দকে তার করল, "Badal's private address unknown. Making enquiries."

ওর চেয়ে ভালো কিছু বলা যায় না। যাই বলুক সন্দেহ তাঁর মনে জন্মাবেই। সন্দেহ জন্মাক ক্ষতি নেই, আশঙ্কা দূর হলে হল। আণ্ট এলেনরের মতো যোগানন্দও বোধ হয় ভাববেন নারীঘটিত কোনো রহস্য

আছে। কিন্তু বিদেশে ছেলে পাঠিয়ে কোন গুরুজন ও-বিষয়ে নিঃসংশয়! কিন্তু এমন আশঙ্কা মনে স্থান দেবেন না যে বাদল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

যোগানন্দ টাইম্‌স্‌ পড়ে চুপ করে বসে থাকেননি, নিশ্চয় মহিমচন্দ্রকে তার করেছেন কিংবা চিঠি লিখেছেন। উজ্জয়িনী এ ব্যাপার জানতে পেরেছে। সুধীর চিঠির সঙ্গে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন মিলিয়ে পড়লে তাঁরা চিঠিকে অবিশ্বাস করবেন ও বিজ্ঞাপনের নানা অর্থ করবেন। দিন দুই তিন পরে তাঁদের cable উপস্থিত হবে। ততদিনে যদি বাদল যোগানন্দের প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে সুধী রক্ষা পায়, নতুবা কৈফিয়ৎ দিতে হবে সুধীকেই।

বাদল যে লণ্ডনেই আছে এ সম্বন্ধে সুধীর সন্দেহ ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ক'দিন লুকোচুরি খেলতে পারবে, দেখা না করে, কথা না বলে, তর্কে না জিতে ঘরে খিল দিয়ে থাকবে? পাগলা, কী একটা খেয়াল চেপেছে মাথায়, তার দুর্ভোগ গিয়ে পৌঁছচ্ছে বেলুচিস্থানে ও বিহারে। একজন মানুষ ইচ্ছা করলে কজন মানুষকে কষ্ট দিতে পারে এই বুঝি বাদল পরীক্ষা করছে?

বাদল বিজ্ঞাপন দিল, "BADAL TO CAPTAIN GUPTA. —CONCENTRATING ON GREAT THOUGHTS IN SECRET RETREAT."

সুধী বাদলকে মনে মনে বলল, "সারাজীবন তো নিভৃত চিন্তা করে আসছিস, কেই বা তোকে বিক্ষিপ্ত করেছে! বাড়ীতে তোর পড়ার ঘর গিরিগুহার মতো বিজন ছিল। এদেশে এসে প্রথমটা হৈ হৈ করে বেড়ালি, এখন প্রতিক্রিয়াবশত কোন গৃহকক্ষে বসে আগুন পোহাচ্ছিস, এই মে মাসে!"

বাদলকে সুধী চিনত। ওর যা জেদ তা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখবে। ওর যা খেয়াল তা আপনা থেকে না ছুটলে পরের পরামর্শে ফুলতে থাকবে—বাঁধ দিলে পাগলাঝোরার জলের মতো। দিন পনের পরে হয়তো টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করে উঠবে কিংবা দরজার বেল ক্রিং ক্রিং ধ্বনি করবে, বাদল ঘরে ঢুকে পায়চারি করতে করতে পরিক্রমা করতে করতে বলবে, "কী বলছিলুম? সুধীদা, কী বলছিলুম?"

সেই বাদল! দু'মাস তার সঙ্গে দেখা হয়নি। এক শহরে থেকেও তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ নেই, চিঠি লিখলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় দু'লাইন। দুঃখের কথা কাকে জানাবে! সুধী স্বভাবত চাপা। মনের দুঃখ মনে চাপল। আকাশের দিকে চেয়ে ভুলে গেল। দিনের পর দিন বর্ষণবিহীন, নীলোজ্জ্বল, দিগন্তপ্রসারী। দৃষ্টি যত গভীরে নামতে পারে তত গভীর। সুধী কখনো আশা করতে পারেনি, ভাবতে পারেনি, এমন আশ্চর্য ঋতুপরিবর্তন ঘটবে! ঋতু আসে আর যায় কিন্তু টিপ টিপ বৃষ্টির বিরাম হয় না। এই তো লোকে বলত ও সুধী জানত।

দিনগুলি এত রঙিন এত সুগন্ধি এত উজ্জ্বল এত পূর্ণ। সুধী আহারকাল ভুলে যায়। কয়েকবার অপদস্থ হবার পর মাদামকে বলল, "আমার জন্যে কিছু তৈরি রেখো না, আমি যখন ফিরব তখন নিজে তৈরি করে নেব।" রুটি মাখনের স্যাণ্ডউইচ নিয়ে কোনো কোনো দিন বেরয়, যতক্ষণ ও যতদূর পারে হাঁটে, মাঠে কিংবা হ্রদ বা নদীর ধারে শরীরকে বিশ্রাম ও চক্ষুকে স্বাধীনতা দেয়, তার পরে বাস কিংবা ট্রেন ধরে বাসায় ফেরে। মার্সেলের কাছে গল্প করে, "আজ এতটুকুন একটি পাখী দেখে এসেছি, মার্সেল। ওকে বুঝি Tit বলে।" মার্সেল ঠোঁট ফুলিয়ে চুপ করে থাকে। সুধী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বলে তার অভিমান

হয়েছে। স্থজেৎ তার গালে ঠোনা মেরে মানভঞ্জনের চেষ্টা করে। মার্সেল জানোয়ারের মতো দাঁত খিঁচিয়ে নখ দিয়ে স্থজেতের জামা ছিঁড়ে দেয়, তবু কথাটি বলে না। তখন স্থধী দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করে। আণ্ট এলেনর খবর পেলে তাকে নোবেল পীস্ প্রাইজ পাইয়ে দিতেন। কিন্তু মাদাম তার অদ্ভুত ইংরেজীতে বলে, "ত্যাঙ্ক্ ইউ, মিস্তার সাক্রাবার্তী।"

১১

ঠিকানা লেখার ভুলে চিঠিখানা লণ্ডনের দু'তিনটে পাড়া ঘুরে এসেছে। বুধবারে স্থধীর হস্তগত হল। স্থধী না খুলেই চিনতে পারল উজ্জয়িনীর চিঠি। কী লিখেছে বেচারি উজ্জয়িনী?

লিখেছে,

"স্থধীদাদা,

আপনাকে কতকাল লিখিনি। লিখে কী ফল হত বলুন। আপনারা তো কিছুতেই আমাকে বুঝবেন না। আমার প্রাণ কী যে চায় আমি নিজেই বা তার কতটুকু বুঝি! তবু এক কথায় বলি আমি আমার অবস্থাকে লঙ্ঘন করে অতীতকে অতিক্রম করে দেহমনকে পিছনে ফেলে কোথাও এক জায়গায় পালিয়ে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাই। ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাব, আমার সত্তা থাকবে না, আমার চিহ্ন থাকবে না।"

পাগলের প্রলাপ। না?"

এই পর্যন্ত পড়ে স্থধীর চোখে জল আসে আর কী। দুই বিভিন্ন স্থানে দুটি বিভিন্ন মানুষ, মাঝে সাত হাজার মাইল ব্যবধান—বাদল ও উজ্জয়িনী একই সময়ে একই কথাই ভাবছিল। ওরা সত্যিকারের স্বামী

স্ত্রী। দুজনেই চাইছিল নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে—বাদল তো হয়ে গেলই, এখন উজ্জয়িনী কী করে দেখা যাক।

"পাগলের প্রলাপ। না? আমারও তাই মনে হয়। কাজেই আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা মৌলিক নয়। কিন্তু পাগল মাত্রেই অশ্রদ্ধেয় নয়। এবং চেষ্টা করলে পাগলের প্রলাপেরও অর্থ-বোধ হয়। তারপর পাগলামির দ্বারা এমন অনেক কাজ হাসিল করা যায় ভদ্রতার দ্বারা যা অসাধ্য। এই ধরুন মিসেস স্যামুয়েল্‌সের বিদায়। মিসেস স্যামুয়েল্‌সের পরিচয় দিই। মায়ের বন্ধু, মিশনারী, বিধবা। আমাকে সামাজিকতা শিক্ষা দিতে মায়ের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। ভালো মানুষ, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ একটা ভান নয়। কিন্তু আমার সাধনার বৈরীকে আমি প্রশ্রয় দেব কেন? যা আমার ভালো লাগে না তা আমার ভালোই লাগে না। এই চূড়ান্ত। আমি তর্ক না করে এই কথাটা প্রলাপের মতো করে বুঝিয়ে দিলুম। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বুদ্ধিমতী। আমার সংসারে আমি মালিক, আমার মা নন। তবে যদি তিনি আমার শাশুড়ীর শূন্য স্থান পূর্ণ করতেন তবে সে হত ভয়ানক ভাবনার কথা। আমার শ্বশুর আকারে ইঙ্গিতে অমন প্রস্তাব করেননি তা নয়। কিন্তু মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ একদিন আমাকে স্পষ্টই বলছিলেন, 'বর্ণভেদ বিধাতার হাতে, ভিন্নবর্ণাকে আমি অনাদর করিনে। কিন্তু ধর্মভেদ? মানুষের কেবল একটিমাত্র ত্রাণকর্তা, সুতরাং একটি ধর্ম। God so loved the world that He gave His only Son...'

"মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ যেমন অকস্মাৎ এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন। আমার জীবনে তাঁর কী প্রয়োজন ছিল ভাবছি। বোধ করি আমাকে পরীক্ষা করতে ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। মাঝখান থেকে আমার শ্বশুরের হৃদয়ে আঘাত রেখে গেলেন। প্রথমটা তিনি

এখনি বিলেত যাবেন বলে ক্ষেপেছিলেন। (সেখানে বিয়ে করা কি এতই সোজা ?) ছুটি পাওয়া গেল না। এই সময়টাতে সাহেবরা ফার্লো নেয়, বাঙালীকে ছ'মাসের জন্যে মোটা মোটা গদিগুলো ছেড়ে দেয়। কাজেই শ্বশুর মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট হবার আশ্বাস পেয়ে শীতকালের আশায় দিনপাত করছেন।

"আমরা হয়তো পুরী কিংবা পূর্ণিয়া যাচ্ছি। পাটনা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।"

সুধী বুঝল কার স্মৃতি! বেচারি উজ্জয়িনী—বাদলের উর্মিলা! সুধী পড়তে লাগল।

"ইতিমধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছে। তার নাম করুণা। করুণাকে দেখে সত্যিই করুণা হয়। শুধু তার উপর করুণা হয় তাই নয় নিজের উপর করুণা হওয়া কমে। তার স্বামী থাকেন সমস্ত দিন আপিসে, বাড়ী ফিরেই পাড়ায় হাজিরা দিতে যান, অর্ধেক রাত্রি অবধি তাস খেলা চাই। আবার ভোরে উঠে বেরিয়ে যান বড় দেখে মাছ কিনতে, ওটি না হলে তাঁর চলে না। স্ত্রীকে ভালোবাসেন না এমন নয়। কিন্তু সে ভালোবাসায় কোথাও এতটুকু রঙ নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়তো চব্বিশটি কথা বলেন না স্ত্রীকে ; বলার দরকার বোধ করেন না। রাগ করেন না, হাসেন না, অভিমান করেন না, খুবই ভদ্র। কী যে স্ত্রীর অপরাধ তা তো আমরা অর্থাৎ বীণা আর আমি অনুমান করতে পারলুম না। ভদ্রলোকের নামে কোনো অপবাদ শোনা যায় না। চিরকাল পিতৃমাতৃভক্ত। লেখাপড়ায় ভালো। মা বাবা যেখানে পাত্রী স্থির করলেন সেইখানে বিবাহ করলেন। আপত্তির আভাস পর্যন্ত দিলেন না। মেয়েটি সুশ্রী, সরল, সৎ। শাশুড়ীর নির্দেশ অনুসারে সমস্তক্ষণ খাটে। দেওরদের আবদার অত্যাচার বিনা বাক্যে সয়। একটি ছেলে

হয়েছে, সেটির যত্ন নিতে জানে না, কোনোদিন শিক্ষা পায় নি, সেজন্যে দেওরদের কাছে বকুনি খায়। ছেলে যেন ওদেরই, তার নয়। স্বামীর কাছে নালিশ করে না, করলে কোনো প্রতিকার হত না। শ্বশুর তার পক্ষ নিয়ে দুটো শক্ত কথা বলেন, তাইতেই সে খুশি।

"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা নতুন দিক আমার চোখে পড়েছে। আমরা মেয়েরা স্বভাবত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি আমাদের মনোনয়ন করে ঘরে আনেন। স্বামীর চাইতে শ্বশুরকেই আমরা আপনার বলে জানি। তাই স্বামীবিয়োগে পুনর্বার বিবাহ করিনে। স্বামীর স্নেহ না পেলে শ্বশুরের স্নেহ পেয়ে দুঃখ ভুলি। করুণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই শিক্ষা লাভ করলুম।"

সুধী বুঝল উজ্জয়িনী নিজের দুঃখ ভোলবার এই উপায়টা খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, শ্বশুরের স্নেহ পায়নি বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উজ্জয়িনী তা স্বীকার করেনি। সে বলে,

"এই মিথ্যা সংসার আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। এর ছলনা আমি ভেদ করেছি। এর মধ্যে কাণা কড়ির সত্য নেই, শান্তি নেই। সংসারের নিয়ম কানুন মেনে ঘোরতর সংসারী হয়ে যারা ধন মান পদ-মর্যাদায় বড় হয়েছে তারা মূর্খ। যারা সংসারের প্রশংসা কুড়িয়ে বাহবা পেয়ে ভালো মানুষ হয়েছে তারা মূঢ়। আমি উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে পুড়ে জুড়িয়ে নিবে হারিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। সংসারের বাইরে আমার জীবন কাটি। না জানি কোন নক্ষত্রে আমার বাসা। তাই তো আমি রাত জেগে তারার দিকে চেয়ে থাকি। আমার ঘরের জানালা দিয়ে অনেকখানি আকাশ ঘরে আসে। জানালা খোলা রেখে মেজেতে গড়িয়ে পড়ি।"

ভাগবত উপলব্ধির কথা উজ্জয়িনী উত্থাপন করেনি। বোধ হয় সুধী

পছন্দ করবে না অনুমান করে। বীণার কথাও বিশেষ উল্লেখ করেনি। বোধ হয় সুধী বীণার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলবে ভেবে। বাদলের কথাও জানতে চায়নি। বোধ হয় না-চাওয়াটাই সুধীর মনে লেগে ফলপ্রদ হবে জেনে। শেষে লিখেছে,

"আপনাকে কত কথা জানিয়ে ফেললুম, ফেলে অনুতাপ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে আমার স্বতঃ বিশ্বাস হয়। আমার বড় ভাই নেই। বড় ভাই কেন, কোনো ভাই নেই। আপনাকে ভাই ভেবে আমার খানিকটে ভার নামে।"

১২

বাৎসল্যে সুধীর অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়। আহা, ছোট বোনটি! বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, স্বামীর প্রেম পায়নি, শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। কী যে তাকে নিয়ে করা যায়। দূর থেকে উপদেশ দেওয়া সোজা, এর মতো হও, ওর মতো হও বলতে পারা সুলভ, কিন্তু তার অবস্থায় পড়লে নিজে কী করতুম সেইটে বিবেচনা করতে হয়। উজ্জয়িনীর বয়স সতের আঠার, ও-বয়সে কজন পুরুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, যেখানে ইচ্ছা ভাগ্য পরীক্ষা করে বেড়িয়েছে? ইউরোপেও ওই বয়সের তরুণী মেয়েকে নিরাপদে ও সসম্মানে স্বাবলম্বী হতে সচরাচর দেখা যায় না। সুজেতের মতো যারা দোকানে কাজ করে তাদের উপার্জন এত স্বল্প যে পৈতৃক বাড়ী বা বাসা না থাকলে তারা পথে বসত।

যে নারী ভাগ্যদোষে স্বামী ও শ্বশুরের স্নেহ হারিয়েছে সে নারী পিতামাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। যার সে আশ্রয়ও নেই, আমাদের সমাজ তার কোনো ভদ্র আশ্রয় রাখেনি। বয়স একটু বেশী হলে সে

রাঁধুনিবৃত্তি করে দাসীবৃত্তি করে কোনো ধনী পরিবারে একটুখানি মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেতে পারে; বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যালয়সম্মত হলে চাকরি পাওয়াও সম্ভব, কিন্তু উজ্জয়িনী কোনোটাই পাবে না। না-পাবার সব চেয়ে বড় কারণ সে তার বংশপরিচয় গোপন রাখতে পারবে না। অবশেষে তার বাবা কিংবা তার শ্বশুর তাকে পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে আনবেন।

মহিমচন্দ্রের উপর সুধীর ভরসা ছিল। উজ্জয়িনীর এই পত্র পেয়ে কিছু কমল। এই বয়সে তিনি নূতন করে সংসার পাতবার উদ্যোগ করছেন, সেই ঝঞ্চাটে ছেলেকে কয়েক সপ্তাহ চিঠি লিখতে পারেননি, বাদল শুনলে কী মনে করবে। সুধী লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করছিল। দূর থেকে এই! নিকট থেকে উজ্জয়িনী যা বোধ করেছে তার সমস্তটা জ্ঞাপন করেনি নিশ্চয়। যে বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে সে আবার মানুষ খুঁজতে থাকে। মহিমচন্দ্র মিসেস স্যামুয়েল্‌সের পদ শূন্য রাখবেন না বলে আশঙ্কা হয়। সকলেই কিছু মিসেস স্যামুয়েল্‌সের মতো ভালো হবে না। তা হলে বেচারি উজ্জয়িনীর কী দশা হবে? বৈষ্ণব-জনোচিত সহিষ্ণুতা ও সুনীচতা উজ্জয়িনীর স্বভাবে শিকড় গাড়েনি। সে তেজী মেয়ে। যেটা তার ভালো লাগে না সেটা তার ভালো লাগে না। এই যদি চূড়ান্ত হয় তবে সে হয়তো একটা কাণ্ড করে বসবে। যদি রাগ করে কোথাও চলে টলে যায়—ধর বীণাদের বাড়ীতে—তবে আর কিছু না হোক একটা প্রহসন হবে। যে পাখীর ডানায় জোর নেই কিন্তু প্রাণে আকাশের আকূতি, সে পাখী মাটির উপর ডানা ঝটপট করবে কিছু কাল, তারপর খাঁচায় ঢুকবে, যদি না ইতিমধ্যে বিড়ালের মুখে পড়ে থাকে।

মহিমচন্দ্রকে সুধী চেনে। চিন্তাশীলতা, সৌন্দর্যবোধ, কল্পনাবৃত্তি

তাঁর নেই। আইডিয়ালিস্‌ম্‌ তাঁর স্বভাবে সয় না। হয় আর্থিক নয় পারমার্থিক লাভ ও লোভ তাঁকে অবিশ্রান্ত খাটায়। খাটুনির জোরে লোকটা সরকারী চাকুরেদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। অসাধারণ তাঁর য়্যাম্বিশন। একটা উপাধি পেতে না পেতেই আর একটার জন্যে দেহপাত। বছরে বছরে তাঁর পদোন্নতি হওয়া চাই, নতুবা জীবন বৃথা গেল, গবর্নমেণ্ট তাঁর যোগ্যতার মর্যাদা রাখল না। এক দিক দিয়ে এর ফল ভালো হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেননি। স্ত্রী-জাতির প্রতি দৃক্‌পাত করেননি। কেউ ঘুষ দিতে এলে তিনি ঘুষি পাকিয়ে তাড়া করে গেছেন। পানদোষ থেকে মুক্ত। তবু তাঁর সঙ্গে বাস করা উজ্জয়িনীর পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ হবে। শ্বশুরবাড়ীর মোহ যখন অপগত হবে তখন উজ্জয়িনী তাঁকে পরিহার করতে ইচ্ছা করবে। তারপর যদি সত্যই তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেন তবে সেই ইচ্ছা ব্যাকুলতায় পরিণত হবে। তখন কী উপায়? বাদলটা তো অবুঝ। যোগানন্দকে বোঝানো যায় না।

উজ্জয়িনীর ভাগবত উপলব্ধির উল্লেখ না থাকায় সুধীর আশা হল হয়তো উজ্জয়িনীর প্রাথমিক উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এসেছে, অপরকে অংশ দেবার উৎসাহ অস্তমিত হয়েছে। তা যদি হয় তবে যোগানন্দের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া অল্পায়াসে ঘটবে। যোগানন্দের প্রাথমিক বিস্ময় ও বিরক্তি এতদিনে পুরাতন হয়ে পূর্বের উগ্রতা হারিয়েছে। তিনি হয়তো বাদলের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেকে অপরাধী করছেন। পিতাপুত্রীর সন্ধির পক্ষে এই অবস্থা ও এই মুহূর্ত অনুকূল। সুধী যোগানন্দকে চিঠি লিখল।

লিখল, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন আমরা অতিরিক্ত ভক্তিপ্রবণ হয়ে উঠি। আমাদের পাপবোধ প্রবল

হয়, আমরা নিজেকে নিপীড়ন করে শান্তি পাই, আহার নিদ্রা কমিয়ে দিই, স্নান করে ধ্যান করতে বসি, শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে সর্বত্র আবর্জনা দেখি, আমিষ ছাড়ি, হবিষ্যান্ন খাই, একাদশী করি। অনেকেই আমাদের গুরু হন, অনেকের অজ্ঞাতে আমরা তাঁদের একলব্য হই, বাঁধানো খাতায় বচন উদ্ধার করি, ডায়েরি রাখি, প্রতিদিন সংকল্প করি মহৎ হব, আক্ষেপ করি মহৎ হতে পারছিনে, ভগবানকে প্রার্থনা করি, ধর্মগ্রন্থ পড়ি, অকারণে চোখের জল ফেলি।

উজ্জয়িনীর এখন সেই বয়স। এ বয়সকে আপনি এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। অবস্থা যেই অনুকূল হল বয়োধর্ম অমনি চেপে ধরল। বাদল তার কাছে থাকলে তার ভক্তিবৃত্তি স্বামী অভিমুখে ধাবিত হত। সে স্বামীর পট পূজা করত, স্বামী সেবার নানা ছল খুঁজে স্বামীর পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিত, এমনি আত্মনিগ্রহ করত। বাদল অকালে বিদায় নিল, সকল রকমে বিদায়। স্ত্রীকে সে অস্বীকার করল। দেশকে সে অস্বীকার করল। তার ভাব থেকে মনে হয় বন্ধুকেও সে অস্বীকার করবে। সাতদিনে একদিন তার বিজ্ঞাপন পড়তে পাই। শুধু এইটুকু বার্তা, SUDHIDA—I AM. উজ্জয়িনীর হয়ে তাকে আমি অনেক বলেছি। তার এক কথা, সে কারুর সঙ্গে বাঁধা থাকতে অপারগ। তাতে তার মুক্ত মানসিকতা পীড়া পায়। হয়তো একদিন তার এ পাগলামি সারবে। সৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার না করে মুক্তি কোথায়?

কিন্তু বাদলের জন্যে অপেক্ষা করা উজ্জয়িনীর পক্ষে দুরাশা হবে। সে কেমন করে একথা বুঝতে পেরেছে বলে হরিভক্ত হয়েছে। হাতের কাছে অন্য কোনো ভক্তির উপকরণ পায়নি, উপলক্ষ পায়নি। ইউরোপে থাকলে বোধ করি কুকুরভক্ত হত।

তার এ বয়স চিরস্থায়ী হবে না। কারুর জীবনে হয় না। এর পরবর্তী বয়স সংশয়ের, অশ্রদ্ধার। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই। স্বামী থাকলে স্বামীর উপর দিয়েই শুরু হত। স্বামীর অভাবে দেবতার উপর দিয়ে। উজ্জয়িনী নিজের বানানো মূর্তি নিজের হাতে ভাঙবে। যাদেরকে গুরু করেছে তাদেরকে দূর করে দেবে। এক আতিশয্যের স্থলে আর এক আতিশয্য। তারপরে সংযমের সময় আসবে। কার জীবনে কখন আসে বলা যায় না। কারুর কারুর জীবনে কোনো কালে আসে না। আশা করি উজ্জয়িনীর জীবনে যথাকালে আসবে।

বাদলের অপেক্ষা না রেখে কেমন করে এই সংযম সম্ভব হবে জানিনে। তবে বিধাতা আমাদের একান্ত পরনির্ভর করে গড়েননি। নিজের মধ্যে নিজের পূর্ণতা উহ্য রয়েছে, খুঁজে নিতে হবে। উজ্জয়িনীর উপর আমার ভরসা আছে, সে পরমুখাপেক্ষী হবে না।

ভরসা আছে, সেই সঙ্গে ভাবনা আছে। তার শ্বশুরবাড়ীতে সে তার স্বামীর অধিকারে আছে। স্বামী যদি তাকে অস্বীকার করল তবে সে কার অধিকারে থাকবে? শ্বশুর তাকে অস্বীকার করবেন না বটে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু না লেখাই ভালো। ধরে নেওয়া যাক শ্বশুরের অধিকার দুর্বল হয়ে আসবে, শ্বশুরের স্নেহ সে এখনকার মতো পাবে না। তা হলে সে দাঁড়ায় কোথায়? ভাত, কাপড়ের জন্যে শ্বশুরের আশ্রয়ে পড়ে থাকা তার পক্ষে মরণাধিক। অথচ স্বাবলম্বী হবার মতো শিক্ষাও সে পায়নি। যার হাতে জোর নেই তার মনে উচ্চ চিন্তা থাকা করুণ-রসাত্মক। এই জন্যেই আমার ভাবনা। কিন্তু আমি তো তার স্বামীর বন্ধু ও পাতানো ভাই, আপনি তার পিতা ও প্রথম গুরু। আপনার ভাবনা আরও নিত্যকার, আরও সত্যকার। আমি জানি আপনি কেবলমাত্র তার মনের ভবিষ্যৎ ভাবছেন না, তার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের চিন্তাও করছেন।

১৩

চিঠিখানা নিকটতম পিলার বক্স-এ দিয়ে সুধী বহুল পরিমাণে নিশ্চিন্ত হল। যোগানন্দ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভাব গ্রহণ করবেন।

সুধীর সঙ্গে অনাহূত ছুটে গেছল মার্সেলের কুকুর জ্যাকী। তাকে এদানীং বেঁধে রাখা হয় না, কিন্তু বন্ধ রাখা হয়। দুয়ার খোলা পেয়ে সেও সুধীর সঙ্গে চলল ; মতলবটা এই যে মার্সেলের কাছে বকুনি খাবার সময় জিভ লক্ লক্ করতে করতে সুধীর দিকে চেয়ে দোষটা সুধীর ঘাড়ে চাপাবে। যেন সুধীই তাকে আদর করে ডেকে সঙ্গী করেছিল।

সুধী ডাকল, "জ্যাকী, আয়, ফিরি।"

জ্যাকী শোনে না। সামনের বাড়ীর সামিল বাগানে ঢুকে একটা বিড়ালকে তাড়া করেছে। বিড়ালটা যেখানে লুকাতে চেষ্টা করে সেখানে জ্যাকী। বিড়ালটা একটু চুপ করে বসলে জ্যাকী একটা থাবা বাড়িয়ে একটু রঙ্গ করে, বিড়ালটা ফুলতে থাকে। সুধী ডাকে, "জ্যাকী!" জ্যাকী না-শোনার ভান করে। সুধী অত্যন্ত লজ্জা বোধ করে। বিড়ালের ও বাগানের মালিক যদি দেখতে পান কী ভাববেন? সে বিরক্তির সুরে ডাকে, "জ্যাকী!" কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সুধীর দিকে তাকায়, যেন সেও লজ্জিত। কিন্তু বিড়ালকে এক পা এগোতে দেয় না।

অগত্যা সুধীকে অপরিচিতের দরজায় কড়া নাড়তে ও বেল টিপতে হল। দরকারটা জরুরি। একটি খোকা দরজা খুলে সুধীর রঙ ও পাগড়ি দেখে পিটটান দিল। একটি মহিলা হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন। এসেই বললেন "No hawkers allowed." অর্থাৎ সুধীকে ঠাওরালেন ফিরিওয়ালা। সুধী মৃদু হেসে বলল, "ফিরি করবার মতো কিছু নেই।" এই বলে দুই হাত ডানার মতো মেলে দেখাল। মহিলাটি তার দিকে কটমট করে তাকালেন। বললেন, "কী জন্যে এসেছেন?" সুধী আঙুল

দিয়ে নির্দেশ করে বলল, "আমার কুকুর আপনার বিড়ালকে তাড়া করেছে, হুকুম মানছে না। বাগানে প্রবেশ করবার অনুমতি পেলে তাকে ধরে আনতে পারি।" এ কথা শুনে খোকা বাগানের ভিতরে লাফ দিয়ে ছুটল। মহিলাটি বললেন, "আসুন।"

ততক্ষণে বিড়ালটি ভয়েই মরে গেছে। জ্যাকী তার সঙ্গে একটু পরিহাস করছিল। গায়ে আঁচড়টি দেয় নি। সুধীকে দেখে জ্যাকী ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। পরিহাসের পরিণাম বেচারাকে বড় অপদস্থ করেছে।

খোকা বিড়ালটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। নুয়ে পড়ে চোখে চোখ রাখল। বিড়ালটিকে তুলে চার পায়ে খাড়া করবার চেষ্টা করল। অবশেষে কান্নার সুরে বলল, "O Mummy!" তার মা সুধীর দিকে তাকালেন। সুধী তখন অন্যমনস্ক। জীবনমৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাকে মুগ্ধ করছিল।

মহিলাটি বললেন, "এবার আপনার কুকুরটাকে নিন এবং যান।"

সুধী বলল, "কুকুরটাকে রেখে বিড়ালটিকে দিন।"

মহিলাটি সুধীর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন। খোকা লাফিয়ে উঠে মায়ের মুখে চোখ রেখে আব্দারের সুরে বলল, "Yes, Mummy."

মা কঠিন হয়ে বললেন, "তা হয় না।"

খোকা কুকুরটার দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল, বিড়ালটার কথা ভুলে গেল। কুকুরটা ততক্ষণে আবার খেলা করতে লেগেছে—এবার নিজের ল্যাজের সঙ্গে।

খোকার মা বললেন, "আপনি ওটাকে নিয়ে যান। আমরা আমাদের বিড়ালকে গোর দেব।"

সুধী অগত্যা তাই করল। জ্যাকী লক্ষ্মী ছেলের মতো ধীরে ধীরে সুধীর সঙ্গ রাখল। সুধী ভাবছিল, ব্যবধান তো নেই। একটা মুহূর্তেরও ব্যবধান তো নেই। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিল কে? জ্যাকী। দুষ্টু ছেলেতে যা করে থাকে সে তাই করেছে। প্রকৃতি সবাইকে দিয়ে সমস্তক্ষণ চাকাটাকে ঘোরাচ্ছে। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। কিন্তু মরণের পিঠ পিঠ জীবন আছে কি? জীবনের বেলা তো দেখি জীবনের ভিতর থেকে জীবন আসে। তা আসুক। কিন্তু কী করে থাকে? জীবনের ঘড়িতে প্রতিদিন চাবি দেয় কে? মরণ। এই বিড়ালের মৃতদেহ বহু কীট কীটাণুর জীবনকালকে দীর্ঘতর করবে। মরণের পিঠ পিঠ আয়ু। কার মরণে কার আয়ু সে কথা তুচ্ছ। মরণ নামক সত্যের উত্তরাধিকারী আয়ু নামক সত্য।

বাসায় পৌঁছবার মুখে সুধী যাকে দেখল সে একটা টেলিগ্রাফ পিয়ন। ইংলণ্ডে সাধারণত বাচ্চা পিয়ন টেলিগ্রাম বিলি করে। সুধী জিজ্ঞাসা করল, "কার নামে টেলিগ্রাম?"

ছোকরার গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, "মনে পড়ছে না ঠিক। বোধ হয় ক্রিস্টফারটী।"

সুধীর চোখ ও মুখ মুহুর্মুহু কাঁপল। সে বাড়ীতে ঢুকতেই সুজেৎ অনুযোগ করে বলল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল এতক্ষণ? দশবার উপরতল বার-ভিতর করতে করতে আমার পা যে ভেঙে পড়ল।" সে আজকাল মুখরা হয়েছে। কাকে ভালোবেসেছে বলা যায় না। হয়তো সুধীকেই।

তার হাত থেকে বিনাবাক্যে খামখানা ছিনিয়ে নিয়ে পটাপট ছিঁড়ে

টেলিগ্রাম খানার উপর সুধী যেই চোখ বুলিয়ে গেল অমনি ওখানা তার হাত থেকে খসে পড়ল, তেমনি বিনাবাক্যে।

"বাদলের শ্বশুর হার্টফেল করে মারা গেছেন। মহিম।"

মরণ জীবনকে দেয় আয়ু, আগুনকে দেয় ইন্ধন। কিন্তু আত্মাকে দেয় কী? আত্মাকে দেয় এত বিপুল কাল যে তাকে কাল বলা চলে না, এত বৃহৎ দেশ যে তাকে দেশ বলা চলে না। সসীম মানবের ঐতিহাসিক কাল ও আইনস্টাইনীয় বিশ্ব; সীমার মধ্যে সে সোয়াস্তি পায় বলে সীমা খুঁজেই সে নাকাল। তাকে অনন্ত বিরতি ও অপার বিস্মৃতি দিতে পারে কে? দিতে পারে মৃত্যু। হে মৃত্যু, তুমি দেহের সীমা থেকে সীমাহীন দেহে দেহীকে পৌঁছে দিলে, মনের সীমা থেকে সীমাহীন মনে মনস্বীকে উপনীত করলে, তুমি আরামকে দিলে বিরাম, ব্যস্ততাকে নিরস্ত করলে, উদ্বেগকে দিলে ক্ষান্তি, সঞ্চয়কে ব্যঙ্গ করলে। তোমায় নমস্কার।

(১৯৩০-৩২)